বিশেষ সংখ্যা

আগস্ট ২০১৭ ■ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৪

সচিত্র বাংলাদেশ

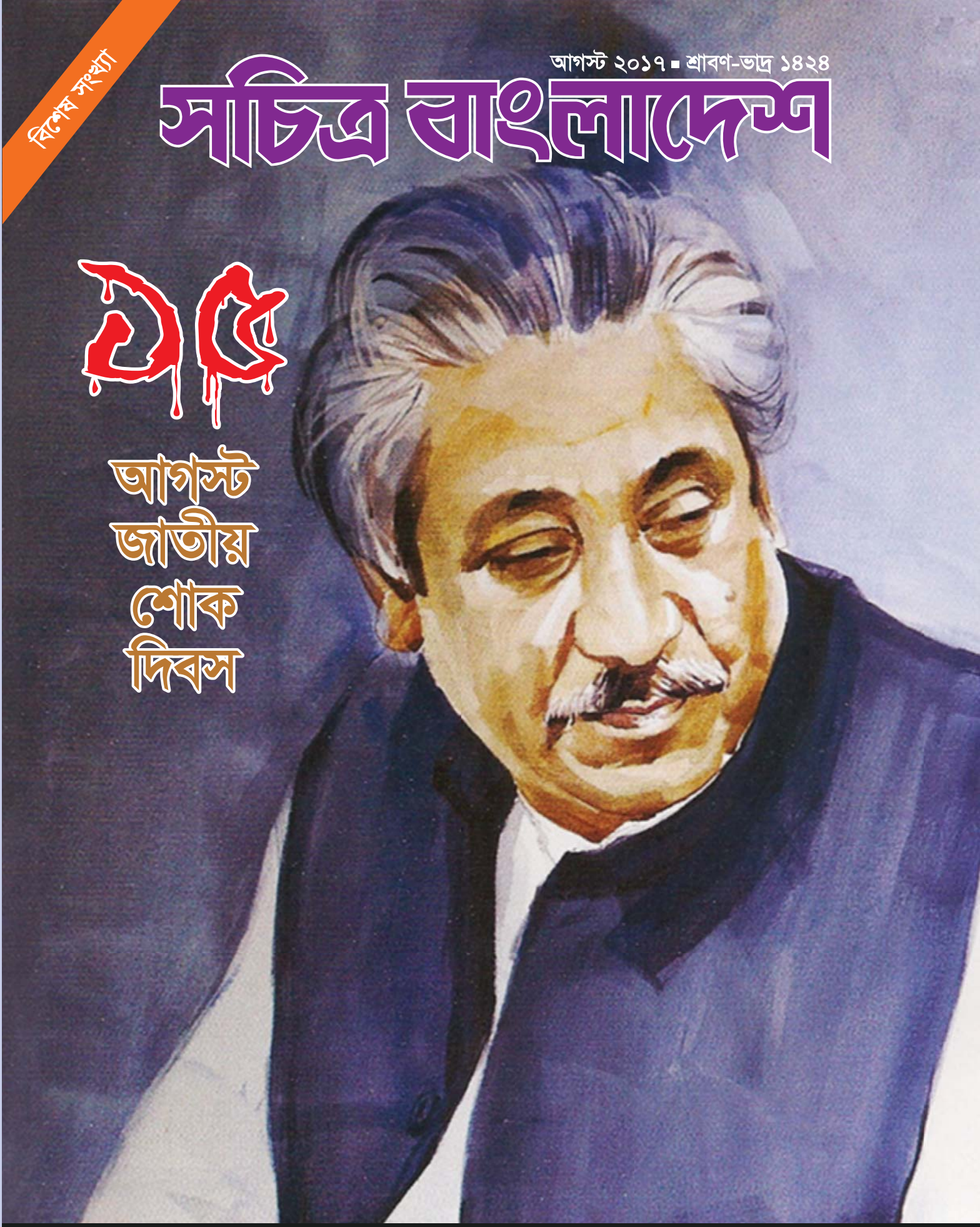

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪২তম শাহাদত বার্ষিকী

সচিত্র বাংলাদেশ আগস্ট ২০১৭ ■ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৪

সচিত্র বাংলাদেশ

আগস্ট ২০১৭ ■ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৪

জন্মেও তুমি মহাকালে মহান
মরণেও তুমি কালজয়ী চির দীপ্তমান
বাংলার মহানায়ক অমর স্মৃতিতে অম্লান
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
– কনক চৌধুরী

সম্পাদকীয়

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪২তম শাহাদত বার্ষিকী। ১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট প্রত্যুষে, মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে যখন ধ্বনিত হচ্ছিল ফজরের আজান, ঠিক তখন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর হাতে গড়া সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সৈনিক রক্তলোলুপ উন্মত্ততায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরের সাদামাটা দোতলা বাড়িটির ওপর। যিনি ছিলেন বাঙালির শৌর্য ও ঐক্যের উৎস; সাহসী, দৃঢ় ও আপোশহীন নেতৃত্বে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করে স্বাধীনতার সোনালি সূর্য উপহার দিয়েছিলেন –সেই সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্তে পিতার বুকে গুলি চালানো হলো। তিনি লুটিয়ে পড়েন তাঁরই চির আরাধ্য বাংলাদেশের কোমল মাটিতে, চিরকালের জন্য।

নৃশংস ঘাতকেরা সেখানেই থেমে থাকেনি। তারা একে একে হত্যা করেছে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, মুক্তিযোদ্ধা ও বঙ্গবন্ধু তনয় শেখ কামাল, শেখ জামাল, তাঁদের সদ্য বিবাহিত স্ত্রী সুলতানা কামাল, রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র মাত্র আট বছরের নিষ্পাপ শিশু শেখ রাসেলসহ মোট ষোলো জনকে। জাতির পিতার বিয়াল্লিশতম শাহাদত বার্ষিকীর প্রাক্কালে বিনম্র শ্রদ্ধায় বঙ্গবন্ধুসহ সকল শহিদকে স্মরণ করি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে চলেছে, প্রমাণিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু আজকের বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে প্রেরণার উৎস, সকল সময়ে তিনি সমভাবে প্রাসঙ্গিক।

যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাঙালি থাকবে, থাকবে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, ততদিন শোকের এই অম্লান স্রোতধারা রবে বহমান। আর গাইবে– 'যতকাল রবে পদ্মা-যমুনা-গৌরী-মেঘনা বহমান, ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান'। বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও মহান মুক্তিযুদ্ধকে আলেখ্য করে রচিত হয়েছে অসংখ্য গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, স্মৃতিচারণসহ নানা ধরনের সাহিত্য– এই ধারা অব্যাহত আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

তারই ধারাবাহিকতায় ও নানা মাত্রিকতায় জাতির পিতাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার ছোট্ট প্রয়াস *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যায়। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন ও আনিসুল হকের নিবন্ধ, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের স্মৃতিচারণ, বঙ্গবন্ধুর অর্থনীতির ওপর বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদের সাক্ষাৎকারসহ প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প ও কবিতায় বঙ্গবন্ধুকে পাঠক মহল, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের পাঠকদের কাছে উপস্থাপনের প্রয়াস রয়েছে এবারের বিশেষ সংখ্যায়।

এছাড়া রয়েছে নিয়মিত প্রতিবেদন। আশা করি, সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
সুফিয়া বেগম

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

আলোকচিত্রী
সৈয়দ মাসুদ হোসেন
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক)
E-mail : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর; **স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।**

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

নিবন্ধ

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সমার্থক ৯
আনিসুল হক

শিল্পীর তুলিতে চিরকালের বঙ্গবন্ধু ১৬
ফারুক নওয়াজ

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় সংগীত ২২
মাহবুব রেজা

৫৬ হাজার বর্গমাইলের প্রতিচ্ছবি ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ২৪
আ.ফ.ম. মোদাচ্ছের আলী

ক্রীড়াঙ্গনে বঙ্গবন্ধু পরিবার ৩১
শামসুজ্জামান শামস

১৫ই আগস্ট মহাকালের সাক্ষী ৩৬
সাদত আল মাহমুদ

বঙ্গবন্ধু এক ঐশ্বরিক আগুন ৪৪
মুহাম্মদ ফরিদ হাসান

শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও আমাদের করণীয় ৫১
মালিক খসরু

একজন প্রকৃত ধার্মিকের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৫৭
নেছার আহমদ

স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধ

স্মৃতিময় সেই দিন : বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ ৪
শামসুজ্জামান খান

গবেষণা নিবন্ধ

গানে গানে বঙ্গবন্ধু ২৭
অসিত কুমার মণ্ডল

বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ ৩৮
সৌম্য সালেক

প্রবন্ধ

বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন স্বপ্নের সীমানায় গৌরবের আকাঙ্ক্ষায় ৭
সেলিনা হোসেন

বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর কারাগারের রোজনামচা ১২
খালেক বিন জয়েনউদ্দীন

পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু ১৮
শাফিকুর রাহী

জনকের কারাবাস ৬২
সাঈদ তপু

১৫ই আগস্ট বাঙালি জাতির বেদনার দিন ৬৪
অপু বড়ুয়া

হাইলাইটস

সাক্ষাৎকার

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন বিষয়ক একান্ত সাক্ষাৎকার ৪৭
অর্থনীতিবিদ খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ

গল্প

ছেলেটির নাম রাখে শেখ মুজিব ৩৪
আখতারুল ইসলাম
শেখ মুজিবের রক্ত ৫৯
মনি হায়দার

ছোটো গল্প

একজন গায়কের ঢাকা যাত্রা ৪১
রফিকুর রশীদ

কবিতাগুচ্ছ

অসীম সাহা, আমিরুল হক, আমিনুল ইসলাম মিলন, মোশাররফ হোসেন ভূঞা ১৫
শাফিকুর রাহী, জাকির হোসেন চৌধুরী, লিলি হক, অঞ্জনা সাহা ২৬
নজমুল হেলাল, ম. মীজানুর রহমান, বাতেন বাহার, নাহার আহমেদ, আব্দুস ছবুর মিঞা ৩৫
মনসুর জোয়ারদার, খান চমন-ই-এলাহি কনক চৌধুরী, নিপু শাহাদাত ৫৬
দেলওয়ার বিন রশিদ, জিয়াউল হক জুয়েল, আবুল হোসেন আজাদ, এমরান চৌধুরী ৬৫

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৬৬
প্রধানমন্ত্রী ৬৬
তথ্যমন্ত্রী ৬৮
জাতীয় ঘটনা ৬৯
উন্নয়ন ৭০
আন্তর্জাতিক ৭০
শিক্ষা ৭১
স্বাস্থ্যকথা ৭২
সংস্কৃতি ৭৩
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৭৩
কৃষি ৭৪
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৭৬
যোগাযোগ ৭৬
পরিবেশ ও জলবায়ু ৭৬
জেন্ডার ও নারী ৭৭
সামাজিক নিরাপত্তা ৭৮
আমাদের স্বাধীনতা ৭৮
নিরাপদ সড়ক ৭৮
শিল্প-বাণিজ্য ৭৯
চলচ্চিত্র ৭৯
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৮০
ক্রীড়া ৮০

স্মৃতিময় সেই দিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ

১৯৭৪ সাল। হঠাৎ করেই সুযোগ হয়ে গেল বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের। ৩রা ফেব্রুয়ারির সকাল ন'টা। তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হয়েছে। আমরা ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হলাম। তাঁর নিচের বৈঠকখানায় তখন অনেক লোক। আমাদের দেখে প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশাল মানুষটির মুখ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল। তাঁকে খুব সুন্দর আর প্রাণবন্ত লাগছিল। তিনি উঠলেন। ধীরে এগুলেন ডানদিকে তাঁর পাঠকক্ষের দিকে। আমরা তাঁকে অনুসরণ করছি সম্মোহিতের মতো। ফোকলোর বিশারদ ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধে বিস্তারিত পড়ুন, পৃষ্ঠা-৪।

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন বিষয়ক একান্ত সাক্ষাৎকার

অর্থনীতিবিদ খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ দেশের খ্যাতিমান ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদ। তিনি ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শিশু-কিশোর সংগঠন কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলার নির্বাহী পরিষদের সভাপতি। তিনি ছাত্রজীবনে বঙ্গবন্ধুর সাহচর্য লাভ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত পড়ুন, পৃষ্ঠা-৪৭।

বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন স্বপ্নের সীমানায়, গৌরবের আকাঙ্ক্ষায়

শোকের মাস যেন একটি কালো গোলাপ। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখানো এক অবিনাশী মানুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জীবন-মৃত্যুর দুই গভীর জায়গায় আমাদের সামনে দাঁড়ানো। মৃত্যুর অবধারিত সত্য মেনে নিয়ে তিনি আমাদের সামনে অমরত্বের সাধনা। এ দুটো সত্যকে এক করে আগস্ট মাস প্রবলভাবে অর্থবহ। দুঃখী মানুষের জীবন বদলানোর জন্য তাঁর অন্তহীন প্রেরণায় আজকের বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতির জন্য শোক কোনো শেষ কথা নয়। শোককে শক্তিতে পরিণত করেছে দেশের মানুষ। বঙ্গবন্ধুর বাণী পৌঁছে যাক প্রত্যেকের চেতনায়। মানুষের মর্যাদায় প্রদীপ্ত থাকুক তাঁর অবিনশ্বর চেতনা। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের প্রবন্ধ বিস্তারিত দেখুন, পৃষ্ঠা-৭।

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সমার্থক

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সমার্থক। ইতিহাস যতই পড়েছি, ততই এই প্রত্যয় উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মই হয়েছিল বাংলাদেশটাকে স্বাধীন করবেন বলে। তিনি তাঁর সারাটা জীবন একটা লক্ষ্য নিয়েই কাজ করেছেন। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে তিনিই বাঙালিকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন। আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান –কথা দুটো সমার্থক হয়ে উঠেছে। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক আনিসুল হকের নিবন্ধ বিস্তারিত পড়ুন, পৃষ্ঠা-৯।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩১৭৩৮৪

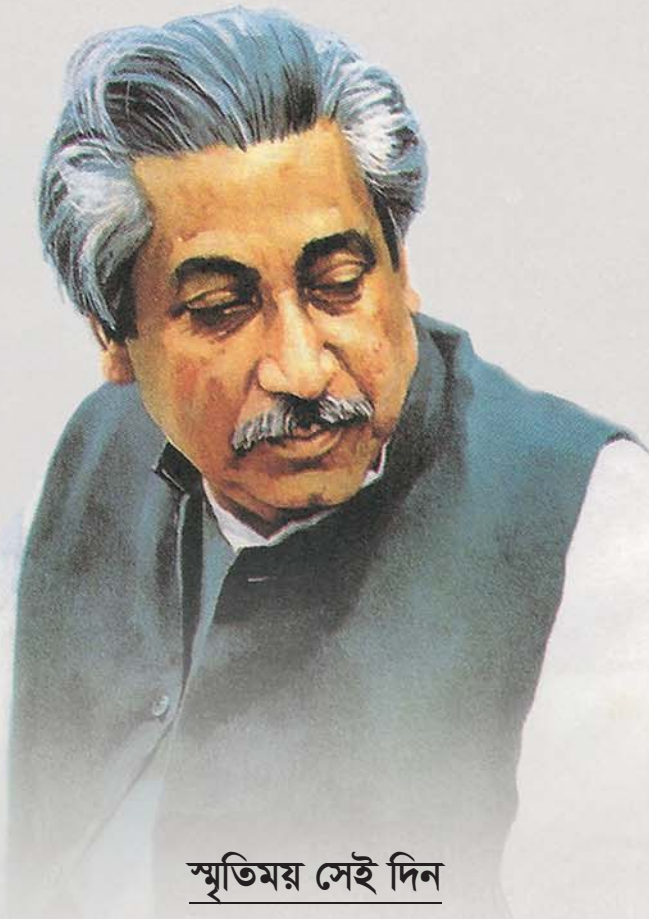

স্মৃতিময় সেই দিন

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ

শামসুজ্জামান খান

১৯৭৪ সাল। হঠাৎ করেই সুযোগ হয়ে গেল বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের। তারিখ মনে আছে, লেখাও আছে ডায়রিতে। ৩রা ফেব্রুয়ারির সকাল ন'টা। তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হয়েছে। আমরা ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হলাম। বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক ড. মযহারুল ইসলাম, লেখক-সাংবাদিক ও আমাদের বন্ধু রাহাত খান, আমি আর বাংলা একাডেমির সংস্কৃতি বিভাগের জনাব ম. জিল্লুর রহমান।

তাঁর নিচের বৈঠকখানায় তখন অনেক লোক। বঙ্গবন্ধু লুঙ্গি পরা, পাঞ্জাবি গায়ে, তার ওপরে বাদামি রঙের একটা শাল জড়ানো, হাতে পাইপ আর তাঁর প্রিয় এরিনমোর তামাকের কৌটা। আমাদের দেখে প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশাল মানুষটির মুখ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল। অন্যদের বললেন, 'না, আজ আর কোনো কথা নয়, তোমরা আস এখন, আমি এদের জন্য সময় দিয়ে রেখেছি। এদের সঙ্গে নিরিবিলিতে কিছু জরুরি আলাপ করবো।' বৈঠকখানা ভর্তি লোক ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় নিষ্ক্রান্ত হতে থাকলেন। তিনি বললেন, 'না, এখানে বসব না। তাহলে কেউ না কেউ আসবেই। আমি মন খুলে কিছু কথা বলতে চাই।'

তাঁকে খুব সুন্দর আর প্রাণবন্ত লাগছিল। তিনি উঠলেন। ধীরে এগুলেন ডানদিকে তাঁর পাঠকক্ষের দিকে। আমরা তাঁকে অনুসরণ করছি সম্মোহিতের মতো। পাঠকক্ষের ভেতরে এসে একটা আলমারির সামনে দাঁড়ালেন এবং অভ্যস্ত হাতে বের করলেন মাও সেতুং-এর একটা বই। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন ড. ইসলামের দিকে। মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বললেন, 'শুধু রবীন্দ্রনাথ না, আমি নজরুল, সুকান্ত এমনকি মাও সেতুং-এর রচনাও মনোযোগ দিয়ে পড়ি।' আমাদের মধ্যে কেউ একজন বললেন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে চীনের ভূমিকা তো...। তিনি সে কথা শেষ করতে দিলেন না। বললেন, 'দুটো বিষয় তো আলাদা। মাও একজন খুব বড়ো নেতা। জীবনে বহু সংগ্রাম করেছেন। তাঁর জীবন চিন্তাটা জানা ও বোঝা দরকার। একটা অনুন্নত বিশাল দেশকে তিনি স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। সে দেশটায় এত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কত উন্নত হয়েছে। এই ব্যাপারটা কীভাবে ঘটেছে তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি।'

হঠাৎ তাঁর মুখে একটু বেদনার ছায়া পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, 'রাজনীতি বড় জটিল, নিষ্ঠুর। এর ফলে কত অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। তা না হলে চীনের আমাদের সমর্থন না করার কোনো যুক্তিই নেই। চীন খুব অন্যায় কাজ করেছে। থাকগে, আসুন প্রফেসর সাহেব, বসে বসে কথা বলি।' বঙ্গবন্ধু বসলেন, প্রফেসর ইসলাম এবং আমরাও বসলাম। তিনি বললেন, 'বলুন প্রফেসর কি মনে করে এসেছেন?' ড. ইসলাম বললেন, বঙ্গবন্ধু, আমরা বাংলা একাডেমী থেকে একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করছি, বিভিন্ন দেশ থেকে বিখ্যাত সাহিত্যিকরা আসবেন। আপনাকে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে পেতে চাই। তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন! তাঁর প্রত্যুত্তর, 'আমি সাহিত্যের কী বুঝি! আমি কী বলবো! একজন প্রবীণ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বা পণ্ডিতকে দিয়ে এ কাজ করান–সম্মেলনের মর্যাদা বাড়বে। আগে তো তাই হতো। ছাত্রজীবনে দু'একবার সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছি। কই, রাজনৈতিক নেতারা তাঁর উদ্বোধন করেছেন বলে তো মনে পড়ে না।' এই বলে তিনি হাসলেন, পরিস্থিতিকে একটু সহজ করার জন্য বললেন, 'আমি রবীন্দ্রনাথ পড়ি, ভালোবাসি তাঁকে– সাহিত্যে আমার পুঁজি তো ওইটুকুই। এই পুঁজি নিয়ে দেশ-বিদেশের বড় বড় পণ্ডিত ও সাহিত্যিক-শিল্পীদের মধ্যে যেতে আমি সংকোচবোধ করছি।'

তাঁকে বলা হলো, এটা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন। এর একটা ভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে। আপনি সম্মেলন উদ্‌বোধন করলে তা আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করবে। তাছাড়া গণতন্ত্র, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার প্রশ্নে আপনার ও আপনার সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রতিফলন ঘটবে। তিনি একটু ভাবলেন, বললেন, 'ঠিক আছে, যাবো। আমার বন্ধু জসীমউদ্দীন ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকেও বিশেষ মর্যাদায় আমন্ত্রণ জানাবেন। আর একটি ছোট ভাষণ প্রস্তুত করে আমাকে দেখিয়ে নেবেন।'

ড. ইসলাম, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, সন্তোষ গুপ্ত, রাহাত খান ও আমি সেই ভাষণটি প্রস্তুত করি। যা হোক, সম্মেলন প্রসঙ্গ স্বল্প সময়ে শেষ করে তিনি বললেন, 'আপনারা সাহিত্যিক-সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মী ও গবেষক। ভবিষ্যতে আপনারা হয়তো মুক্তিযুদ্ধ

বা বাংলাদেশ নিয়ে লিখবেন, তাই আমি আজ কিছু কথা বলতে চাই।' তিনি 'বাংলাদেশ' নাম কীভাবে ঠিক করেছিলেন, দেশকে স্বাধীন করার চিন্তা তিনি যে সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই শুরু করেন সে কথাও বললেন। 'সোনার বাংলা'কে জাতীয় সংগীত করবেন এ স্বপ্ন তাঁর বুকের ভেতর আলোর মতো জ্বলত। এ গান শুনলে তিনি রোমাঞ্চিত, আবেগাপ্লুত হতেন, তাও জানালেন। ঠিক মনে পড়ছে না, রাহাত খান অথবা আমি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথা তুললাম। তিনি আবার হাসলেন। বললেন, 'কিসের ষড়যন্ত্র! বল, আমাদের স্বাধীনতার প্রয়াস।' এরপর এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ ও ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। তার সার কথা এরকম, 'আগরতলায় আমি ঠিকই গিয়েছিলাম। বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছিল। একটু জ্বরও হয়েছিল। অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হয়। আমার পা ফুলে গিয়েছিল। তবে নেতাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।'

১৯৭১-এর স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '২৫শে মার্চ (১৯৭১) রাতে আমি গ্রেফতার হবার আগে স্বাধীনতার ঘোষণা দেই। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের মাধ্যমে ওয়্যারলেসে সে ঘোষণা সব জেলা সদরে পাঠানো হয়। আমি বিভিন্ন চ্যানেলে ভারতের সঙ্গেও যোগাযোগ করে যাই। তা না হলে তোমরা অত সহজে অস্ত্র ও সাহায্য সহযোগিতা পেতে না।' আমরা প্রশ্ন করলাম কিন্তু আপনি কেন ওদের হাতে ধরা দিলেন। তিনি বললেন, 'এ ব্যাপারে আমার বেশ কটি চিন্তা কাজ করেছে। এক. আমাকে ধরতে না পারলে ওরা আরো বেশি লোককে খুন করতো; দুই. আন্তর্জাতিকভাবে আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ভারতের ক্রীড়নক বলে প্রমাণিত হতাম এবং এতে আন্তর্জাতিক সহমর্মিতা কমতো এবং আরো বেশি দেশ আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতো। আর একটা কথা বলি, তোমরা কিভাবে নেবে জানি না, প্রফেসর সাহেব আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা তাও বলতে পারি না–তবে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস আমি পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি থাকায় আমার দুঃখী বাঙালিদের মধ্যে দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ যেমন বেড়েছে তেমনি মানুষ আমার অনুপস্থিতিতে আমার একটা বিশাল প্রতীক মনে মনে তৈরি করে নিয়েছে। এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের খুব বড় একটি শক্তি। আমি প্রবাসী সরকারে থাকলে শুধু প্রমাণ সাইজের মুজিবই থাকতাম। ওদের হাতে বন্দি থাকায় আমি এক মহাশক্তিধর ও বাংলাদেশের সকল মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতার ভূমিকায় স্থান পাই। মানুষ আমার নাম নিয়ে হেলায় হেসে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। কি অমোঘ অস্ত্র ছিল, 'জয়বাংলা' স্লোগান। ওরা যদি আমাকে মেরে ফেলতো, তাহলে আমি আরও বড় প্রতীকে পরিণত হতাম। বাংলার মানুষ আরও লড়াকু হয়ে যুদ্ধ করতো। তাছাড়া, আমার জাতি আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছে তার প্রতি সম্মান রেখেই আমি আমার বুঝমতো ব্যবস্থা নিয়েছি, আর আমার দেশবাসী ও যোগ্য সহকর্মীরা মুক্তিযুদ্ধ চালিয়েছে।'

আলাপের এ পর্যায়ে এসে আমি জিজ্ঞেস করি, আরও খোলামেলা কথা বলার সুযোগ আমাদের আছে কি না। তিনি বললেন, 'সবাইরে বিদায় করে তোমাদের নিয়া বসছি। আমার অন্তর খোলাসা করেই বসছি। তোমরা বাংলা একাডেমীর লোক, তোমরা লেখ, গবেষণা কর, আমি তো তোমাদের কাছেই প্রাণ খুলে কথা বলতে পারি। ভবিষ্যতে তোমরা ইতিহাস লিখলে এই সব কথা খুব কাজে লাগবে। তোমরা সত্য ইতিহাস লিখতে পারবে'।

আমরা বললাম, সমাজের মূল্যবোধ ও বাঁধন তো ভেঙে পড়ছে। নৈরাজ্য, হতাশা দেখা দিচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা বাড়ছে। ছিনতাই, রাহাজানি মানুষকে আতঙ্কিত করছে। তিনি একটু চুপ করে থাকলেন-মনে হলো গভীরভাবে ভাবছেন। তারপর উজ্জ্বল হাসি হেসে মুখে নিলেন পাইপ–ঘন ঘন ক'টা টান দিলেন তাতে। তারপর মুখ খুললেন, 'তোমরা অনেক পড়াশোনা করছ–অনেক কিছু বোঝ। কিন্তু নিজ দেশের কতগুলি বাস্তব ব্যাপার তোমরা যেন দেখতে পাও না। দেশে এতবড় একটা যুদ্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধ মানুষের মূল্যবোধ আমূল বদলে দেয়। মানুষকে বেপরোয়া, লাগামহীন করে। আমাদের দেশেও সেটা হয়েছে। হাইজ্যাক-ডাকাতি বেড়েছে– 'চাটার দল' বেড়েছে। এইসব একদিনে দমন করা যাবে না। এটা একটা নতুন পরিস্থিতি। অনেকে অস্ত্র জমা দেয় নাই। ইসলামী দলগুলি আগাগোড়া আমার বিরুদ্ধে গোপন প্রচার করছে–বেনামা পুস্তিকা ছাপছে। দুষ্কৃতকারীরা পাটের গুদামগুলি পুড়িয়ে দিয়ে অর্থনীতিকে কাবু করছে। থানা আক্রমণ করে অস্ত্র লুটে নিচ্ছে। আমার লোকদের হত্যা করছে। অথচ তিন বছরে আমরা যা করেছি আমাদের মতো বিধ্বস্ত অন্য কোন দেশ তা পারতো না। এ জন্য আমাদেরকে প্রশংসা করে না। কী অবস্থা করে রেখে গেছে পাকিস্তানি হানাদাররা? দেশটা ছিল ভাঙাচোরা; একটা শ্মশান যেন। কি আর বলবো, হুজুর (মওলানা ভাসানী) মুরুব্বী মানুষ, তিনি যে সব বক্তৃতা বিবৃতি দিচ্ছেন তাঁকে লুফে নিচ্ছে সাম্প্রদায়িক দল ও ব্যক্তিরা। তারা তাঁকে শিল্ড হিসাবে ব্যবহার করে শয়তানের হাসি হাসছে। এইসব দেখেশুনে মনে হয় তাজউদ্দীনদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে ভোলা বা মনপুরায় গিয়ে ছোট্ট ঘর বানিয়ে থাকি।' তাঁর কণ্ঠে তখন মৃদু ক্ষোভ ও হতাশার সুর।

নেতার এই আকস্মিক বেদনা ও হতাশায় আমরাও কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় হয়ে যাই। ড. ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধু, আমরা তো আছি, সারাদেশে আপনার হাজার হাজার কর্মী ও সমর্থক আছে, আপনি হতাশ হচ্ছেন কেন? কঠোর হোন। নির্দেশ দিন। তিনি বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, বাংলাদেশ বড়ো কঠিন জায়গা। মনে হয় যেন বাঘের পিঠে চড়ে বসেছি। পারি, সব ঠিক করে দিবার পারি। কিন্তু কি করবো, মনে হয় কার গায়ে হাত দেবো, সবারই পরিবার–পরিজন আছে। তখন আপনারাই আসবেন আবার তদবির নিয়ে। কিন্তু বেশিদিন তো সহ্য করা যাবে না। শক্ত একটা কিছু করতে হবে। আমি 'লাল ঘোড়া' দাবড়াইয়া দিতে চেয়েছিলাম। তা দিতে চেয়েছিলাম 'চাটার দলের ওপর', কেউ কেউ তা পছন্দ করলো না। আমার সমালোচনা করলো। তাহলে আমি যাই কোথায়! এইজন্যই তো বলি, সব ছেড়ে দিয়ে ভোলা–মনপুরা চলে যাই।'

আমরা এবার অর্থনৈতিক প্রশ্ন তুলি। তিনি বলেন, 'আমি দেশের সেরা অর্থনীতিবিদদের নিয়ে পরিকল্পনা কমিশন করেছিলাম। তাঁরা তো আমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারলো না। আসলে তত্ত্ব আর বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য অনেক। ওরা (পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যরা) ভালো লোক, পণ্ডিত, কিন্তু আমাদের গ্রামবাংলা আর গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে বোধ হয় এদের ভাল পরিচয় নাই। আমি 'সোনার মানুষের' কথা বলি। আমার কৃষকেরাই শুধু সোনার মানুষ। তারা সারা বছর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ফসল ফলায়, ঘরবাড়ি বানায়, নৌকা চালায়, তবেই না আমরা বাবু সেজে পায়ের ওপর পা তুলে আরো কত বড়ো হবো তার খোয়াব দেখি। তেমনি মুটে–মজুর, জেলে, কামার-কুমার–তারা আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিকে টিকিয়ে রেখেছে। তা না হলে সব ভেঙ্গে পড়তো।

আমরা সমাজতন্ত্রের কথা বলেছি, সমবায়ের কথা বলেছি। দেশের যা অবস্থা, মধ্যবিত্তের যা খাই খাই ভাব তাতে সফল হবো কি–না জানি না। চেষ্টা করছি। আমি ভিয়েতনামকে দ্রুত স্বীকৃতি দিয়েছি। হোচিমিন কত বড়ো নেতা, আর খাঁটি মানুষ; তাঁরা কি করছেন সেখান থেকে শিক্ষা নেবার চেষ্টা করছি, বড়ো বড়ো ইন্ডাস্ট্রি করে বোধ হয় খুব সুবিধা করতে পারবো না। শিল্পকারখানা থাকবে অর্থনীতির সহায়ক শক্তি হিসাবে দ্বিতীয় স্থানে, আমি সমবায় ও কৃষিভিত্তিক ছোট ছোট প্রকল্পে হাত দিতে চাই। ঔপনিবেশিক কাঠামোটা ভাঙ্গতে চাই। তবে সে বড়ো কঠিন কাজ। আমার কিছু এমপি-ই জমির সিলিং ১০০ বিঘা করার বিপক্ষে।'

হঠাৎ তিনি কিছুটা যেন উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন। রাহাত আর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তোরা হতাশ হবি না। প্রফেসর সাহেব, আমার এই কথাটা খুব মন দিয়া শোনেন। বাঙালি খুব গরিব, দরিদ্র, আমার ভাষায় দুঃখী। আমি যতটা ইতিহাস পড়েছি তাতে জেনেছি হাজার বছর ধরেই বাঙালি দুঃখী, অভাবী। তার বিত্ত নাই, বেসাত নাই। হাতে পয়সা নাই। কিছুদিন আগে একটা উপন্যাস পড়ছিলাম, 'কলকাতার কাছেই'। তাতেও আছে বাঙালি কাঁচা পয়সার কি কাঙাল। একটা পয়সার জন্য কি 'কেগিভেগি' (অনুনয়-বিনয়) করতো। মনে হয় শায়েস্তা খাঁর আমলেও বাঙালি কাঙালিই ছিল। সস্তা হলেও কোনো জিনিস সে কিনতে পারেনি। ডাক্তার সাহেব, এরা তো (অর্থাৎ আমরা) সে দিনের ছাওয়াল। এরা বুঝবে না। কিন্তু আপনি আমি জানি। বাঙালির বিশেষ করে কৃষিজীবী মুসলমান বাঙালির হাতে কোনো কাঁচা পয়সা থাকতো না। ধান কাটার মরশুমে পেট পুরে গরম ভাত খেতাম। আর পাটের সময় হলে বিক্রি করে কিছু নগদ পয়সা জুটতো। এই টাকা দিয়ে আমাদের বাবা–চাচারা ইলশা মাছ কিনে আনতেন। মা–চাচীর জন্য শাড়ি আর নিজেদের জন্য কিনতেন লুঙ্গি। আমাদেরও নতুন কাপড় জুটতো বছরে পাটের মরশুমে ওই একবারই। এই তো বাঙালি মুসলমানের অর্থনীতির অবস্থা।

এই অবস্থাটা মনে রেখে ভাবো স্বাধীন–সার্বভৌম বাংলাদেশের কথা। প্রকৃত অর্থে এই প্রথম বাঙালিরা সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হয়েছে। এবং এই প্রথম বাঙালির হাতে কিছু নগদ পয়সা আসছে। ব্যাপারটা খুব বড়ো, তাৎপর্যপূর্ণ। এর একটা উত্তেজনা আছে। বাঙালি বিশেষ করে তরুণরা এখন বাঁধনহারা। সমাজ পরিবর্তনের প্রবল ও আকস্মিক ধাক্কায় দিশাহারা। কেউ গাড়ি কিনছে, কেউ ফাইভ ফিফটি ফাইভ ফুঁকছে, কেউ ছিনতাই–হাইজ্যাক করছে। অবাধ স্বাধীনতার এই আকস্মিক স্বাদ ও হাতে আসা নগদ অর্থ দিশাহারা করেছে অনেককে। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠান তৈরি করে এদের দায়িত্ব সচেতন করা হবে; নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে। আনতে হবে। দেশটা তো শুধু মধ্যবিত্তের না, আমার গরিব–দুঃখী মানুষের। আসল ত্যাগ তো তারাই স্বীকার করেছে। তাদের অবস্থার পরিবর্তন যদি করতে পারি তবেই অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে। আমার দেশের মানুষ আমাকে জাতির পিতা বলে, কতজন আমার জন্য রোজা রেখেছে, জান দিয়েছে–আমার দায়িত্ব বড়ো বেশি। ডাক্তার সাহেব, আপনারা সাহায্য করেন, সোনার মানুষ দেন, আমি সোনার বাংলা গড়ে তুলি।'

সেদিনের মতো আমাদের সঙ্গে তাঁর আলাপ এভাবেই শেষ হলো। তিনি তাঁর ক্যামেরাম্যান আলমকে ডাকলেন। নতুন যে ক্যামেরা কিনে দিয়েছেন তা ঠিকমতো কাজ করছে কিনা জানতে চাইলেন। পরে আমাদের সঙ্গে ছবি তুললেন। আলমকে বললেন, 'এই ছবির কপি বাংলা একাডেমিতে এদের পৌঁছে দিবি। এই ছবির আলাদা গুরুত্ব আছে।'

না, আলম সাহেব আমাদের কোনো ছবি দেননি। জিল্লুর রহমান বহুদিন তাঁর কাছে ঘুরেও সে ছবি আদায় করতে পারেননি। আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুর আদেশ, নির্দেশ ও কথা এইভাবে অমান্য করেছি। সেজন্যই মহান, আন্তরিক ও সরল মানুষটি কাউকে অবিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের ওই বিখ্যাত উক্তি : 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' –এ প্রবল আস্থা রাখতেন। এটাই তাঁর জন্য কাল হয়েছিল। তিনি ডালিমদেরও বিশ্বাস করেছিলেন। বাড়িতে এসে ঘুরেফিরে সবকিছু দেখতে দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমাদের দ্বিতীয়বার আলাপের সুযোগ ঘটে কিছুকাল পরেই এবং সেটাও বাংলা একাডেমির কাজেই। তখন একাডেমির মহাপরিচালক ড. নীলিমা ইব্রাহীম, আমাদের শ্রদ্ধেয় নীলিমা আপা। তিনি নিয়োগ পেয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে যান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। একাডেমির কয়েকজন সিনিয়র অফিসারকেও তিনি সঙ্গে নেন। আমিও সেই দলে ছিলাম। আমাদের সাবেক সহকর্মী ও গল্প লেখক আবুল হাসানাতও ছিলেন। হাসানাত তখন বঙ্গবন্ধুর ওপর খুব ক্ষুব্ধ। তিনি তাঁর 'বাবাই দায়ী' গল্পগ্রন্থে এই ক্ষোভের কিছু ছোপ দিয়েছেন। আমি তাঁকে বলি, 'Politics is a difficult game', ভেতর থেকে না দেখলে সবকিছু বোঝা যায় না। তিনি আমাদের কথায় আশ্বস্ত হন না। তো, আমি তাকে বলি, আমাদের দলের সঙ্গে তুমিও চলো। তোমার ক্ষোভ অভিযোগ সামনা-সামনিই বলবে। আবুল হাসানাত বলে, হ্যাঁ, যেয়ে ওই সব ক্ষোভ জানিয়ে চাকুরিটা হারাই! আমি বলি, তোমার চাকুরি রাখার দায়িত্ব আমি নেব। তিনি শেষ পর্যন্ত রাজি হন। এবং আমরা নীলিমা আপার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়ির নিচের তলায় ড্রয়িংরুমে কথা বলি। প্রথমে আপা সৌজন্য বিনিময় করেন। একাডেমি কেমন চলছে বঙ্গবন্ধু জানতে চান। নিয়মকানুন যে আগে তেমন মানা হয়নি সে প্রসঙ্গ ওঠে। বঙ্গবন্ধু ইঙ্গিতটি বোঝেন এবং কোনো নাম উচ্চারণ না করে বলেন, 'হ বইন, বুঝছি সব দোষ আমার। যত দোষ নন্দ ঘোষ।' তিনি একটু বিড়বিড় করে বলেন, 'কি আর করবো, যেখানে যাকে বসাই সেখানেই সে সমস্যা সৃষ্টি করে।' আপা একাডেমির জন্য সাহায্য-সহযোগিতা চাইলেন। তিনি বললেন, 'বাংলা একাডেমির কোনো সমস্যা হবে না।'

সেদিন বঙ্গবন্ধু খুব ব্যস্ত ছিলেন, শেষ দিকটায় কথা হলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আমি হাসানাতকে নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বঙ্গবন্ধু আমার কাঁধে একটা হাত রাখলেন। মনে হলো পিতৃস্নেহের পরশ পাচ্ছি। অন্য একটা হাত বাড়িয়ে হাসানাতের বুকের মধ্যে মৃদু আঙুল ঠেকিয়ে কথা বলতে থাকলেন। আমি হাসানাতের চোখের দিকে তাকালাম। সে চোখে তখন কোমল, কমনীয় স্নিগ্ধতা। আবেগে সে বিনম্র হয়ে উঠেছে। কোনো কথাই সে বলল না। বঙ্গবন্ধুর কথা শুধু শুনে গেল।

সাক্ষাৎ শেষে বেরিয়ে এসে বললাম, কই হাসানাত তুমি যে কিছুই বললে না? হাসানাত বলল, এ যে রাজনৈতিক জাদুকর। আমাকে মুগ্ধ, অভিভূত করে ফেললেন। কোনো কথাই মুখ থেকে বের করতে পারলাম না। অত বড়ো ব্যক্তিত্ব আর আন্তরিকতার নিজস্ব ধরন দিয়ে আমাকে একেবারে গলিয়ে ফেললেন।

লেখক : ফোকলোর বিশারদ ও গবেষক, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি

প্রবন্ধ

বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন স্বপ্নের সীমানায় গৌরবের আকাঙ্ক্ষায়

সেলিনা হোসেন

শোকের মাস যেন একটি কালো গোলাপ। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখানো এক অবিনাশী মানুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জীবন-মৃত্যুর দুই গভীর জায়গায় তিনি আমাদের সামনে দাঁড়ানো। মৃত্যুর অবধারিত সত্য মেনে নিয়ে তিনি আমাদের সামনে অমরত্বের সাধনা ।

এ দুটো সত্যকে এক করে আগস্ট মাস প্রবলভাবে অর্থবহ। তিনি ছিলেন বলে আমরা স্বাধীনতার মতো বড়ো অর্জন পেয়েছি। স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে নিজ অবস্থান তৈরি করেছে। তাঁকে সামনে রেখে চলছে পথচলা। খুঁজে নেওয়া হচ্ছে দিক-নির্দেশনা। তিনি আছেন। সহায়ক শক্তি হিসেবে গণমানুষের চেতনায় প্রদীপ্ত আলো। গণমানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় জাগরণের গান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ছড়িয়ে আছে তাঁর আদর্শ ও স্বপ্ন । দুঃখী মানুষের জীবন বদলানোর জন্য তাঁর অন্তহীন প্রেরণায় আজকের বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতির জন্য শোক কোনো শেষ কথা নয়। শোক যে শক্তির উৎস হয়, বাংলাদেশ তার প্রমাণ। এদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে। ফাঁসির রায় কার্যকর হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, নিকট ভবিষ্যতে বাকি রায়ও কার্যকর হবে। তাঁর মৃত্যুর পরে এদেশে মৌলবাদীদের উত্থান ঘটে। তারা চেয়েছিল দেশটিকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে ঠেলে দিতে।

কিন্তু সেটা হয়নি। শোককে শক্তিতে পরিণত করেছে দেশের মানুষ। ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ মানবিক চেতনার ঠিকানা। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আজকের বাংলাদেশ মানুষের প্রকৃত আবাসস্থল হোক–এটাই সবার প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশার জয়গানে মুখরিত আজ শোকের মাস। তাঁর বক্তৃতার বাণী নিজেদের কণ্ঠে তুলে বলতে হবে, 'বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান বাংলাদেশে যারা বসবাস করেন, তারা সকলেই এদেশের নাগরিক। প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা সম-অধিকার ভোগ করবেন'। বঙ্গবন্ধুর বাণী পৌঁছে যাক প্রত্যেকের চেতনায়। মানুষের মর্যাদায় প্রদীপ্ত থাকুক তাঁর অবিনশ্বর চেতনা।

তরুণদের রোল মডেল কে হতে পারে– এমন একটি প্রশ্ন আমাকে করেছিল তরুণ লেখক সজিব। তরুণদের মাঝে এই প্রশ্নটির উত্তর পৌঁছে দেওয়ার জন্য এভাবে চিন্তা করেছিল ও।

এমন একটি প্রশ্ন করার জন্য ওকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলাম, আমাদের বেড়ে ওঠার সময়টা ছিল ষাটের দশকের গণজাগরণের সময়। সেসময় আমরা অনুসরণ করার মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পেয়েছিলাম। একটি জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থসামাজিক আন্দোলনে সারাজীবন তাঁর যে সোচ্চার অবস্থান, তরুণরা তা অনুসরণ করতে পারে। তিনি সাংস্কৃতিক চেতনাকে কত গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন সে প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ উল্লিখিত হতে পারে।

১৯৬৬ সালে ৬ দফা দাবি উপস্থাপন করার পরে তিনি তাঁর জনসভার শুরুতেই শিল্পীদের দিয়ে, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি গাওয়াতেন। এখন বুঝতে পারি, তিনি জনসভার হাজার হাজার মানুষের আবেগ ধরে তাদেরকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করেছেন আগে। তারপর নিজের বজ্রকণ্ঠে অধিকারের কথা বলেছেন। অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে মানুষকে উজ্জীবিত করেছেন। মানুষ সেই লড়াইয়ে জীবন দিতে দ্বিধা করেনি। রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির যোগসাজসে অর্জিত হয়েছে বাঙালির গর্বের স্বাধীন বাংলাদেশ।

আমাদের দেশ ও সংস্কৃতির বাইরের কথা যদি বলি , আমি নেলসন ম্যান্ডেলার কথা বলব। এই বিশ্বনেতা ২৭ বছর জেল খেটেছেন। তবু তিনি হাল ছাড়েননি, মানুষের পক্ষে কাজ করেছেন। তাদের মুক্তির আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, সফল হয়েছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি তরুণদের সামনে একজন অজেয় মানুষ।

তেমনি কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রোর কথা বলতে হয়। নিজের দেশকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের বলয় থেকে বের করার জন্য বিপ্লবীর ভূমিকায় সারাজীবন উৎসর্গ করেছেন। মানুষের

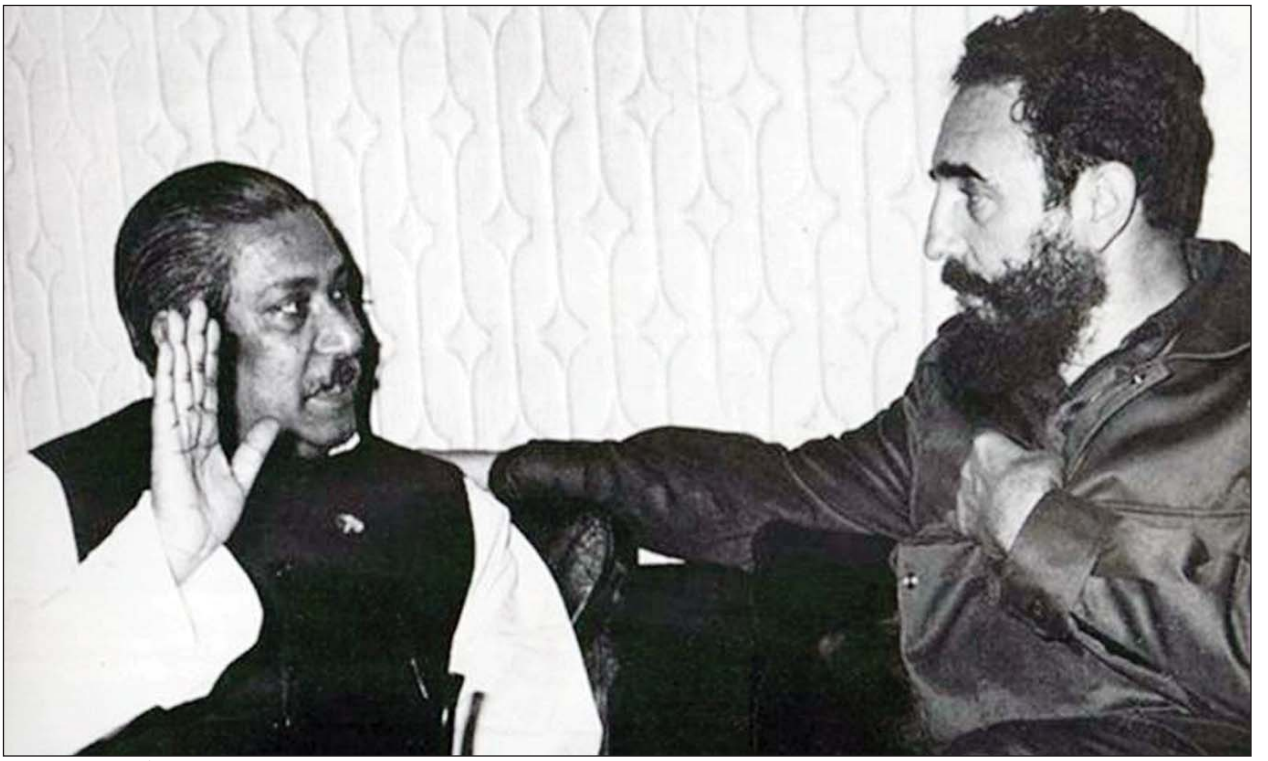

কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পক্ষে থাকার জন্য ক্ষমতায় থেকেছেন। তাঁর আদর্শের জায়গায়, দর্শনের চিন্তা থেকে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি, শেখ মুজিবকে দেখেছি'। আর একজন নেতার অর্জনকে এভাবে মূল্যায়ন করে তিনি সাংস্কৃতিক চেতনার জায়গা সমৃদ্ধ করেছিলেন। এটা একটা বিশাল বড়ো দিক। তরুণরা নেতৃত্বের জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে বঙ্গবন্ধু, নেলসন ম্যান্ডেলা, ফিদেল কাস্ত্রোর মতো নেতাকে রোল মডেল ভাবা উচিত–তরুণরা যদি দেশের কথা ভাবেন, নিজের অস্তিত্বের কথা ভাবেন, নিজের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কথা ভাবেন।

তাহলে তাদের অবশ্যই নিজস্ব অবস্থানে ফিরে আসতে হবে। ধর্ম পবিত্র বিশ্বাস। ধর্ম কখনো বলেনি মানুষ হত্যা করে নিজের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করার কিংবা নিজের দর্শনকে আলোকিত করার কথা। বিপথগামী তরুণদের সামনে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারা যেন কখনো ভুল বিশ্বাস নিয়ে মানুষের জীবনে প্রলয় সৃষ্টি না করে। অসাম্প্রদায়িক চেতনা মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড়ো জায়গা।

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের পুরোটা সময় অসাম্প্রদায়িক বোধকে লালন করেছেন। তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* থেকে জানা যায় যে, তিনি স্কুল জীবনেই ধর্মের ঊর্ধ্বে মানুষকে চিনেছিলেন। তাঁর চেতনায় কোনো ভুল ছিল না। ১৯৭২ সালের মে মাসে রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দানে তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'আর সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুসলমান তার ধর্মকর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্মকর্ম করবে। বৌদ্ধ তার ধর্মকর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু ইসলামের নামে আর বাংলাদেশের মানুষকে আর লুট করে খেতে দেওয়া হবে না।' এভাবে তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মর্যাদাকে তাঁর আদর্শে অমলিন রেখেছিলেন। এমন মানুষকেই নিজের চেতনার সামনে দেখবে তরুণরা।

চেতনার এই অমলিন জায়গা থেকে একদিন তরুণদের মুখে উচ্চারিত হবে 'আমিই শেখ মুজিব'। দেশপ্রেম দেশবাসীর সহজাত অনুভব। দেশপ্রেমের ধারণা থেকে মানুষ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। 'আমিই শেখ মুজিব' দেশপ্রেমের অবিনশ্বর ধারণার মৌলিক সূত্র।

আমিই শেখ মুজিব

যেখানেই তাঁর ছায়া
সেখানেই তিনি বিশাল গাছ
যেখানেই তাঁর হাসি
সেখানেই তিনি তেরোশত নদী
যেখানেই তাঁর দৃষ্টি
সেখানেই পাহাড়ের উচ্চতায় সূর্যের আলো
যেখানেই তাঁর তর্জনি
সেখানেই দিগন্তরেখায় আকাশের নত হওয়া
যেখানেই তাঁর বজ্রকণ্ঠ
সেখানেই লক্ষ মানুষের নিস্পন্দ শ্রবণ
যেখানেই তাঁর আহ্বান
সেখানেই পথ-প্রান্তর মাড়িয়ে ছুটে আসা মানুষের পদধ্বনি
তিনি নেই এমন জনপদ বাংলাদেশে নেই
তিনি এই মানচিত্রের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
হাজার বছর ধরে
তাঁর নামের জয়ধ্বনির সঙ্গে
তরুণ প্রজন্মের কণ্ঠে উচ্চারিত হবে,
আমিই শেখ মুজিব।

লেখক: কথাসাহিত্যিক

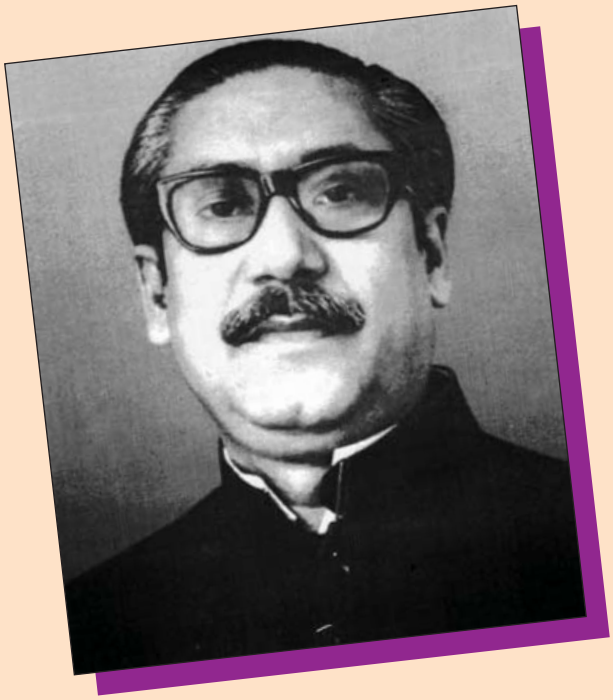

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সমার্থক

আনিসুল হক

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সমার্থক। *যারা ভোর এনেছিল* কিংবা *উষার দুয়ারে*- ইতিহাসভিত্তিক এই উপন্যাসগুলো লিখতে গিয়ে আমাকে ইতিহাসের অলিগলি রাজপথ পরিক্রম করতে হয়েছে। ইতিহাস যতই পড়েছি, ততই এই প্রত্যয় উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মই হয়েছিল বাংলাদেশটাকে তিনি স্বাধীন করবেন বলে। তিনি তাঁর সারাটা জীবন একটা লক্ষ্য নিয়েই কাজ করেছেন, এগিয়ে গেছেন– বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি। এই লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে তিনি বার বার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন, তিনি ও তাঁর পরিবার অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট-যাতনা ভোগ করেছেন, কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হননি, তিনি আমাদের স্বাধীন করে গেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন তিনি কখন দেখতে শুরু করেন?

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজের ভাষায়, 'সেই ১৯৪৭ সালে। তখন আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দলে'। (অন্নদাশংকর রায়, ইতিহাসের মহানায়ক, প্রকাশক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২০১১)। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা বিদায় নিল, পাকিস্তান আর ভারত–দুটো দেশ জন্ম নিল। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের সিরাজউদ্দৌলা হলে যুবক শেখ মুজিব ডাকলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্র-যুবা কর্মীদের। বললেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি। এবার আমাদের যেতে হবে বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে। এই স্বাধীনতা স্বাধীনতাই নয়'।

বঙ্গবন্ধু ১৯৪৭-এ পূর্ব বাংলায় ফিরেই মুসলিম লীগ সরকার ও পশ্চিমাদের বাঙালিবিরোধী অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৪৮ সালেই তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মিছিলের নেতৃত্ব দেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তিনি কারাবরণ করেন।

তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীও তাঁকে চিঠি লিখে বলেছিলেন, বাংলাকে আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে মেনে নিতে, কিন্তু রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকেই গ্রহণ করতে। গোয়েন্দা সংস্থার গোপন রিপোর্টে বলা হয়েছে,

> 'শেখ মুজিবুর রহমান ডিজঅ্যাপ্রুভড দি সাজেশন অব মিস্টার সোহরাওয়ার্দী টু গিভ রিজিওনাল স্ট্যাটাস অব বেঙ্গলি। শেখ মুজিবুর রহমান রিসিভড দি সাজেশনস অব মিস্টার সোহরাওয়ার্দী থ্রু এ লেটার'। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জীবন ও রাজনীতি, সম্পাদক মোনায়েম সরকার)। অন্য কর্মীরাও সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে একমত হলো না।

শেখ মুজিবের পেছনে গোয়েন্দারা ছায়ার মতো লেগে থাকত। তিনি কখন কী করতেন, সেই ১৯৪৮-১৯৪৯ সাল থেকেই তাঁর সম্পর্কে রিপোর্ট করা হতো সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতো। গ্রেপ্তারের পরই তাঁর মুক্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়ে যেত। তাঁকে জামিনের জন্য কোর্টে নেওয়া হলে সেখানেও ভিড় জমে যেত। তিনি সেই জনতার উদ্দেশে আবার বক্তৃতা করতে শুরু করতেন মুসলিম লীগ সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে। ১৪ই মার্চ ১৯৫১-এ শেখ মুজিবের গতিবিধি সম্পর্কে সরকারি নথিতে বলা হচ্ছে,

> গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার লুৎফর রহমানের পুত্র শেখ মুজিবুর রহমানকে গোপালগঞ্জ কোর্ট থেকে ১৪ মার্চ জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। কিছু সংখ্যক ছাত্র মিছিল সহকারে তাঁকে নিয়ে বের হয়ে আসে ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবুর রহমান সভায় ভাষণ দেন। তিনি মওলানা ভাসানীসহ অন্যদের বিনা বিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। মুজিবুর রহমানকে সেদিনই গ্রেফতার করা হয়।...পরের দিন তাঁর মুক্তির দাবিতে গোপালগঞ্জে হরতাল পালিত হয়। স্থানীয় ছাত্ররা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ও ফ্রান্স কর্তৃক মরক্কোর ওপরে নিপীড়নের প্রতিবাদে মিছিল করে। মিছিল শেষে সভায় শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য লড়াই করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়'। (ইংরেজি থেকে অনুবাদ লেখকের)।

এই ছিল ওই সময়কার নিত্য চিত্র। শেখ মুজিব জেল-জুলুমকে পরোয়া করতেন না। সাহস, দেশপ্রেম আর আপোশহীনতা ছিল তাঁর রক্তের কণায়।

সরকারি গোয়েন্দারা তাঁর মুচলেকা আদায়ের চেষ্টা করেছেন, তিনি কখনো মুচলেকা দিতেন না, বলতেন, সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদ তিনি করেই যাবেন। এখন সেই গোয়েন্দাদের সরকারি রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, তাঁরা বলতেন, এই বন্দির অবস্থান খুব শক্ত। তাঁকে টলানো যায় না।

১৯৫১ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি খুলনা কারাগারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের রিপোর্ট দিচ্ছেন জনৈক গোয়েন্দা ২৬শে ফেব্রুয়ারিতে, 'হি ওয়াজ নট উইলিং টু এক্সিকিউট এনি বন্ড ফর রিলিজ ইভেন ইফ দি ডিটেনশন উড কজ হিম টু ফেস ডেথ। হিজ অ্যাটিচুড ওয়াজ ভেরি স্টিফ'। এই বাক্যগুলো খেয়াল করুন, যদি তাঁর অন্তরিন থাকাটা তাঁর মৃত্যুও ডেকে আনে, তবু তিনি কোনো মুচলেকায় স্বাক্ষর করবেন না। তাঁর মনোভাব ছিল ভীষণ অনড়। যতবার যতজন

গোয়েন্দা তাঁর কাছে বন্ড স্বাক্ষর করাতে গেছেন, ততবার তাঁরা একই মনোভাবের পরিচয় পেয়েছেন, একই কথা লিখেছেন। ২২শে মে-র গোয়েন্দা রিপোর্টেও বলা হচ্ছে,

> 'তিনি (মুজিব) তাঁর অতীতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে মোটেও অনুতপ্ত নন, বরং তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে তাঁর মুক্তির পর একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তাঁর কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাবেন। কী করবেন, সেকথা জানাতে তিনি অনিচ্ছুক। মুক্তি পেতে তিনি খুবই আগ্রহী, কিন্তু মুক্তির জন্য কোনো বন্ডে তিনি সই না করার ব্যাপারে স্থিরচিত্ত। হিজ অ্যাটিচুড ওয়াজ ভেরি স্টিফ...তাঁর মনোভাব খুবই অনড়'।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় কারাগারে বঙ্গবন্ধু অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। তাঁকে কিছুতেই খাওয়ানো যাচ্ছিল না। তাঁর হার্ট দুর্বল ছিল, জীবনহানির আশঙ্কা দেখা দিল। শেষে সরকার তাঁর প্রতিজ্ঞার কাছে নতি স্বীকার করল। তিনি মুক্তি পেলেন। টুঙ্গিপাড়ায় গেলেন। সে সময়ের একটা ঘটনা তিনি *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে লিখেছেন,

> একদিন সকালে আমি ও রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাচু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর 'আব্বা আব্বা' বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। একসময় কামাল হাচিনাকে বলছে, "হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি'। আমি আর রেণু দু'জনই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, 'আমি তো তোমারও আব্বা'। কামাল আমার কাছে আসতে চাইত না। আজ গলা ধরে পড়ে রইল। বুঝতে পারলাম, এখন আর ও সহ্য করতে পারছে না। নিজের ছেলেও অনেক দিন না দেখলে ভুলে যায়! আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস।

এই ছিল বাস্তবতা। শেখ মুজিব লড়ছেন বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য, তাই তাঁকে জীবনের অনেকটা সময় কাটাতে হচ্ছে কারাগারে, তাঁর ছেলে তাঁকে ভাবছে আপার আব্বা। শেখ মুজিব যদি তাঁর নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বড়ো করে দেখতেন, বেগম মুজিব যদি তাঁর পরিবারের সুখ ও নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন যে-কোনো সাধারণ নারীর মতো, তাহলে এই দেশটা এত সহজে স্বাধীন হতো না। বঙ্গবন্ধু নিজের প্রাণের ভয়ে কোনোদিনও ভীত ছিলেন না। ওই ১৯৫১ সালে কারাগারে জেরা করতে আসা গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে তিনি যে কথা বলেছেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা-ই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র– যদি মৃত্যু আসে আসুক, তবু বাংলার মানুষের মুক্তির প্রশ্নে কোনো আপোশ নয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর ফাঁসি হতে পারত, ওই সময় বন্দিশালায় তাঁকে গুলি করে মারার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। তাঁর নিজের ভাষায় 'আমি দুই দুইবার মরতে মরতে বেঁচে গেছি। প্রথমবার আইয়ুব খানের বন্দিশালায় ষড়যন্ত্রের মামলায়। আমার এক সাথী আমাকে সতর্ক করে দেয় যে, সন্ধ্যাবেলা সেলের বাইরে গিয়ে নিয়মিত বেড়ানোর ব্যাপারটি বিপজ্জনক। পেছন থেকে গুলি করবে আর বলবে পালিয়ে যাচ্ছিল বলে গুলি করেছি। অন্যের বেলা ঘটেও ছিল ওরকম গুলি চালনা। দ্বিতীয়বার ইয়াহিয়া খানের কারাগারে। আমার সামনেই আমার কবর খোঁড়া হচ্ছে। বুঝতে পারছি যে আমার সময় ঘনিয়ে আসছে'। (অন্নদাশংকর রায়)।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে এইভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। একাত্তর সালে যখন পাকিস্তানের কারাগারে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে, তখন তাঁর মৃত্যুদণ্ড স্থির হয়ে গিয়েছিল, তাঁর জন্য সেলের পাশে কবর খোঁড়া হয়েছিল। সামান্য আপোশ বাংলাদেশের মুক্তির পথকে বাঁকা আর দুর্গম করে তুলতে পারত। তা তিনি করেননি।

অন্যদিকে আছেন বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রিয় রেণু। কী অসাধারণ এক নারীই না পেয়েছিলাম আমরা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে! যাঁর কথা ইতিহাসে আসে না। কারণ, নারী ও পরিবারের সদস্যদের ত্যাগ আর অবদানের কথা থেকে যায় ইতিহাসের অন্তরালে। আমাদের ইতিহাসের দুটো খুব মাহেন্দ্রক্ষণে বেগম মুজিব নীরবে আমাদের ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিকে ইতিবাচকভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। একটা হলো উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সময়। শেখ মুজিব তখন

১৯৪৯ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসেবে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি। ওই সময় একটা গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবকে অংশগ্রহণ করানোর জন্য প্যারোলে মুক্তি দিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছিল। সারাদেশে প্রচণ্ড আন্দোলন হচ্ছে। আর এই সময় শেখ মুজিব প্যারোলে মুক্তি নিয়ে যাবেন আইয়ুব খানের সঙ্গে বৈঠক করতে! বেগম মুজিব তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠালেন বড়ো মেয়ে হাসিনাকে। শেখ হাসিনার হাতে চিরকুট দিলেন। শেখ হাসিনাও সেই চিরকুটের বার্তাটা মুখস্থ করে নিলেন যদি প্রহরীরা চিরকুট কেড়ে নেয়! বেগম মুজিবের বার্তাটা ছিল,

> সারা দেশের মানুষ তোমার মুক্তির দাবিতে আন্দোলনরত, খবরদার তুমি প্যারোলে মুক্তি নিবা না। যদি তুমি প্যারোলে মুক্তি নিয়ে আস, আমি তোমার বিরুদ্ধে পল্টনে সভা করব। (শেখ হাসিনার কিছু স্মৃতি কিছু কথা, মঞ্জুরুল ইসলাম, সময় প্রকাশনী)।

সেই বার্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার ছাত্রী শেখ হাসিনা পৌঁছে দিয়েছিলেন। শেখ মুজিব সেদিন সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি প্যারোলে মুক্তি নেননি। বঙ্গবন্ধু হিসেবে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে এসেছিলেন।

একাত্তরের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক জনসভায় যোগ দিতে যাবেন বঙ্গবন্ধু। তিনি খুব অস্থির। একদিকে ছাত্র জনতার প্রচণ্ড চাপ, আজই স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে হবে। অন্যদিকে সারা পৃথিবী তাকিয়ে আছে ওই ভাষণটির দিকে। আমরা আজ জানি, এমনকি আমেরিকার কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকার ক্ষমতাকেন্দ্রও নির্ঘুম অপেক্ষা করছিল শেখ মুজিব কী বলেন তা জানার জন্য। ইউনিল্যাটারাল ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স যদি আসে, তার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত পাকিস্তানি মিলিটারি। এই অবস্থায় কী করবেন বঙ্গবন্ধু! নিজের ঘরে তিনি পায়চারি করছেন। বেগম মুজিব তাঁকে বললেন, তুমি এত অস্থির কেন। শুয়ে খানিকক্ষণ রেস্ট নাও। মুজিব শুয়ে পড়লেন। তাঁর মাথার কাছে মোড়া নিয়ে বসা শেখ হাসিনা, পায়ের কাছে বেগম মুজিব। বেগম মুজিব বললেন,

> তুমি তোমার নিজের বিবেকের কথা বলবা। তোমার সামনে লক্ষ মানুষের হাতে বাঁশের লাঠি, পেছনে বন্দুক। তুমি তা-ই বলবা, যা তোমার অন্তর বলতে চায়।

শেখ মুজিব খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকে উঠলেন। যাওয়ার আগে বেগম মুজিবের কপালে চুম্বন করলেন। খানিকটা দেরি করেই তিনি পৌঁছালেন সভামঞ্চে। মানুষ তখন অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে, নির্মলেন্দু গুণের ভাষায়,

> কখন আসবে কবি?
> শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
> রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
> অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
> ...গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর
> অমর কবিতাখানি :
> এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
> এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

এত ত্যাগ, এত বীরত্ব, এত ভালোবাসা, এত প্রজ্ঞা দিয়ে মানুষটি আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন! ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে স্বাধীনতা ঘোষণার ওই দিবাগত রাতে তিনি সাংবাদিক আতাউস সামাদকে বলেছিলেন, 'আই হ্যাভ গিভেন ইউ ইন্ডেপেন্ডেন্স, নাউ প্রিজার্ভ ইট' (আজকের কাগজ-২২/১/৯৩)। আমাকে আতাউস সামাদ একাধিকবার বলেছেন, ২৫শে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু তাকে বলেছিলেন,

> 'আমি ইউডিআই দিচ্ছি (ইউনিল্যাটারাল ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেনডেন্স বা স্বাধীনতার একতরফা ঘোষণা)। আমি তোদের স্বাধীনতা দিয়ে গেলাম, যা, তোরা রক্ষা কর'।

ইথারে ছড়িয়ে পড়ল সেই ঘোষণা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।

১৯৭২ সালে সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,

> ফ্রস্ট : আজ এই মুহূর্তে অতীতের দিকে তাকিয়ে আপনি কোন দিনটিকে আপনার জীবনের সব চাইতে সুখের দিন বলে গণ্য করবেন? কোন মুহূর্তটি আপনাকে সবচাইতে সুখী করেছিল?
>
> শেখ মুজিব : আমি যেদিন শুনলাম, আমার বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সে দিনটিই ছিল আমার জীবনের সবচাইতে সুখের দিন।
>
> ফ্রস্ট: আপনার জীবনের সবচাইতে সুখের দিন?
> শেখ মুজিব: সমগ্র জীবনের সবচাইতে সুখের দিন!
> ফ্রস্ট: এমন দিনের স্বপ্ন আপনি কবে থেকে দেখতে শুরু করেন?
> শেখ মুজিব: বহুদিন ধরে আমি এই স্বপ্ন দেখে আসছি।

তাঁকে হত্যা করার জন্য বার বার সব আয়োজন সম্পন্ন করেও পাকিস্তানিরা তাঁকে মারতে পারেনি! ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার আগে ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, আমাকে আর দুটো দিন সময় দিন, আমি শেষ কাজটা করে নিই, শেখ মুজিবের মৃত্যুদণ্ডটা কার্যকর করি।

সেই মৃত্যুদণ্ড সেদিন কার্যকর হয়নি। হয়েছে আরও চার বছর পরে। আর তাঁর প্রাণ কেড়ে নেবে বাঙালিরা, এটা বঙ্গবন্ধু কোনোদিনও ভাবতে পারেননি। তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হতে পারে, এই সব তথ্য বিভিন্নভাবে তাঁর কাছে পৌঁছানো হয়েছিল, এমনকি ভারতীয়রাও এই তথ্য জানাতে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিল। আমেরিকার অবমুক্ত নথি থেকে আমরা আজ তা জানি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালিদের বিশ্বাস করতেন নিজের চেয়েও বেশি। তিনি মৃত্যুকে ভয় পেতেন না, আর এটা তাঁকে বিশ্বাস করানো অসম্ভব ছিল যে, কোনো বাঙালি তাঁকে আঘাত করতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর সবচেয়ে বড়ো গুণ হলো তিনি তাঁর দেশের মানুষকে বেশি ভালোবাসেন। আর তাঁর সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হলো, তিনি দেশের মানুষকে একটু বেশিই ভালোবাসেন। সেই ভালোবাসা আর বিশ্বাস তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠল। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁকে হত্যা করেছে যারা, তাদের ভাষা ছিল বাংলা, তাদের হাতে ছিল গরিব বাঙালির রক্ত পানি করা টাকায় কেনা অস্ত্র। শুধু বঙ্গবন্ধু নন, শুধু বেগম মুজিব নন, শিশুপুত্র রাসেল, গর্ভবতী পুত্রবধূও রেহাই পায়নি সেই হত্যাকাণ্ডের রাতে!

জাতির পিতাকে হত্যা করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকেই পেছনের দিকে ফেরানোর চেষ্টা করা হলো। তাঁর নাম মুছে দেওয়ার চেষ্টা হলো নানাভাবে। কিন্তু দিন যতই যাচ্ছে, ততই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন তিনি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাঙালি জাতির পিতা। বিবিসি বাংলার জরিপে যে উঠে এসেছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, তা যথার্থ কারণ বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে তিনিই বাঙালিকে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন। আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কথা দুটো সমার্থক হয়ে উঠেছে।

লেখক: সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক

প্রবন্ধ

বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর কারাগারের রোজনামচা

খালেক বিন জয়েনউদদীন

বাঙালির প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ব্যাপক অর্থে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তাঁরই সংগ্রাম ও আন্দোলন এবং সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। তিনি বাঙালির হাজার বছরের নিগড় ভেঙেছেন। উপহার দিয়েছেন স্বাধীন স্বদেশভূমি– সোনার বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের অপর নাম শেখ মুজিব। কৈশোর থেকেই তাঁর স্বদেশ চেতনা সাতচল্লিশের স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করেছে ঠিকই কিন্তু সেই স্বাধীনতার স্বাদ উবে যেতে বসল পূর্ব বাংলার নেতৃবর্গ ও পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের ধ্যানধারণা থেকে। শুরু থেকেই পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য। প্রথমেই ভাষার প্রশ্নে বাঙালিকে ভাষার শোষণ, অর্থনৈতিক শোষণ, সামরিক শোষণ–সব মিলিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবর্গ পূর্ব বাংলাকে ততদিনে পূর্ব পাকিস্তান বানিয়ে ইংরেজদের মতো একটি উপনিবেশ হিসেবে ভাবতে শুরু করল। তারা প্রথমেই আক্রমণ করল মায়ের জবানের ওপর। যা পৃথিবীর কোনো মানুষই সহ্য করতে পারে না। সাতচল্লিশ থেকে আটচল্লিশের এগারোই মার্চ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের সেই প্রথম পর্বে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর কজন সহকর্মীই ছিলেন প্রধান সংগঠক। ভাষা সংগ্রাম তথা আন্দোলনের এ পর্ব থেকেই বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবন। অবশ্য ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন জেলে থেকেই নতুন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপর বাহান্ন'র ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্ন'র যুক্তফ্রন্ট গঠন, বাষট্টির ছাত্র বিক্ষোভ, আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের বিরোধিতা, স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ গঠন, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে 'কপ' গঠন, ছেষট্টিতে বাঙালির ম্যাগনাকার্টা ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা ও ৭ই জুন পালন কেবলমাত্র তাঁরই নেতৃত্বে বাস্তবে রূপ নিয়েছে। এরপর পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের ষড়যন্ত্রে পূর্বের ন্যায় তিনি গ্রেফতার। '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে মুক্তি, সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে হয়েছে। অবশ্য সকল আন্দোলন ও সংগ্রামে তাঁর শক্তি ছিল অধিকারহারা বাঙালি জণগণ। নির্বাচনে জিতেও যখন শাসনক্ষমতায় বাঙালি যেতে পারল না, অগত্যা তিনি ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন, আর এলক্ষ্যে করণীয় কর্মসূচির কথা তিনি ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বলে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পর মুহূর্তেই আবার বন্দি হলেন। তাঁর সহকর্মী এবং স্বাধীনতাকামী মানুষেরা প্রথমে ২৫শে মার্চের বাঙালি নিধনে প্রতিরোধ, সরকার গঠন, সশস্ত্র যুদ্ধ (মুক্তিযুদ্ধ) এবং বৈদেশিক সমর্থন আদায়ে প্রাণপণ লড়াইয়ে শরিক হন।

মাত্র ৯ মাসের যুদ্ধেই দখলদার পাকবাহিনী পরাস্ত। ১৬ই ডিসেম্বর দেশ শত্রুমুক্ত হলো। তখনও বঙ্গবন্ধু পাকি কারাগারে। পাক শাসক ইয়াহিয়ার পতনের পর ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু স্বদেশে ফিরে এলেন। এভাবেই কাটে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের প্রথম অধ্যায়। পরবর্তী সাড়ে তিন বছর তাঁর দেশ গড়ার পালা। '৭৪-এর সর্বদলীয় প্লাটফর্ম গঠন এবং সোনার বাংলা গড়ার আত্মপ্রত্যয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ– এভাবেই বঙ্গবন্ধুর বিপ্লবী জীবনের উত্থান।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, বাঙালির প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধুকে আমরা হারিয়েছি '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট। একাত্তরে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে শত্রুর অভাব ছিল না। বিশ্বের দুটি পরাশক্তি ছিল আমাদের বিরুদ্ধে। আর আমাদের ঘরে বিভীষণের অভাব ছিল না। তারা গভীর ষড়যন্ত্র করে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার নিহত করে। হত্যা করে তাঁর নিকট আত্মীয়স্বজন এবং মোহাম্মদপুরের বেশকিছু সংখ্যক লোককে। এভাবেই বাংলাদেশের স্বপ্নকে হত্যা করা হয়। দাবিয়ে রাখা হয় স্বাধীনতাকামী মানুষ এবং বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের। পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়। এক কথায় বলা যায়– এ সময় বঙ্গবন্ধু ছিলেন নিষিদ্ধ। একাশিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা স্বদেশে ফিরে এলে শক্তি-সাহস লাভ করে অধিকার-হারা মানুষ এবং 'নিষিদ্ধ'-র বেড়া ভাঙতে শুরু করে। অবশ্য সেই সংকটকালে সামরিক শাসকদের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে *মাসিক সমকাল*, *সাপ্তাহিক খবর* ও *মুক্তিবাণী* বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিবাদ এবং তাঁর কর্মময় জীবনের ঘটনাবলি প্রকাশ করতে শুরু করে। ১৯৯৬ সালে তাঁর প্রিয় মানুষেরা ক্ষমতায় এলে দুঃখ-শোকে বঙ্গবন্ধু বিকশিত হন বাঙালির হৃদয়ে। তারা জানতে পারে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রেক্ষাপট, খুনিদের আসল পরিচয়

ইত্যাদি। আর তখনই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা হয় হাজার হাজার গ্রন্থ। সকল প্রচারমাধ্যমে তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালির নয়নমণি। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে কলকাতার মনোহর সাহিত্য মন্দির থেকে। নাম *জয় ইন্দিরা জয় মুজিব*। এটি ছদ্মনামে লেখেন শশুবঁহ্নি। দ্বিতীয় বইটি খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের, নাম *মুজিববাদ*, প্রকাশকাল: ১৯৭২খ্রি.।

২০১২ সালের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। *দৈনিক ইত্তেহাদের* ফরিদপুর অঞ্চলের প্রতিনিধি থাকলেও সংবাদ লেখেননি। সাপ্তাহিক *নতুন দিন* প্রকাশের ব্যবস্থা করলেও তাঁকে সাংবাদিক বলা হয়নি। অবশ্য *দৈনিক ইত্তেফাক* প্রকাশনার সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁর প্রিয় মানিক ভাই মারা গেলে দুটি নিবন্ধ লেখেন। সারাজীবন পত্রিকায় রিপোর্ট পাঠিয়েছেন–এমন তথ্যও আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ২০১২ সালে যখন *অসমাপ্ত-আত্মজীবনী* প্রকাশ পেল তখন আমাদের পূর্ব ধারণা পালটে গেল। আমরা সকলেই জানি, বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক জীবনের প্রায় ১৩/১৪ বছর পাকি কারাগারে কাটিয়েছেন। এ সময় তিনি স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেছা রেনুর প্রেরণা ও অনুরোধ এবং প্রদত্ত এক্সারসাইজ খাতায় নিজের জীবনকাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। আত্মজীবনীর রচনাকাল: ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ, সময়কাল: শৈশব থেকে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ। পাশাপাশি ডায়েরি লিখেছেন।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র পর মার্চ ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে *বঙ্গবন্ধুর কারাগারের রোজনামচা*। ঐতিহাসিক এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে বাংলা একাডেমি। গ্রন্থটি প্রকাশের পর পাঠকদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। একাডেমিকে বইটি সরবরাহ করতে হিমশিম খেতে হয়। বইটির শুরুতে রয়েছে একটি ভূমিকা। এটি লিখেছেন তারই জ্যেষ্ঠকন্যা শেখ হাসিনা। প্রথমেই বঙ্গবন্ধুর কারাগার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ভূমিকার মধ্য পর্বে কীভাবে রোজনামচার খসড়া খাতাগুলো উদ্ধার ও সংরক্ষণ করা হয়েছে তার ঐতিহাসিক বর্ণনা দিয়েছেন শেখ হাসিনা। এই গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন তাঁরই ছোটো বোন শেখ রেহানা এবং শুরু হয়েছে 'থালা বাটি কম্বল, জেলখানার সম্বল' এমন মজার প্রবচন দিয়ে। ৩৩২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি সুমুদ্রিত।

বঙ্গবন্ধুর কারাগার জীবন শুরু হয় ১৯৩৮ সালে গোপালগঞ্জের জেল হাজতে। এরপর ১৯৪৮, ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৬৮ ও ১৯৭১-এ পাকিস্তানের কারাগারে থাকতে হয়েছে। একই বছরে বার বার গ্রেফতার এবং মুক্তি আর কোনো নেতার ভাগ্যে জোটেনি। কারাগারে বসে লেখা ডায়েরিগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশের কাহিনি শেখ হাসিনা বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> সেই সময় বন্দি অবস্থায় যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো অর্থাৎ ইন্টারোগেশন করা হতো সে কথাও লিখেছেন। একই কষ্টের জীবন বেছে নিয়েছেন বাংলার সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য। জনগণের জন্যই সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। কষ্ট করেছেন। মনের জোর ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার কারণেই তাঁকে এত কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন।
>
> প্রথম খাতাটা ১৯৬৬ সালে লেখা। আর দ্বিতীয়টা ১৯৬৭ সালে লেখা। এই সাথে আর কয়েকটি খাতায় ঐ সময়ের কথা লেখা ছিল সেগুলো সব ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হওয়ার পর ঘরের বাইরে কোর্টে নিয়ে যেত। কাঠগড়ায় সকল আসামিকে দেখতে পেয়েছিলেন। সকলের আইনজীবী ও পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত থাকতে পারতেন। পরিবারের সদস্য কতজন যেতে পারবে সে সংখ্যা নিদিষ্ট করে পাস দেওয়া হতো। যারা পাস পেত তারাই ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে কোর্টে যেতে পারত। কারণ কোর্ট ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেই বসতো। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যে খাতা দেওয়া হতো তার পাতাগুলি গুণে নাম্বার লিখে দিত। প্রতিটি খাতা সেন্সর করে কর্তৃপক্ষের সই ও সিল দিয়ে দিত। এই লেখাগুলি ছাপানোর জন্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমির ডিজি সার্বক্ষণিক কষ্ট করেছেন। বার বার লেখাগুলো পড়ে প্রুফ দেখে দিয়েছেন, বার বার সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর পরামর্শ আমার জন্য অতি মূল্যবান ছিল। তাঁর সহযোগিতা ছাড়া কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। বাংলা একাডেমিকে বইটি ছাপানোর জন্য দেয়া হয়েছে। সেলিমা, শাকিল, অভি সর্বক্ষণ সহায়তা করেছে। তাদের সহযোগিতায় কাজটা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ১৫ই মার্চ ২০১৭ গণভবনে সদ্য প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারাগারের রোজনামচা গ্রন্থটি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রীর ছোটো বোন শেখ রেহানা এসময় উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

কারাগারের রোজনামচা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মঞ্চে অন্যান্যের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

দ্রুত সম্পন্ন করতে পেরেছি। তাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাঠকদের হাতে বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই ডায়েরির লেখাগুলো যে তুলে দিতে পেরেছি তার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* বাঙালি জাতির অধিকার আদায় সংগ্রামের পথ প্রদর্শক। ভাষা আন্দোলন থেকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা অর্জনের সোপানগুলি যে কত বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এগুতে হয়েছে তার কিছুটা এই *কারাগারের রোজনামচা* বই থেকে পাওয়া যাবে। স্বাধীন বাংলাদেশ ও স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা বাঙালি পেয়েছে যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সেই সংগ্রামে অনেক ব্যথা-বেদনা, অশ্রু ও রক্তের ইতিহাস রয়েছে। মহান ত্যাগের মধ্য দিয়ে মহৎ অর্জন করে দিয়ে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই ডায়েরি পড়ার সময় চোখের পানি বাঁধ মানে না।

২৮শে মার্চ ২০১৭ গ্রন্থটির প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন:

আজ আমার তথা আমাদের একটাই কাজ, বাংলাদেশকে তাঁর সেই স্বপ্নের বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলা। সেটুকুই শুধু করে যেতে চাই যতটুকু পারি। তাঁর দুঃখী মানুষের মুখে যেন হাসি ফুটিয়ে যেতে পারি। যখনই একটু কাজ করি, যখন কোনো ভালো কাজ হয়, তখন কেবল এটুকু মনে হয় যে, আমার আব্বা আজ বেঁচে নেই, উনি থাকলে বহু আগে তো বাংলাদেশ , বাংলাদেশের মানুষ সত্যি উন্নত জীবন পেত। কিন্তু আজকে তিনি বেঁচে নেই। যদি একটু ভালো কাজ করি নিশ্চয়ই তাঁর আত্মাতো শান্তি পাবে। তিনি নিশ্চয়ই দেখেন, নিশ্চয়ই জানেন, নিশ্চয়ই তিনি এটা উপলব্ধি করতে পারেন। আমি এটুকুই বলব যে, বঙ্গবন্ধুর এই লেখার মধ্য দিয়ে অনেক কিছু জানতে পারবেন। তবে এখানেই শেষ না, তাঁর লেখা আরো আছে। সেগুলোও আমরা ধীরে ধীরে প্রকাশ করব। সেগুলোও মোটামুটি প্রস্তুত এবং যেহেতু ২০২০ সালে জন্মশতবার্ষিকী, এই জন্মশতবার্ষিকীর মধ্যেই এ লেখাগুলো সব আমরা প্রকাশ করব।

বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে লেখা এসবি'র রিপোর্ট আমাদের হাতে রয়েছে। বহু নেতার বিরুদ্ধে এসবি'র রিপোর্ট আছে। কিন্তু আপনারা অবাক হবেন যে, বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে প্রায় ৪৮ খানার মতো ফাইল যেখানে ৩০-৪০ হাজার পাতা তাঁর বিরুদ্ধে লিখেছে। কিন্তু সেই বিরুদ্ধ লেখার মধ্য দিয়েই একদিকে যেমন তাঁর জীবনীটা পাওয়া যায়, অপরদিকে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের অনেক কথা এখানে জানা যায়। সেটাও আমরা তৈরি করেছি, সেটারও কাজ চলছে এবং আমরা এগুলো ডিক্লাসিফাইড করে দিয়েছি।

আগে এটাকে আমরা ছাপাবো, বের করব একটা ডকুমেন্ট হিসেবে। তবে অফিসিয়াল অনেক লেখা সেগুলো আমরা বাদ দিচ্ছি। কিন্তু মূল কথাগুলো, মূল জিনিসগুলো যাতে থাকে এবং কীভাবে তিনি কাজ করেছেন, কীভাবে রাজনৈতিক দলটা গড়ে তুলেছেন, কীভাবে সমগ্র বাংলাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন–সবকিছু সেখানে সুন্দরভাবে লেখা আছে। সেটাও আমরা প্রকাশ করতে চাচ্ছি। খুব শিগগিরই প্রকাশ করব।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এক পর্যায়ে বলেন–যারা কারাগারের অভ্যন্তরের অজানা কাহিনি জানতে চান, কিংবা ভবিষ্যতে জেল হাজতের আশা করেন, তাদের জন্য এই বইটি অবশ্য পথ্য। তাঁর এই মজার বক্তব্য শুনে আমরা অনেকেই হেসে উঠি। মূলত এটি বঙ্গবন্ধুর জীবনের আখ্যান। শত শত ক্ষুদ্র ঘটনা। অবশ্য এসব ঘটনার সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ও সংগ্রাম ইতিহাস জড়িত ।

শুধু ডায়েরি নয়, গ্রন্থটির শেষ পর্বে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক জীবনের পরিচয়, বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি, ঢাকায় সেকালের রাজনীতিক পরিচয় ও ৬ দফা কর্মসূচির পূর্ণ বিবরণ। বইটির আরো আকর্ষণ বঙ্গবন্ধুর দুষ্পাপ্য ছবি। হৃদয়গ্রাহী গদ্যে কারাগারের দিনপঞ্জিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*ও তাই। শুধু ইতিহাস নয়, রাজনীতির পাশাপাশি তাঁর চিন্তা-চেতনাগুলো সাহিত্যের মানদণ্ডে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কথা জানার জন্য এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটি ইতোমধ্যে সচেতন পাঠকদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। *রোজনামচা* বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত হলেও তা এখন বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের আকর হয়েছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক

তুমি সেই বিপ্লবী

অসীম সাহা

দু'শ বছরের পুরনো ভারী একটা পাথরকে
সরিয়ে দেওয়ার কাজটা অত সহজ নয়।
বিদেশাগত এই পাথরের গায়ে লেগে আছে
এক অযাচিত অহংকারের দম্ভ, আছে পৃথিবীর
বনান্তে বনান্তে দাবানল ছড়িয়ে দেওয়ার
ক্রূর ইতিহাস–এখানে, এই ভারতবর্ষে
আগুনের বিরুদ্ধে আগুন, রক্তের বিরুদ্ধে রক্ত,
বিস্ফোরকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক, বোমার বিরুদ্ধে
বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যেমন করে
বিনয়-বাদল-দীনেশ, যেমন করে ক্ষুদিরাম,
সূর্য সেন ও প্রীতিলতার হৃদয় থেকে
উৎসারিত হয়েছিল এক মুক্ত নীলাকাশের গান–
তুমিও তার সঙ্গে দুর্বিনীত সাহসে
কণ্ঠ মিলিয়েছিলে, গেয়ে উঠেছিলে একটি মুক্ত
মানচিত্র আর পতাকার জন্য সমবেত সংগীত।
আজ তারই হাওয়ায়-হাওয়ায় উড়ছে জীবন;
একটি নিঃসীম আকাশের শ্বেতশুভ্র মেঘমালার
ভেতর দিয়ে উড়ন্ত পাখির মতো ভেসে যাচ্ছে
তোমার অদ্বিতীয় নাম–আজ তাই তুমি যেন
পাখি নও–রক্তের অক্ষরে লেখা এক কিংবদন্তি–
ইতিহাস থেকে যাঁর নাম কোনোদিন মুছতে পারে না।
তুমি সেই বিপ্লবী, অগ্নি-মশাল হাতে যে-কেবল
শুধুই দেখিয়ে যাবে–ইতিহাস মানুষেরই
করতলগত হয়, স্বপ্নে-স্বপ্নে ভরে দেয় জীবনের পূর্ণ অবয়ব।

কেমনে শুধব ঋণ

আমিরুল হক

পনেরো আগস্ট শেষের শ্রাবণে শেষ হয়ে গেল সব
সেদিন সকালে যায়নি তো শোনা পাখিদের কলরব।
রাতের আকাশে মেঘ তো ছিল না কোটি কোটি ছিল তারা–
হঠাৎ করেই মেঘ ঢেকে গেল দিশেহারা।
মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে যায় আসেনি তো ঘুম আর
মনের মাঝেতে উথাল-পাথাল ভয়ে নাচে বার বার ।
না-জানি কোন্ অশনি শব্দ দুয়ারে দিচ্ছে হানা
গা ছমছম ওঠে শিহরণ ভয় তো না-মানে মানা।
মোয়াজ্জিনের কণ্ঠে শুনেছি আজানের সুর যেমন
প্রতিদিন শুনি আজকেও শুনি লাগেনি তো ঠিক তেমন?
সেদিন রাতের প্রহর শেষেই ঘুমন্ত পিতার ঘরে–
রক্তপিপাসু নরখাদকেরা পিতাকে হত্যা করে।
পিতামাতা ভাই আপন স্বজন কাউকে দেয়নি ছাড়
বত্রিশ ধানমন্ডি মিন্টু রোডের বাসা করে ছারখার।
বারুদপোড়া গন্ধে বাতাস হয়েছে ভারাক্রান্ত
সব যে হারিয়ে প্রকৃতিটা কেঁদে নীরব সর্বস্বান্ত।
যার হাত ধরে বিজয় এনেছি করেছি দেশ স্বাধীন
অভাগা আমরা কি করে শুধব আমাদের যত ঋণ।

তিনিই আমার পিতা

আমিনুল ইসলাম মিলন

যিনি দণ্ডায়মান হলে
পর্বত ভেদ করে যাঁর মস্তক আকাশ ছুঁতো
যিনি উপবিষ্ট হলে
স্তব্ধ হয়ে যেত গোটা ভূখণ্ড
যিনি হাঁটলে
গোটা দেশ মিছিলে একাকার হতো
যাঁর পদচারণায়
উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ত মাতৃভূমি
যিনি আনত হলে
নুয়ে পড়ত আটান্ন হাজার বর্গমাইল
যাঁর বজ্রকণ্ঠে
উদ্দীপ্ত হতো বাংলার বায়ু-মাটি-জল
যাঁর নির্দেশে প্রতিটি গৃহ একদিন হয়ে উঠেছিল দুর্ভেদ্য দুর্গ
প্রতিটি প্রাণ অবিনাশী যোদ্ধা
যাঁর জন্মই
জন্ম দেয় একটি জাতির
যাঁর মহাপ্রয়াণে
অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে স্বাধীনতা
শোকে মোহ্যমান সাগর-পর্বত-জনপদ–
দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকের মতো বেসামাল জাতি।
শায়িত যিনি আজ টুঙ্গিপাড়ার সবুজ চত্বরে
তবুও অবিনাশী চেতনা যাঁর
জাগিয়ে রাখে বাংলাদেশ
তিনিই আমার পিতা
অমর জাতির জনক
স্বপ্নের কারিগর
শেখ মুজিবুর, শেখ মুজিবুর।

সুপ্রভাত বাংলাদেশ

মোশাররফ হোসেন ভূঞা

সন্তানের জন্মযুদ্ধে জননীর রক্তপাত ফুটে ওঠে
পুষ্প হয়ে। ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তের ফসলে আজ
ধনধান্যে পরিপূর্ণ আমাদের গোলাঘর। সারা বাংলা
অবিনাশী স্মৃতিসৌধ, মৃত্যুঞ্জয়ী শহিদেরা অবিরাম
কথা বলে আকাশের লাল সূর্যটার সাথে। আঁধারের
সাথি হয়ে ঝলমলে তারাগুলো মনে শুধু শোনে
শহিদের যুদ্ধগাঁথা, বীরত্ব বিজয় আর উল্লসিত
জনতার কলরব। আকাশের ঠিক মধ্যখানে বসে
খণ্ড খণ্ড স্মৃতিভাসা রোমন্থনে ব্যস্ত চাঁদ, প্রতিক্ষণ
দেখিয়েছে যুদ্ধরত গন্তব্যের সুস্পষ্ট নিশানা এবং
পঁচিশের কালরাতে পৈশাচিক হায়েনার বিষদাঁত
ভেঙে দিতে বিশ্ববিবেকের কাছে দিয়েছিল দূরাভাষ।
আঁধারের চিলেকোঠা থেকে মধ্যাকাশে এসে, প্রভাময়
স্বর্ণপ্রভা বলেছিল–দেখে নিও প্রভাতের ঠিক আগে
স্বাধীন স্বাধীন বলে উদ্বেলিত হবে এই জনপদ।
জেগে ওঠে দীর্ঘদেহী মহাপ্রাণ এক প্রবাদপুরুষ
দুটি চোখে উৎক্ষিপ্ত অগ্নিগিরি, রুদ্রময় জলরাশি
আঙুলের ইশারায় কেঁপে ওঠে হিমালয়–রত্নচূড়া
বজ্রকণ্ঠে তাঁর দৃপ্ত উচ্চারণ স্বাধীনতা–স্বাধীনতা।
প্রভাতের আরো আগে আকাশের পূর্ব প্রান্ত আলোকিত
হতে না হতেই পদ্মা মেঘনা যমুনা, পনেরো হাজার
নদনদী ঘরে ঘরে পৌঁছে বলে–সুপ্রভাত বাংলাদেশ।

নিবন্ধ

শিল্পীর তুলিতে চিরকালের বঙ্গবন্ধু

ফারুক নওয়াজ

‘জীবনটা এত ছোট্ট কেন?’—এমন প্রশ্নের কোনো জবাব নেই।

তবুও জীবন একটু দীর্ঘ হয় কারো। যেমন রবীন্দ্রনাথ। পেয়েছিলেন আশি বছরের উজ্জ্বল জীবন। প্রতিভাকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন পূর্ণ আভায়। মানুষকে দিয়েছেন অনেক। আলোকিত করেছেন বাঙালির আত্মপরিচয়ের আকাশ। মানবতা ও মনুষ্যত্বের জয়গান শুনিয়েছেন বিশ্বকে।

কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট্ট জীবনও কখনো কখনো দীর্ঘজীবনকে ছাড়িয়ে যায়। ঠিক ফুলের মতো। সে ফোটে অন্যকে সৌরভ ও সৌন্দর্যে মোহিত করতে। তারপর ঝরে যায়, শুকিয়ে যায়। তা যাক। সে যে মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য আনন্দ দিতে পেরেছে এটাই তার কৃতিত্ব। কিন্তু আমাদের বঙ্গবন্ধু, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ব্যতিক্রম। জীবনটা ছোট্টই তো! পঞ্চান্ন বছর ছয় মাসও পূর্ণ হয়নি। এ বয়স কি বয়স?

মানুষ এ বয়সে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ারও সময় পায় না। নিজের ভেতরের সৃষ্টিশীল আলোটাকে ভালো করে ছড়াতেও পারে না।

বঙ্গবন্ধু এই ছোট্ট জীবনটাকে কত বড়ো করে তুলেছিলেন– যা কল্পনারও অতীত। জন্ম নিয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে। এই বাংলার এক অখ্যাত গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায়। লেখাপড়ার শুরু গ্রামের বাঁশ-বেড়ার পাঠশালায়। হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে দেখলেন বর্ষায় ফাটা ছাদ দিয়ে জল পড়ছে। এই ফাটা ছাদের কারণেই শেখ মুজিবুর রহমান ওরফে খোকা নামের ফুটবলপ্রিয় ছাত্রটিকে নতুন করে জেনে নিলেন শিক্ষক এবং সহপাঠীরা। শুধু তারাই নয়, খোদ অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক আর মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও। তাঁরা এক সফরে এসে ওই স্কুলটা দেখতে গেলেন। দেখে চলে যাচ্ছেন, এমন সময় এক ছাত্র তাঁদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। তাঁরা বিস্মিত হলেন, ‘কী চাও তুমি?’ ‘আমাদের স্কুলের ছাদ ফেটে গেছে। এটার সংস্কার করে দিতে হবে। নইলে আমাদের পড়াশুনা শিকেয় উঠবে।’ এবার তাঁরা অবাক হলেন ছাত্রটির সাহস দেখে। নিজের জন্য নয়, তাঁর চাওয়া স্কুলের জন্য, পড়াশুনার জন্য। শেরে বাংলা তাঁর দিকে একটু তাকিয়ে বললেন. ‘হবে!’ আর সোহরাওয়ার্দী ছাত্রটিকে চিনতে পেরেছিলেন একটু বেশিই। বুঝতে পেরেছিলেন সে যে-সে নয়, তাঁর মধ্যে অসাধারণ আলো আছে, চিরন্তন শিখা আছে, আছে আগুন। এই আগুন দিয়ে সে জাতির অনন্ত আঁধার ঘোচাবে ঠিকই।

তিনি জেনে নিলেন তাঁর নামধাম। আর বললেন, সময়মতো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

না, মধ্যে অনেক সময় চলে গেছে। অত বড়ো নেতার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হয়নি তাঁর। কেন দেখা করবে? তাঁর তো কোনো কিছুর দরকার নেই। আবার মাঝখানে ছাত্রটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। বেরিবেরি, আর চোখের গ্লুকোমা রোগ। পড়াশুনা গেল থেমে। বেশ ক’বছর গেল এভাবে। সুস্থ হয়ে আবার পড়াশুনা। পাস করলেন ম্যাট্রিক, এরপর কলকাতায় গেলেন। ভর্তি হলেন ইসলামিয়া কলেজে।

খোকা, এখন শেখ মুজিবুর রহমান। সংক্ষেপে শেখ মুজিব। ছাত্রনেতা। ব্রিটিশ আমল। দেশে নানা সমস্যা। নাই স্বাধীনতা। স্বাধীন স্বদেশভূমির জন্য লড়াই হয়ে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। মহাত্মা গান্ধীসহ বড়ো বড়ো নেতা আন্দোলনে আছেন। ছাত্রনেতা মুজিবও ছাত্রদের নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এ সময় নতুন করে তাঁর পরিচয় হয় ডাকসাইটে নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে।

এরপর অনেক বড়ো ইতিহাস। শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু। তারপর স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির পিতা। বিশ্বের এক মহান নেতা হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর জীবনের দৈর্ঘ্য বয়স দিয়ে হিসেব করলে ভুল হবে।

তাঁর অবদান, মহান সংগ্রামী জীবন... এ জীবন হাজার বছর বয়সের সমান। সেই জীবনের ইতিহাস লিখে শেষ হয় না। কত ঘটনা, কত গল্প তাঁকে নিয়ে। এ জন্য কবি তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখে চলেছেন। গান লিখে চলেছেন। গল্পকার গল্প লিখে চলেছেন, তাঁকে নিয়ে উপন্যাস, চলচ্চিত্র কত কিছু হচ্ছে, হয়ে যাবে বাঙালি যতদিন থাকবে। তাঁর জীবনের নানা সময়ের তোলা আলোকচিত্র দেখে আমরা অবাক হই। কে তুলেছে এত ছবি? তুলে রেখেছে মানুষ। কারণ তিনি মানুষের আপনজন, মাটি-মানুষের নেতা।

এমন নেতা হাজার বছরে একটা জন্মায় না। তাই তাঁর নানা মুহূর্তের ছবি তুলে রেখেছিল।

আর শিল্পীরা, যাঁরা রংতুলির জাদুকর তারাও কি প্রিয় নেতার ছবি না এঁকে বসে থাকতে পারেন? আজ দেশজুড়ে বিশ্বজুড়ে বঙ্গবন্ধুর পোর্ট্রেট, স্কেচ। তাঁর জীবনের নানা মুহূর্তের চিত্র এঁকে চলেছেন রংতুলির মানুষেরা। সেইসব ছবি আমাদের নতুন প্রজন্মকে নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে।

সবার ছবি আঁকা যায় না

না, সবার ছবি আঁকা যায় না। আঁকা যায়, তবে তাঁকে কাছে বসিয়ে তাকে দেখে-দেখে শিল্পী তার স্কেচ, মুখাবয়ব আঁকতে পারেন। এমনটি দেখা যায় একুশের বইমেলায়, এখানে-ওখানে। আঁকা যায় মানুষের ছবি। মানুষ মানে আমজনতা। তখন একজন বিশেষ মানুষ নয়, কমন মানুষ হয়ে যায় সেই ছবির মানুষগুলো। হ্যাঁ, মহান মানুষদের ছবি, যে মানুষেরা মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস। যাঁরা শিল্পীর হৃদয়ে গেঁথে থাকেন। তাঁদের ছবি সহজেই আঁকা যায়। তেমন মানুষ জগতে কম জন্মান। রবীন্দ্রনাথের ছবি শিল্পী খচখচ করে এঁকে দিতে পারেন। নজরুল আঁকতেও বেগ পেতে হয় না। হ্যাঁ, মহাত্মা গান্ধী, শেক্সপীয়র, ইয়াসির আরাফাত, নেলসন ম্যান্ডেলাও আঁকা যায়। তেমনি আঁকা যায় আমাদের বঙ্গবন্ধুকেও। আমাদের শিল্পীরা খুব সহজে আঁকতে পারেন বঙ্গবন্ধুকে। কারণ, এ ছবি হৃদয়ে গেঁথে আছে। এমনকি আমাদের নবীন বা শিশুশিল্পীরাও বঙ্গবন্ধুর ছবি এঁকে ফেলতে পারেন চোখ বুঁজে। এ ছবি যে বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয়। আমাদের ইতিহাসে, পতাকায়, অবারিত সবুজে, নদীর উত্তাল ঢেউয়ে, সর্বত্র এই ছবি মনের চোখে দেখা যায়। সেই জন্য শিল্পী সহজেই এ ছবি আঁকতে পারেন।

বঙ্গবন্ধুপ্রাণ চিত্রকরেরা

বাঙালি শিল্পীমাত্রই বঙ্গবন্ধুপ্রাণ চিত্রকর। কে আঁকেননি বঙ্গবন্ধুর ছবি? বঙ্গবন্ধুর সারাজীবন আমাদের চিত্রকরদের তুলির ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আগেই বলেছি বঙ্গবন্ধুর আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র ৫৫ বছর ৫ মাস ২৫ দিন। অদীর্ঘ জীবন। এই সামান্য সময়ের জীবনকে কাজের মধ্যদিয়ে, ত্যাগের মধ্যদিয়ে, দেশপ্রেমের মধ্যদিয়ে, সাহস ও সততার মধ্যদিয়ে... অমর-অজেয় করে তুলেছেন তিনি।

তারপরও কথা থাকে কিছু শিল্পীর তুলিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু। যেন বঙ্গবন্ধুকে আঁকতেই তাঁদের তুলি হেসে ওঠে। এমন এক তুলির জাদুকর হাশেম খান। বঙ্গবন্ধুর ছবি মানেই যেন হাশেম খানের ছবি। তিনি বঙ্গবন্ধুর স্কেচ এঁকেছেন অসংখ্য। অসংখ্য বঙ্গবন্ধু-বিষয়ক বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছেন। শুধু প্রবন্ধ এবং ইতিহাস-জীবনীই নয়। বঙ্গবন্ধু আমাদের সৃজনশীল সাহিত্যের বড়ো অংশজুড়ে বিরাজ করে আছেন। গল্প-উপন্যাস, কবিতা, শিশুসাহিত্য– সব শাখাতেই বঙ্গবন্ধু আছেন। আমাদের কবির হৃদয়ের আবেগ বঙ্গবন্ধু, আমাদের সংগীতের অন্তরা-সঞ্চারির সুরের ঝংকার বঙ্গবন্ধু। আর আমাদের নাটক-চলচ্চিত্রের সংলাপ-স্পন্দনেও বঙ্গবন্ধু সাহস ও দেশপ্রেমের প্রতীক হয়ে আছেন। সাহিত্যের সব শাখাতেই শিল্পীদের অংশগ্রহণ থাকে বলেই তাঁদের আঁকতে হয় বঙ্গবন্ধুর ছবি। প্রচ্ছদে, ইনারে, বইয়ের ভেতরের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠায় ইলাস্ট্রেশনও আঁকতে হয় তাঁদের। হাশেম খান ছাড়াও বঙ্গবন্ধুর সেরা-সেরা ছবি এঁকেছেন কাইয়ুম চৌধুরী, রফিকুন নবী, বীরেন সোম, ফরিদা জামান, শেখ আফজাল, রণজিৎ দাস প্রমুখ।

আরো যাঁরা বঙ্গবন্ধুর ছবি, স্কেচ, গল্প-কবিতার ইলাস্ট্রেশন নিরন্তর এঁকে চলেছেন তাদের নামের তালিকা অনেক দীর্ঘ। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন–সমরজিৎ রায় চৌধুরী, সৈয়দ ইকবাল, আজিজুর রহমান, শামসুদ্দোহা, রেজাউন নবী, সামিনা নাফিজ, সুশান্ত অধিকারী, আতিয়া ইসলাম এ্যানি, রবিউল ইসলাম, ধ্রুব এষ, রব্বানী শামীম, আলপ্তগীন তুষার, সাফিন ওমর, আব্দুল মোমেন মিল্টন, কামালুদ্দিন, বিশ্বজিৎ গোস্বামী, রজত, এস কে মেহেদী কামাল, সোহাগ পারভেজ, শাহজাহান আহমেদ বিকাশ প্রমুখ। আর বঙ্গবন্ধুর জীবনশেষের সিঁড়িতে লুটিয়ে থাকা সেই নিথর পবিত্র শবদেহটি এঁকেছেন শিল্পী শাহাবুদ্দিন। যে ছবিটি দেখামাত্র যে-কোনো মানুষ বেদনাস্নাত হয়ে ওঠে, অশ্রুসজল হয়ে ওঠে দুই চোখ। স্বাধীনতার মার্চ এলে, বিজয়ের ডিসেম্বর এলে, ভাষার ফেব্রুয়ারি এলে কিংবা শোকের আগস্ট এলে দেশজুড়ে নানা আয়োজনের মধ্যে থাকে বাঙালির বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ইতিহাসের চিত্রকর্ম-প্রদর্শনী। আর সেই প্রদর্শনীর পুরোটা জুড়েই থাকে চিরকালের বঙ্গবন্ধু। কারণ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন অনুষঙ্গ।

সবশেষে বলব, যতকাল বাংলাদেশ থাকবে, বিজয়ী বাঙালির লাল-সবুজ পতাকা থাকবে, মধুমতি-ধানসিঁড়ি, পদ্মা-মেঘনা, গড়াই-কর্ণফুলী–সুরমা-কুশিয়ারা থাকবে; ততদিন বঙ্গবন্ধু থাকবেন। থাকবে এদেশের কবি, গান-কবিতা, সাহিত্য-শিল্প। আমাদের কবিসাহিত্যিকরা নিরন্তর লিখে যাবেন বঙ্গবন্ধুর অমর কীর্তিগাথা আর চিত্রকরেরা এঁকে যাবেন মহাজীবন বঙ্গবন্ধুর প্রাণোজ্জ্বল, সাহসে সমুজ্জ্বল, সংগ্রামে দুর্বার, দেশপ্রেমে প্রদীপ্ত মুখচ্ছবি আর তাঁর অনন্য জীবনচিত্র।

লেখক: কবি ও শিশু সাহিত্যিক

প্রবন্ধ

পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু

[মূল: The tortured and damned –রবার্ট পেইন]

ভাবানুবাদ : ওবায়দুল কাদের

কার শোকে যে পাখপাখালি বৃক্ষ চন্দ্র তারা
সন্ধ্যা সকাল মাতম করে কাঁদে টুঙ্গিপাড়া
টুঙ্গিপাড়া কাঁদে আমার কাঁদে বাংলাবাসী–
কোন সে দানব কাড়ল আমার মায়ের মুখের হাসি।

আগস্ট বাঙালির শোকের মাস। বাঙালির বুকফাটা মাতমে প্রতিশোধের দাবদাহে জ্বলে ওঠার মাস। এই আগস্টের ঘৃণিত কালরাত্রিতে আমরা হারিয়েছি আমাদের প্রাণপুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সেই দিন থেকে বাঙালি জাতি আবার পরাজয়ের শিকলে বন্দি হলো, যা মানব ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায়। বাঙালি জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর পরও পরাধীনতার গ্লানিভরে ন্যুব্জপ্রায়। আজ সকল ক্ষেত্রে ভয়ংকর পতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে দেশ। জাতির এই মহা ক্রান্তিকালে আজ বড়ো বেশি মনে পড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের মর্মবাণী। তাঁর লৌহদীপ্ত কণ্ঠের বজ্রনিনাদ বার বার নাড়া দেয় আমাদের সমগ্র সত্তায়। বাঙালি জাতি যে স্বপ্ন নিয়ে একাত্তরের রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তা আজ সফল হয়নি।

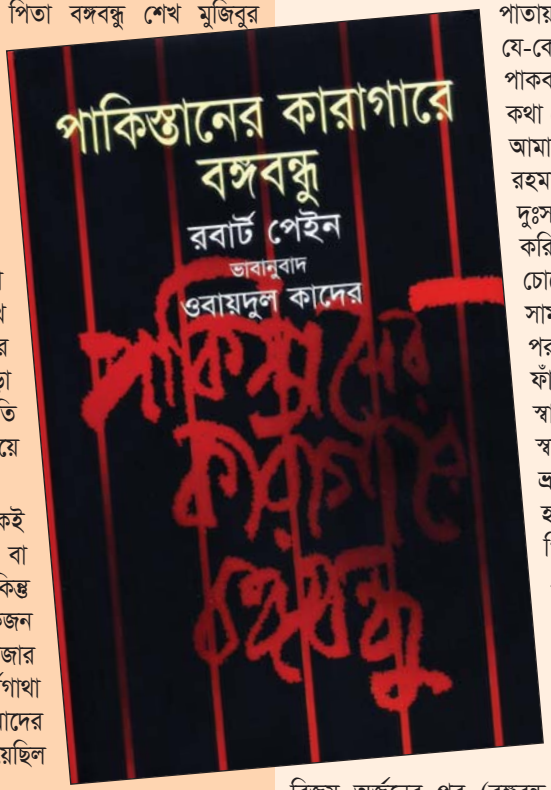

এ যাবৎকালে সারাবিশ্বে অনেক রাষ্ট্রপ্রধানকেই আততায়ীর হাতে প্রাণ হারাতে হয়েছে বা তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু একজন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা মানে শুধু একজন রাষ্ট্রপ্রধানকেই হত্যা নয়, বাঙালির হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নসাধ, গৌরবান্বিত গর্বগাথা হত্যা করা। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে আমাদের সকল গর্বিত অর্জনকেও হত্যা করা হয়েছিল পঁচাত্তরের মধ্য আগস্ট কালরাত্রিতে।

আমাদের অনেক জ্ঞানীগুণী বলে থাকেন, জীবিত মুজিবের চেয়ে মৃত মুজিব অনেক বেশি শক্তিবান ও তেজোদীপ্ত। আর তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই আমাদের প্রবল প্রজ্ঞাবান-গুণীদের *মুক্তবুদ্ধি চর্চার অমর সাক্ষী* বইয়ের মাধ্যমে। মানব ইতিহাসে এ যাবৎকালে সবচেয়ে গৌরবান্বিত যে বিষয়টিকে বুকে ধারণ করে আমরা শক্তি ও সাহস পাই তাহলো বই। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সফলতা-ব্যর্থতা ও তাবৎ বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাকালে আমরা দেখতে পাই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বইয়ে সবচেয়ে বেশি লেখা হয়েছে যে মহান মানুষটিকে নিয়ে, তিনি বাঙালি জাতির দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রামের হাজার বছরের সূর্যসন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আজ সবচেয়ে আনন্দের কথা হলো এত অবক্ষয়, পতনের ভয়ংকরী আঁধারে সমগ্র জাতি যখন হতাশার কালাগ্নিদাহে দিশেহারা, তখনো কিন্তু আমরা আশার আলো দেখতে পাই একটি বিষয়ে– সেটি হলো প্রতিবছরই অসংখ্য গ্রন্থ রচনা হচ্ছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙালির স্বাধীনতার প্রতীক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য প্রামাণ্যগ্রন্থ।

ব্রিটিশ সাংবাদিক রবার্ট পেইন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর জীবনের সবচেয়ে নির্মম ট্র্যাজেডির গল্পগাথা খুব দক্ষতার সাথে তুলে এনেছেন তার *দি টর্চার্ড অ্যান্ড ডেমড* প্রামাণ্য উপন্যাসের মাধ্যমে। ইংরেজি ভাষায় এই উপন্যাসটি প্রকাশের পর বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এই গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন এক সময়ের বিশিষ্ট ছাত্রনেতা, সাংবাদিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী বাঙালির প্রাণের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

এ উপন্যাসটি পড়লে বোঝা যাবে বাঙালি জাতির মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ কারাজীবনের বীভৎস বর্ণনা। যে-কোনো পাষাণ হৃদয় আবেগাপ্লুত না হয়ে পারবে না এটি পড়লে। উপন্যাসটির প্রতি পাতায় অসংখ্য ঘটনার প্রাণস্পর্শী শব্দ প্রয়োগ যে-কোনো পাঠককে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর রণক্ষেত্রের বর্বরোচিত আক্রোশের কথা যেমন মনে করিয়ে দেয়, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি পাকজান্তাদের হিংস্র আক্রোশে দুঃসহনীয় মনোযাতনার নির্মমতাকেও মনে করিয়ে দেয়। সকল অবর্ণনীয় চিত্রকল্পও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা এত নির্যাতন-নিপীড়নের পরও কিন্তু কোটি বাঙালির প্রাণের মানুষটিকে ফাঁসিতে ঝোলানোর সাহস পায়নি অথচ স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের কিছু সংখ্যক পথ ভ্রষ্ট সেনার হাতে সপরিবার প্রাণ দিতে হয়েছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে।

পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু উপন্যাসটি পড়ে আমার মনে হয়েছে সকল দেশপ্রেমিক, বঙ্গবন্ধুর ভক্তদের এই গ্রন্থটি পড়া দরকার। আমার আরো মনে হয়েছে পাকিস্তানের সেসময়ের নেতা ভুট্টো সাহেব যদি ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় অর্জনের পর (বঙ্গবন্ধু তখনো জানেন না আমাদের বিজয়ের সংবাদ) বঙ্গবন্ধুকে মিয়ানওয়ালি কারাগারের ক্ষুদ্র কনডেম সেল থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ না দিতেন তাহলে আমরা হয়ত বঙ্গবন্ধুকে এত সহজে ফিরে পেতাম কি-না সন্দেহ। ভুট্টো জেলার হাবিব আলীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকে যেন শহর থেকে দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ভুট্টোর আদেশ মোতাবেক জেলার হাবিব শহর থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে নিসর্গমণ্ডিত এলাকায় বঙ্গবন্ধুকে লুকিয়ে রেখেছিল তার বাসায়। এসব মর্মস্পর্শী কথামালায় *পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু* উপন্যাসটি বার বার পড়তে মন চাইবে এবং জানা-অজানা কথামালায় শিউরে উঠবে মন।

মুজিব আমার মেঘলাকাশে ঝলমলে এক রবি
বাঙালিদের মহামানব যুদ্ধজয়ের কবি।
মুজিব আমার রক্তে জাগায় বিপ্লবেরই গান
এক মুজিবের নামে জাগো লক্ষ-কোটি প্রাণ।

দেশ-বিদেশের কবি-সাহিত্যিকরা বঙ্গবন্ধুকে এভাবেই চির জাগরূক করে রাখতে চায়।

এ মহৎ মানুষটি মাটি ও মানুষকে ভালোবেসে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, আর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন,

'তোমরা আমার লাশটি বাংলার মাটিতে পাঠিয়ে দেবে। আমি বাঙালি। বাংলা আমার প্রাণ। আমি বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য তোমাদের মৃত্যুভয়কেও পরোয়া করি না। আমরা মরতে শিখেছি তাই বিজয় আমাদের অনিবার্য।'

যে মানুষটি এমন লৌহদীপ্ত অঙ্গীকার বুকে ধারণ করে বছরের পর বছর অন্ধ কারাগারে বন্দি হয়েও স্বপ্ন দেখেছিলেন বাঙালির মহা মুক্তির, একাত্তরের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রায় ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে ১৬ই ডিসেম্বর দেশ যখন স্বাধীন হলো তখনো তিনি পাননি তাঁর দেশের স্বাধীনতা লাভের শুভ সংবাদটি। তখনো বঙ্গবন্ধু মিয়ানওয়ালি কারাগারের ক্ষুদ্র কনডেম সেলে মৃত্যুর প্রহর গুণছিলেন। ব্রিটিশ সাংবাদিক রবার্ট পেইনের লেখায় বিষয়টি যেভাবে উঠে এসেছে:

১৮ই ডিসেম্বর; একাত্তর। রাওয়ালপিন্ডির প্রেসিডেন্ট ভবন। মনোরম বিশাল ভবনে প্রেসিডেন্টের সুসজ্জিত ডেস্ক। ডেস্কের ওপর রুপোর ফ্রেমে আঁটা তিনটি ঝকমকে ছবি; মাও-সেতুং, যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন ও ইরানের শাহের। এরা বরাবরই পাকিস্তানের সামরিক একনায়কত্বের সমর্থক ও আশীর্বাদক।

টেবিল চাপড়ে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো তর্জন-গর্জন করে ওঠেন ইয়াহিয়া খান 'না হতে পারে না।'

ক্ষোভে-দুঃখে তাঁর গণ্ডদেশ বেয়ে নেমে এল অশ্রুধারা। ঠিক এমন সময় প্রেসিডেন্ট নিক্সনের টেলিফোন। নিক্সন গভীর সহানুভূতি জানালেন পরাজিত পাকিস্তান বাহিনীর সর্বাধিনায়ককে। ইয়াহিয়ার ঠোঁটের কোণে তৃপ্তির হাসি। নিক্সনের সান্ত্বনা পেয়ে জঙ্গীকর্তা আপাতত চাঙ্গা।

আরে হ্যাঁ, কর্নেল আমাকে একটা ফাইল দেখাতে হয় যে, ডেটেন্যু (রাজবন্দি) শেখ মুজিবুর রহমানের ফাইলটা বড্ড দরকার। আমার মনে হয় তাঁকে ফাঁসি দেওয়ার উপযুক্ত সময় এখনই।

শেখ মুজিবুর রহমান তখন মিয়ানওয়ালি কারাগারের ক্ষুদ্র কনডেম সেলে মৃত্যুর প্রহর গুণছিলেন। তিনি তখনও জানেন না, তাঁর স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। মুজিব শুধু জানেন, মৃত্যু দুয়ারে করাঘাত করছে। প্রিয় জন্মভূমির মাটিতে তাঁর আর বুঝি ফেরা হলো না।

দিনের পর দিন গড়াতে লাগল। পর্বতমালায় ঘেরা মিয়ানওয়ালি কারাগার। প্রায়শ শিলাবৃষ্টি নেমে আসত। ধূসর মেঘগুলো পাহাড়ের গায়ে। তুষারাবৃত পাহাড়। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে পাতলা বিবর্ণ একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে বন্দি মুজিবের দিন কাটত।

একদিন প্রচণ্ড বেগে নেমে এল ঝড়। সাথে অস্বাভাবিক বারিপাত। আকাশজুড়ে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। বজ্রপাতের ভয়ংকর কানফাটা গর্জন চারদিকে। দুটো এক্সপ্রেস ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষের বিকট আওয়াজের মতোই। সেলে নেমে আসে রাতের মতো গাঢ় অন্ধকার। বৃষ্টির জল বাতাসে ধাক্কা খেয়ে জানালা দিয়ে আছড়ে পড়ছিল। কনকনে ঠান্ডায় বন্দি মুজিব কোঁকাচ্ছিলেন। একটা কম্বল শৈত্য প্রতিরোধে মোটেই সহায়ক ছিল না। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি এসে বন্দির প্রকোষ্ঠ ভিজিয়ে দিতে উদ্যত।

বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা কাঁটার মতো মুজিবের মুখে বিঁধতে লাগল। হঠাৎ বজ্রপাতের বিকট একটি শব্দ। যেন ছাদ ভেঙে মাথার ওপর পড়ছে। কয়েক গজ দূরে ততক্ষণে একটা দালানে আগুন ধরে গেছে। সেল থেকে লোকজনের প্রাণভয়ে অস্থির ছোটাছুটির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুদ্র জানালার পাশে হেলান দিয়ে বাইরের মেজাজ খারাপ আবহাওয়া ও অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে। (*পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু* পৃ. ৯–১০)

পরের দিন দুপুর বেলা। মুজিব হঠাৎ বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেলেন তাঁর সেলের দশ গজ সামনে কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষে কজন কয়েদি একটি বড়ো গর্ত খুঁড়ছে। বন্দি কিছুটা অবাক হলেন। কাছে এসে ভালো করে তাকিয়ে বুঝলেন একটা কবর খোঁড়া হচ্ছে। মুজিবের তখন এটাও বুঝে নিতে অসুবিধা হলো না যে ওটা তাঁর জন্যই রেডি করা হচ্ছে। সম্ভবত দু-একদিনের মধ্যেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে চলছে। মুজিব ভাবলেন, হয়ত আজ কিংবা কাল গভীর রাতে ওরা দলে দলে এসে তাঁকে বড়ো গর্তটির পাশে নিয়ে যাবে। তারপর নির্ঘাত গুলি। প্রাণহীন রক্তাক্ত লাশ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেলের সামনের কবরটা মাটি ভরাট হয়ে যাবে। এরপর শেখ মুজিব নামে কোনো ব্যক্তির শারীরিক অস্তিত্বের চিহ্ন পর্যন্ত আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

একজন প্রহরী তাঁর ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসে কানে কানে বলল, কতিপয় কয়েদি আপনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। জেল কর্তৃপক্ষ টের পেয়ে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করেছেন। আপনার চিন্তার কারণ নেই। বন্দি নিরুত্তর। গার্ডের কথা তাঁর বিশ্বাস হয়নি। কারণ কয়েদিরা যেখানে থাকে সে ঘরটাতো সেল থেকে অন্তত পাঁচশ গজ দূরে। তারা কী করে তাঁকে হত্যা করবে? মুজিব নিশ্চিত হয়ে গেলেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে হত্যা করা হবে।

সময়ের চাকা ঘুরতে ঘুরতে ছাব্বিশে ডিসেম্বর। গভীর রাত। প্রচণ্ড শীত। সেদিনও মাত্র এক কম্বল শীত নিবারণের সম্বল। শেখ মুজিবুর রহমান ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন। রাতভর একটুও ঘুম হয়নি। সময় কেটেছে জেগে জেগে, শুয়ে-বসে। হঠাৎ তাঁর কানে ভেসে এল একটা চলন্ত গাড়ির আওয়াজ। জানালা দিয়ে তাকাতেই লক্ষ করলেন, একটা ট্রাক আসছে ধীরে ধীরে। ট্রাকের হেডলাইটের তেজী আলো সেলে ঢুকে পড়েছে। চোখে ভীষণ লাগছে। ট্রাকটা সেলের সাথে লাগোয়া গার্ড হাউসের সামনে এসে দাঁড়ালো।

ওরা তাহলে এসেই গেল। শেখ মুজিবুর রহমান মনে মনে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানের আয়াত পড়তে লাগলেন। তাঁর কানে বাজল বাইরের ছুটোছুটি, হাঁকডাক, ফিসফিসানির শব্দ। হঠাৎ ঝন ঝন করে লৌহকপাট খুলে গেল। চারজন সৈন্য ভেতরে ঢুকে শেখকে ঘিরে দাঁড়ালো। বন্দি বিছানায় বসে সৈন্যদের গতিবিধি লক্ষ করছেন। মুখে কোনো কথা নেই। চেহারায় স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য। যেন যে-কোনো দুঃসংবাদের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত। আশ্চর্য মনোবল শেখ মুজিবের। বিপদের আশঙ্কা করেও অধীর হননি। ভেঙে পড়েননি। সামনে এসে দাঁড়ালেন বেঁটে-খাটো শ্মশ্রুমণ্ডিত জেল গভর্নর হাবিব আলী। মাথায় মিলিটারি ক্যাপ। গায়ে রেইনকোট জড়ানো। হাবিব আলী তার পরিচিত কর্কশ স্বরে বললেন, শেখ, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। আপনি এখন নিরাপদ হাতে পড়েছেন। আমি আপনাকে একটা নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। দেখুন, খোদা বড়োই মেহেরবান।

বন্দি নম্র গলায় বললেন, হ্যাঁ বিপদে খোদাই সহায়।

হাবিব আলী কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, ভয় নেই। আপনাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাব। ট্রাকে ওঠার সাথে সাথেই কিন্তু শুয়ে পড়বেন। কেন তা পরে বুঝতে পারবেন। তবে শেখ আপনি নিশ্চিত থাকুন আপনার কিছুই হবে না। নিঝুম রাতের মতোই জেলভরা ঝিমুনি। (*পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু* পৃ. ৮৩–৮৫)

চলতে চলতে মুজিব ভাবলেন, ওরা তাহলে এখনই আমাকে এই অন্ধকারের মধ্যে গুলি করে মেরে ফেলবে। কিন্তু এতসব ক্লেশকর বন্য প্রস্তুতির কী প্রয়োজন ছিল। ওই সেলের সামনের গর্তের পাশে নিয়েও তো গোপনে মেরে ফেলতে পারত। এত দূরে নিয়ে এল কেন? আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না। শৈত্যপ্রবাহের তোড়ে মুজিব থর থর করে কাঁপছিলেন।

কিছুক্ষণ পর মুজিব লক্ষ করলেন পাহাড়ের গা ঘেঁষেই সুন্দর একখণ্ড নিম্নভূমি। সুরম্য বাংলোর সামনে সাজানো বাগান। পিচ করা একটা তকতকে রাস্তাও চোখে পড়ছে। দুপাশে সারি সারি গাছ– যেন অসংখ্য বৃক্ষতোরণ। কুয়াশাভেজা গভীর রাতে বৈদ্যুতিক বাতিগুলো করুণ হাসি ছড়াচ্ছিল। (*পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু* পৃ. ৮৭)

মুজিব ভাবলেন তাঁর রুমে বুঝি ইয়াহিয়া খান আসছেন।

কিন্তু না, ধূসর রঙের স্যুট, নীল টাই পরিহিত অন্য এক চেনা মানুষ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। নাচি নাচি ছন্দে। মুখে স্মিত হাসি। শেখ মুজিবুর রহমানের সামনে জুলফিকার আলী ভুট্টো দাঁড়িয়ে।

শেখ মুজিবুর রহমান কিছুটা অবাক হলেন। তবু একটু এগিয়ে গিয়ে ভুট্টোর আগমনের সাথে সৌজন্যমূলক সায় জোগালেন। দীর্ঘ কারাভোগে শেখের শরীরটা ভীষণ ভেঙে পড়েছে। ওঠাবসায়ও কষ্ট পান, একটু হাঁটতেই হাঁপিয়ে যান। ভুট্টোকে দেখে তিনি স্বাভাবিক বিনয়ভাব প্রকাশ করলেও তাতে আন্তরিকতার উপস্থিতি নেই। পরিচিত শত্রু মুখোমুখি হলে যেমন, ঠিক তেমনই মনের অবস্থা।

আচমকা বন্দির দিকে ফিরে গম্ভীর গলায় ভুট্টো বললেন, আমি এখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক।

শেখ মুজিবুর রহমান এবারে না হেসে পারলেন না। ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন এটা তাঁর কাছে এমনিতে কোনো উপহাস-পরিহাসের ব্যাপার নয়। এই মুহূর্তে এমনটি হওয়ার মানে সহজেই মুজিবের কাছে যেটা পরিহাসের ব্যাপার তা হচ্ছে ভুট্টো সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব নিয়েছেন– যার পরিষ্কার মানে তার কাছে মিলিটারি ডিক্টেটর। কিন্তু ভুট্টোকে তো দেখতে একজন বিচক্ষণ, সম্পদশালী প্রাদেশিক আইনজীবীর মতোই মনে হয়।

ভুট্টোর প্রতি মুজিবের বিস্ময়ভরা জিজ্ঞাসা; আপনি তাহলে সামরিক আইন প্রশাসকও হয়েছেন? তার মানে এখানে এখনো একনায়কতন্ত্রের দাপট চলছে।

ভুট্টো বললেন: না ঠিক ওরকম কড়া নয়। একেবারে স্বাভাবিক সদয় প্রকৃতির। আপনি দেখবেন কোনো প্রকার হম্বিতম্বি বা বাড়াবাড়ি নেই। (*পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু* পৃ. ৯৪–৯৫)

৮ই জানুয়ারি বাহাত্তর। রাওয়ালপিন্ডি বিমান বন্দর। সময় রাত এগারোটা। এয়ারপোর্ট তখন ব্ল্যাক আউট। থমথমে ভাব। পিআইএ'র একটি বিশেষ বিমান রানওয়েতে দাঁড়িয়ে।

পাইলট, স্টুয়ার্ড, এয়ারহোস্টেস অধীর অপেক্ষার ভেতরে। যার যার জায়গায় অন্ধকারে বসে।

এভাবে ঘণ্টা তিনেক সময় গড়িয়ে রাত দুটো। রানওয়ের পাদদেশে একটা নীল বাতিই কেবল একা একা অন্ধকারে মিটিমিটি জ্বলছে। গোটা বিমানবন্দর এলাকা কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঘেরা। অভ্যন্তরীণ সব ফ্লাইট করাচি অবতরণের নির্দেশ পেয়েছে। অপরাহ্নে খাস প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে জরুরি নির্দেশ এসেছে, রাত এগারোটা থেকেই বিশেষ বিমানটি রানওয়েতে রেডি হয়ে থাকবে। গোপনীয়তা রক্ষার তাগিদ আসছে ঘন ঘন। সৈন্যরা যার যার সীমানায় টহল দিচ্ছে। চোখ সজাগ। কান খাড়া।

কোনো খবর গোপন করে রাখার মতো শহর নয় রাওয়ালপিন্ডি। হাজার হাজার লোক জেনে গেছে যে রানওয়েতে অপেক্ষমাণ বিমানটির যাত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। এটা আজ রাতেই উড়ে যাবে। এন্তার গুজব-গুঞ্জন সেই বিকেল থেকেই রাওয়ালপিন্ডির বাতাসে ভেসে বেড়ায়। (*পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু* পৃ. ১১৮)

পাকিস্তানের নয়া প্রেসিডেন্টের গাড়ির বহর সরাসরি একবার বিমানবন্দরের টারমাকে গিয়ে থামল। সাথে সাথে সৈন্যরা আশপাশের নিরাপত্তা ব্যূহ রচনা করে ফেলে। নির্বাক, নিস্তব্ধ অথচ ব্যস্ত এয়ারপোর্ট। ভুট্টোর চেহারা পাংশুবর্ণ। মুখে কোনো কথা নেই। মুজিবের মনে অজানা আশঙ্কা।

কয়েক গজ দূরেই পিআইএ'র বিমানটি আকাশে উড়বার জন্য প্রস্তুত। পাইলট স্টুয়ার্ড সবাই রেডি।

প্রবেশপথে স্বাগত ভঙ্গিতে এয়ারহোস্টেস দাঁড়িয়ে।

মুজিব বিমানের গ্যাংওয়ে থেকে টারমাকে দাঁড়ানো ভুট্টোর দিকে তাকালেন। নীরব বিনয়সূচক হাত নাড়লেন। ভুট্টোও হাত তুলে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিদায় মুহূর্তে সৌজন্যমূলক বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। ভুট্টোর স্বাগত উচ্চারণ : পাখি উড়ে গেল।

সময় সকাল ৬টা ৩৬ মিনিট। ৯ই জানুয়ারি শেখ মুজিবের বহনকারী পাকিস্তানের বিমানটি কুয়াশাসিক্ত শীতার্ত ভোরে হিথরো বিমান-বন্দরে অবতরণ করল। পুলিশ প্রহরায় একটা রোলস রয়েস গাড়ি

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে গেল ক্ল্যারিজ হোটেলে। লবিতে মিনিট তিনেক বসবার পরেই তাঁকে নির্ধারিত স্যুটে নিয়ে যাওয়া হলো। নরম সাদা কার্পেট শোভিত রুম। স্বাচ্ছন্দ্যময় ডবল বেড। রুপোলি বাটিতে সুন্দর ফুল সাজানো। মার্জিত রুচি, আভিজাত্য ও বিলাসের ছাপ রুম জুড়ে। সাদা সোনালি রঙের দরজার সামনে দু'জন স্মার্ট লোক দাঁড়িয়ে। এরা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সদস্য। (*পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু* পৃ. ১২২–১২৩)

পাকিস্তানের কারাগার থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের ব্রিটেন আগমনের সংবাদ খুব দ্রুত লন্ডন শহরে ছড়িয়ে পড়ল। সাতসকাল থেকেই দলে দলে প্রবাসী বাঙালিরা এসে ক্ল্যারিজ হোটেলে ভিড় জমাতে লাগল। প্রিয় নেতাকে এক নজর দেখবার জন্য সবার চোখ উৎসুক, সব মন উন্মুখ। স্যুটের বারান্দায় ভক্ত, সমর্থক, স্বজনরা গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে। প্রবাসীদের মুখেই মুজিব প্রথম শুনতে পেলেন, স্বদেশে পাকিস্তান বাহিনীর নিষ্ঠুর গণহত্যার আসল চিত্রকথা। খুন, ধর্ষণ, আগুনের বিভীষিকাময় ছবি। রক্তে রক্তে নদী বয়ে যাওয়ার রক্তহিম করা কত কাহিনি। পাশবিক উল্লাসে পাকিস্তান বাহিনী এত নোংরাভাবে প্রলয়নৃত্যে মেতে উঠতে পারে মুজিব একটু আগেও ঠিক এতটুকু ভাবতে পারেননি।

দু'হাতে মুখ ঢেকে তিনি শিশুর মতো কেঁদে ফেললেন। আবেগে জড়ানো কাঁপা গলায় বার বার কেবল একটা কথাই বেরিয়ে আসছে। আহঃ আমার দুঃখিনী বাংলা মা। (*পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু* পৃ. ১২৪)

শেখ মুজিব বললেন, 'ওল্ড এ ম্যান হু ইজ রেডি টু ডাই, নো বোডি ক্যান কিল' (যে মানুষ নিজেই মরণে প্রস্তুত তাকে কেউ মারতে পারে না)। যুদ্ধের খবর আমি জানতাম। আকাশে জঙ্গি বিমানের ছুটোছুটি দেখেছি। দেখেছি হঠাৎ নিষ্প্রদীপ হয়ে যাওয়া মিয়ানওয়ালি কারাগারকে। ভুট্টোর সাথে প্রথম সাক্ষাতের আগে আমি জানতাম না বাংলাদেশ সরকারের অস্তিত্বের খবর। পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা প্রসঙ্গে মুজিব ক্রুদ্ধ মেজাজে বললেন, স্বয়ং হিটলারও যদি আজ জীবিত থাকত তাহলে এ বর্বর হত্যাকাণ্ড দেখে অবশ্যই লজ্জা বোধ করত।

মুজিব বললেন, ভুট্টো সাহেব চেয়েছিলেন, আমাকে দিয়ে যে-কোনোভাবে পাকিস্তানের সাথে একটা সম্পর্কের সূত্র ধরে রাখতে। আমি তাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি, আমার জনগণের কাছে ফিরে যাওয়ার আগে আমি কিছুই বলতে পারব না।

লন্ডনের সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিবের পাকিস্তানবিরোধী কঠোর বক্তব্য জেড এ ভুট্টোর পুনর্মিলন স্বপ্নের নড়বড়ে সৌধটাকে একেবারে ভেঙে দিল।

শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ তথা জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বললেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা এখন এক অপ্রতিরোধী বাস্তবতা। সেদিন সন্ধ্যায় শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডনের ১০নং ডাইনিং স্ট্রিটের সুরম্য ভবনে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হীথের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ বৈঠকে মিলিত হন।

হীথ বললেন: আপনাকে যে জীবিত দেখতে পাব এটা সত্যি ভাবিনি। তবু আপনার ভালোর জন্য প্রার্থনা করেছি। আপনার মুক্তির জন্য আমার সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা তদবিরও কম হয়নি। (*পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু* পৃ. ১২৮)

১০ই জানুয়ারি বাহাত্তর মহোৎসবের এমন মাহেন্দ্রক্ষণ বুঝি আর কখনো আসেনি বাঙালি জীবনে। এত হাসিখুশির ফোয়ারায় দিলখোলা এই সন্তরণ অতীতে কখনো কেউ দেখেনি এখানে। বিজয়ের নায়ক আসছেন ফিরে, দেশনেতা-দেশবাসীর মাঝে। আনন্দে উচ্ছল ঢাকায় বইছে জীবনের জোয়ার, ওরা আজ প্রাণভরে বিজয়ের স্বাদ উপভোগ করছে। হৃদয়ের সব আবেগ আকুতি উজাড় করে দিয়ে খুশির স্রোতে ভেসে চলেছে।

কাল সারারাত ঢাকায় কারো চোখে ঘুম ছিল না। দিবালোকের মতোই হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় রাস্তায় আনন্দধ্বনি তুলেছে। মুক্তিযোদ্ধারা ফাঁকা গুলি আকাশে ছুঁড়ে ঢাকার শীতল রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়েছে। উৎসব আনন্দে। (*পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু* পৃ. ১৩২)

তোপধ্বনিতে ঢাকা কেঁপে কেঁপে গর্জে উঠছিল মহাবীরের বীরোচিত সংবর্ধনায়। আবেগে অশ্রুসিক্ত মুজিবুর রহমান বিমানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। প্রিয় নেতাকে দেখামাত্রই এয়ারপোর্টে সমবেত লাখো জনতা অবিস্মরণীয় উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। স্লোগানে স্লোগানে বাঙালির বুকের পাঁজরে সঞ্চিত সব আবেগ, উল্লাস, ভালোবাসার অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ।

বিমানের সিঁড়িতে থাকতেই ফুলে ফুলে ডুবে গেলেন তিনি। রক্তভেজা স্বজন হারানোর শোকে পাথর বাংলাদেশের চোখে আজ আনন্দাশ্রুর ধারা। মুজিবের গণ্ড বেয়ে অবিরাম নামছে অশ্রুধারা। অঝোরে কাঁদছে রিক্ত-নিঃস্ব আপনজনহারা শোকাতুর কত মানুষ।

জনতার চোখে পানি, তবু মুখে হাসি অমলিন। মুজিবকে পেয়ে সব হারানোর বেদনা যেন ভুলে গেছে তারা। এতদিনের শূন্য হৃদয়ের খাঁ খাঁ প্রান্তর মুহূর্তেই যেন পূর্ণতায় ভরে উঠেছে। (*পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু* পৃ. ১৩৫)

কাহিনির ইতি টানা হয়েছে এভাবে :

শীত শীত পড়ন্ত বিকেলে সূর্য অস্তাচলে। গোধূলি শেষে ঢাকার আকাশে সন্ধ্যাতারার মেলা বসতে আর দেরি নেই। নতুন চাঁদ হাসবে আলো ছড়িয়ে অমানিশার আঁধার থেকে উদয়ের আলোর পথে হতাশার তিমির থেকে আশার আলো ঝর্ণাধারায় মুজিবের নেতৃত্বে নবজাতকের যাত্রা শুরু।

অবশ্য একথা না বললেই নয় যে, রবার্ট পেইন বাঙালি নন। তিনি ইংরেজ। পেশায় সাংবাদিক। তার চোখ বাস্তববাদী, অভিজ্ঞতা তাই বিস্তৃত। এই আন্তর্জাতিক বিদেশি সাংবাদিক যখন অন্য এক ভাষাভাষী ও জাতির মহানায়ককে নিয়ে কোনো উপন্যাস লিখবেন সেটা নিঃসন্দেহে উপন্যাস না হয়ে বাস্তব জীবনের কথাই হবে। এদিক থেকে পেইনের *দ্য টর্চার্ড অ্যান্ড দ্য ডেমড*-কে আমরা বলতে পারি প্রামাণ্য উপন্যাস। আর ইতিহাসও সে কথাই বলে। বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তানের কারাগারের দিনগুলো পেইনের এই গল্পকথার মতো সত্য। ফলে এ গ্রন্থ শুধু উপন্যাস নয়, বঙ্গবন্ধুর নয় মাসের বন্দি জীবনের সেই ভয়াবহ অবস্থার সত্য ইতিহাস।

ওবায়দুল কাদের বাংলাদেশের রাজনীতির উজ্জ্বল নাম। তবে রাজনীতির বাইরে তিনি একজন সাংবাদিক ও কলাম লেখক। ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি যৌবনে যেমন লেখালেখিতে সম্পৃক্ত ছিলেন, পরবর্তীতে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। এ কারণে ব্রিটিশ সাংবাদিক রবার্ট পেইনের সঙ্গে তাঁর মিল অনেকটা এবং একথাও সত্য যে, পেইনের মতোই তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল, স্পষ্ট এবং কখনো কখনো আবেগময়। এই অনুবাদে সে ব্যাপারটিও পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে, এটাকে অনুবাদ না বলে তিনি ভাবানুবাদ বলেছেন। আমাদের সৌভাগ্য হতো যদি পেইনের মূল গ্রন্থটি পড়া থাকত।

অনুলিখন: শাফিকুর রাহী, কবি ও প্রাবন্ধিক (সংক্ষেপিত)

নিবন্ধ

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় সংগীত

মাহবুব রেজা

মা, মাতৃভূমি আর মাতৃভাষা– একটি আরেকটির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই তিনের কোনোটিকে যেমন আলাদা করা যায় না তেমনি বঙ্গবন্ধু, বাঙালি আর বাংলাদেশও একই সুতোয় গাঁথা। হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাস পর্যালোচনা করে ইতিহাস বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বঙ্গবন্ধু, বাঙালি ও বাংলাদেশ এক অবিচ্ছিন্ন সত্তার নাম। তারা বলেছেন, বাঙালি জাতির এই মহানায়কের জন্ম না হলে বাংলাদেশের হয়ত জন্মই হতো না।

বঙ্গবন্ধু সারাজীবন স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর অন্তরে সর্বদাই কাজ করত বাংলা, বাঙালি আর বাংলাদেশ। বাঙালি জাতিকে স্বাধীন জাতিসত্তার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ এই বাঙালি। আর এই কাজে তিনি বাঙালিকে নিয়ে সফলও হয়েছেন। আজ বিশ্বের যে-কোনো অঞ্চলে যখন লাল-সবুজের পতাকা পত পত করে ওড়ে তখন সেই পতাকায় ফুটে ওঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮-র সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, '৬৬-র ৬ দফা, '৬৯-র গণ-অভ্যুত্থান, '৭০-র নির্বাচন একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজস্ব ক্যারিশমা আর নেতৃত্ব দেখিয়ে হয়ে উঠেছিলেন সকলের মধ্যমণি। স্বাধীন বাঙালি জাতিসত্তা বিনির্মাণের পথও দেখিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। আজও আমরা তাঁর দেখানো পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছি। এই অগ্রযাত্রার সৈনিক প্রতিটি বাঙালি।

পারিবারিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের কারণে ছোটোবেলা থেকেই রাজনীতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর তীব্র আগ্রহ ছিল একথা সবার জানা। তবে এর পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর ভেতর একটা শিল্পীমন এবং শৈল্পিক চিন্তাধারা ও মননের দিক ছিল সেটা পরবর্তীতে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর সার্বক্ষণিক চিন্তাভাবনায় এক ধরনের সৃষ্টিশীল বিষয় কাজ করত। বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* বইতে আমরা সেসবের উপস্থিতি টের পাই। তাঁর পারিবারিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ, পরিবেশ, বাবা-মার প্রখর ব্যক্তিত্ব, বর্ণিল শৈশব, প্রকৃতির সীমাহীন সৌন্দর্য সর্বোপরি পড়াশোনার প্রতি অনুরাগ– এসব বঙ্গবন্ধুর মধ্যে এক ধরনের আলোড়ন তৈরি করে। তিনি তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে সেকথা লিখেছেনও,

> 'আমার আব্বা খবরের কাগজ রাখতেন। *আনন্দবাজার*, *বসুমতি*, *আজাদ*, *মাসিক মোহাম্মদী* ও *সওগাত*। ছোটোবেলা থেকেই আমি সকল কাগজই পড়তাম' (*অসমাপ্ত আত্মজীনী*, পৃষ্ঠা ১০)।

জনগণের মাঝে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

টুঙ্গিপাড়ার ঐতিহ্যবাহী শেখ পরিবারের সন্তান হয়ে কখনোই বঙ্গবন্ধু নিজেকে জাহির করতেন না। দশজনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে চলতে ফিরতেই বেশি পছন্দ করতেন। বাঙালির ভাষা- সমাজ- সংস্কৃতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা। বাংলার নদী, বাংলার জল, বাংলার সাধারণ মানুষ আর বাংলার উদার প্রকৃতিও প্রবলভাবে টেনেছিল তাঁকে। প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক আন্দ্রে মার্লো ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন হলো,

> 'তাঁকে (বঙ্গবন্ধু) আর শুধুমাত্র একজন সাধারণ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে পাওয়া যায় না। তাঁকে দেখা যায় বাংলার প্রকৃতি, আকাশ, বাতাস, পাহাড়, পর্বত, বৃক্ষরাজি, শস্যক্ষেত্রের মাঝে।'

বাংলার হাজার বছরের সংস্কৃতিকে অন্তরে লালন করতেন তিনি। গানবাজনা, নাটক, গল্প-উপন্যাস, কবিতা তাঁকে দেখিয়েছিল নতুন পথ। তিনি নিজেও প্রচুর বই পড়তেন, অবসর কিংবা কারাগারে তাঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল বই পড়া, গান শোনা। গানের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আলাদা এক ধরনের ভালোবাসা ছিল যার প্রমাণ আমরা তাঁর লেখায় বার বার পাই। বাংলা গানের অসম্ভব রকমের ভক্ত ছিলেন তিনি। তিনি নিজেও গুনগুন করে গান গাইতেন। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র ১১১ পৃষ্ঠায় আমরা দেখি বঙ্গবন্ধু শিল্পী আব্বাসউদ্দিনের ভাটিয়ালি গান শুনে একজন কবির মতোই লিখছেন, 'নদীতে বসে আব্বাসউদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেন তাঁর গান শুনছে।'

কী আশ্চর্য!

নদীর ঢেউও আব্বাসউদ্দিনের গান শুনছে!

এইকথা শুধু রাজনীতির কবি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই উচ্চারণ করা সম্ভব।

কীভাবে, কবে থেকে কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি আমাদের চেতনার সঙ্গে, আমাদের হৃদয়ের অলিন্দে, মস্তিষ্কের কোষে কোষে, অস্থিমজ্জায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল? রবীন্দ্রনাথের এই গানটি কীভাবে আমাদের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেল তা নিয়ে গবেষক ও ইতিহাসবিদরা তাদের মতামত ও বিশ্লেষণ ব্যখ্যা করেছেন। তাঁরা বলছেন, রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের মনের কথা, আবেগের কথা, ভালোবাসার কথার অনুভব পেতেন। বাঙালিকে কবিগুরু অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছিলেন সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৯৬৬ সালে ঢাকার ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগের ৩ দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্‌বোধন হয়েছিল 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি দিয়ে। গানটির প্রতি ছিল বঙ্গবন্ধুর আলাদা আবেগ। এই গানটিকেই যে তিনি পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করবেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গবেষকরা আরও বলছেন, বঙ্গবন্ধু কবিগুরুর গানে মানুষের দেশপ্রেম, আবেগ, ভালোবাসা, মুক্তির ডাক, অত্যাচার–বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ– এর সবই খুঁজে পেয়েছিলেন সার্থকভাবে।

শিল্প-সাহিত্যের প্রতি আলাদা ধরনের পক্ষপাতিত্ব ছিল তাঁর। তাঁর দীর্ঘ কারাবাসের সময়ও তিনি প্রচুর বই পড়তেন। বাংলা সাহিত্যের সব নামকরা লেখকদের বইতো পড়তেনই, তার বাইরে বিদেশি সাহিত্যের প্রতিও তাঁর দুর্বার আকর্ষণ ছিল। তিনি বন্দি অন্যান্য নেতাদেরও বই পড়া, গান শোনাতে উদ্বুদ্ধ করতেন। বঙ্গবন্ধুর ভীষণ প্রিয় ছিলেন কবিগুরুর লেখা। বঙ্গবন্ধুর ওপর যারা গবেষণা করছেন তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন তা। তাঁরা এ প্রসঙ্গে বলছেন, বঙ্গবন্ধুর জীবনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব ছিল অপরিসীম। বঙ্গবন্ধু কবিগুরুর বাণী আর গান শুনে তাঁর নিজস্ব স্বপ্ন পূরণে যোজন যোজন পথ

পাড়ি দিয়েছেন। কবিগুরুর গান তাঁকে উৎসাহ আর প্রেরণা জুগিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে, দুঃসময়ে কিংবা উত্তাল সময়ে বাঙালি জাতির ভাগ্য নির্ণয়ের কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান দিয়ে, বাণী দিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন পরম বন্ধুর মতো। গবেষকরা বলছেন, বঙ্গবন্ধুর ভেতরে বাঙালি জাতিসত্তার ভাবনার বীজ সফলভাবে প্রোথিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিবারের সদস্যদের মাঝে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

রবীন্দ্র গবেষকরা বলছেন, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বাংলা ও বাঙালিকে স্বাধীন করার অনুপ্রেরণা, সাহস এবং শক্তি বঙ্গবন্ধু পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। কবিগুরুর লেখা পড়ে বঙ্গবন্ধু যেভাবে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বাঙালি জাতিকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন তেমনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা, গান আর তাঁর লেখা পড়েও তিনি সমানভাবে উজ্জীবিত হয়েছিলেন– একথা বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতা, লেখায় বার বার উল্লেখ করেছেন।

প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও গবেষক অধ্যাপক সনজীদা খাতুনের *বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় আমার সোনার বাংলা* শীর্ষক এক লেখায় রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম ভালোবাসার কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি তাঁর লেখায় ষাটের দশকে পাকিস্তানি শাসকদের রবীন্দ্র বিরোধিতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লিখেছেন,

> 'পঞ্চাশ দশকে একবার আমার খুব ভালো করে মনে আছে– কার্জন হলে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল। আমাকে গান গাইতে বলা হয়েছিল। আমি খুব বিস্মিত হয়ে গেলাম গান গাইতে। কী গান গাইব? এমন সময় দেখা গেল সেখানে বঙ্গবন্ধু। তখন তো তাঁকে কেউ বঙ্গবন্ধু বলে না– শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি লোক দিয়ে আমাকে বলে পাঠালেন আমি যেন 'সোনার বাংলা' গানটা গাই–'আমার সোনার বাংলা'। আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। এত লম্বা একটা গান। তখন তো আর এটা জাতীয় সংগীত নয়। পুরো গানটা আমি কেমন করে শোনাবো? আমি তখন চেষ্টা করে গীতবিতান সংগ্রহ করে সে গান গেয়েছিলাম কোনোমতে। জানি না কতটা শুদ্ধ গেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি এভাবে গান শুনতে চাওয়ার একটা কারণ ছিল। তিনি যে অনুষ্ঠান করছিলেন, সেখানে পাকিস্তানিরাও ছিল। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন তাদেরকে ' আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' কথাটা আমরা কত সুন্দর করে উচ্চারণ করি। এই গানটার ভিতরে যে অনুভূতি সেটা তিনি তাদের কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছিলেন এবং আমার তো মনে হয় তখনই তাঁর মনে বোধ হয় এটাকে জাতীয় সংগীত করবার কথা মনে এসেছিল। বাহান্ন সালে আমরা যখন রবীন্দ্রসংগীত চর্চা করি তখন শহিদমিনারে প্রভাতফেরিতে রবীন্দ্রসংগীত গাইতাম। এইভাবে রবীন্দ্রসংগীত কিন্তু তখন বেশ চলেছে। আরো পরে কেমন করে যেন একটা অলিখিত বাধা এল। পাকিস্তান আমলের পরে রবীন্দ্রসংগীত 'আমার সোনার বাংলা' যখন জাতীয় সংগীত হলো, তার কিছুকাল পরে দেখা গেল– গানটা না করে শুধু বাজনা বাজাবার একটা রেয়াজ শুরু হলো। আমার মনে হয় এর মধ্যে সেই পাকিস্তানি মনোভাবটা কাজ করেছে।'

ইতিহাসবিদরা বলছেন, এই গানটি ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত হিসেবে প্রথম গাওয়া হয়েছিল। তবে এই গানটি আরো আগে থেকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আন্দোলন-সংগ্রামে বাঙালিকে সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। সে সময়ের সভা-সমাবেশে এই গানটি গাওয়া হতো। গবেষক, ভাষাবিদ এমিরেটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এই গান নিয়ে বলতে গিয়ে গণমাধ্যমে বলেন,

> মুক্তিযুদ্ধের সময় পুরো ১৯৭১ সালে তো বটেই, এর আরো অনেক আগে থেকেই গানটি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সভা-সমাবেশে গাওয়া হয়েছে। গানটি প্রতিটি বাঙালিকে উদ্দীপ্ত করেছে, প্রেরণাও জুগিয়েছে।

অন্যদিকে দেশের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> 'আমার সোনার বাংলা' গানটি ছিল বঙ্গবন্ধুর একটি প্রিয় গান। অনেক অনুষ্ঠানে তিনি গানটি গাইতে বলতেন। তিনি নিজেও অনেক সময় গুন গুন করে গানটি গেয়েছেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেকের স্মৃতিকথায় এর উল্লেখ আছে।

'আমার সোনার বাংলা' কেমন করে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হলো সে সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু নিজে ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

> '৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আমি যখন শেষবারের মতো জনসভা করি, যেখানে ১০ লাখ লোক হাজির হয়েছিল, আর তখন 'স্বাধীন বাংলা স্বাধীন বাংলা' স্লোগান দিচ্ছিল , তখন ছেলেরা গানটা গাইতে শুরু করে। আমরা সবাই ১০ লাখ লোক দাঁড়িয়ে গানটাকে শ্রদ্ধা জানাই। তখনই আমরা আমাদের বর্তমান জাতীয় সংগীতকে গ্রহণ করে নিই।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার সোনার বাংলা' গানটি লিখেছিলেন বাংলাদেশে বসে। বঙ্গভঙ্গের সময়, ১৯০৫ সালে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে। গানটির মূল পাণ্ডুলিপি না পাওয়ায় গবেষকরা এই গানের সঠিক রচনার তারিখ খুঁজে বের করতে পারেননি। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রশান্ত কুমার পালের মতে, এই গানটি প্রথম গাওয়া হয়েছিল ঐ বছরেরই ২৫শে আগস্ট কলকাতার টাউন হলের এক অনুষ্ঠানে। পরের মাস সেপ্টেম্বরে (১৩১২ বঙ্গাব্দের ২২শে ভাদ্র) কবির স্বাক্ষরসহ *সঞ্জীবনী* পত্রিকায় গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়বার গানটি ছাপা হয় ১৩২২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায়। জমিদারি দেখভালের কাজে ১৮৮৯-১৯০১ পর্যন্ত অনেকবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কুষ্টিয়া, পাবনা, নওগাঁ এলাকায় আসা-যাওয়া করেছেন, থেকেছেন। তখন পূর্ব বাংলার বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকগান, বাউল গানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ও যোগাযোগ ঘটে। পরে স্বদেশি আন্দোলনের সময় লেখা অনেক গানে তিনি পূর্ব বাংলার লোকগানের সুর ব্যবহার করেছেন। 'আমার সোনার বাংলা' গানটিতে রবীন্দ্রনাথ খুব সচেতনভাবেই কুষ্টিয়ার লোককবি ডাকপিয়ন গগন হরকরার ' আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে' গানটির সুরের সঙ্গে মিল রেখে সুর করেছেন– একথা তিনি বলেছেনও।

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'– রবীন্দ্রনাথ এই গান বাংলা, বাংলাদেশ আর বাঙালিকে সামনে রেখে লিখেছিলেন– একথা এখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বের আনাচেকানাচে যেখানেই এই গানের সুর বেজে উঠবে তখনই সেখানে ফুটে উঠবে এক সিংহ-হৃদয়ের মানুষের ছবি। বঙ্গবন্ধুর ছবি।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

৫৬ হাজার বর্গমাইলের প্রতিচ্ছবি ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

আ.ফ.ম. মোদাচ্ছের আলী

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান এসেছিল যে উদ্যান থেকে সেটি রমনা এলাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান, আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। পুরোনো হাইকোর্ট থেকে শুরু করে রমনা পার্ক, তারপর রমনা পার্ক পেরিয়ে মিন্টো রোড, শাহবাগ, পুরো নীলক্ষেত এলাকা, কার্জন হল থেকে মেডিক্যাল, কখনো কখনো পুরো অঞ্চলটিকেই বোঝানো হতো রমনা বলে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে শাহবাগ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বা নীলক্ষেত আলাদা আলাদা একক। পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছে পুরো এলাকাটিই রমনা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শাহবাগ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানও। এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের নাম ছিল রেসকোর্স ময়দান, যা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের আহ্বান এবং চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতীক হিসেবে আমাদের স্মৃতিপটে চির অম্লান থাকবে।

মোগল আমল (১৬১০) থেকেই বিশেষ এলাকা হিসেবে রমনার ইতিহাসের শুরু। পুরো রমনা এলাকাটি মোগল আমলে ছিল বর্তমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বার কাউন্সিল ভবন ও সাবেক সড়ক ভবন পর্যন্ত সাজানো বাদশাহি বাগান। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন-এর লেখা মতে,

> কলা ভবন, কার্জন হল থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে দুটি আবাসিক এলাকা– মহল্লা শুজাতপুর ও মহল্লা চিশতীয়া, যেখানে তাইফুরের মতে ছিল দু-তিনতলা বাড়ি, বাংলো, অভ্যর্থনার জন্য প্রশস্ত হল ঘর। তাইফুর যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে মনে হয় পুরো শুজাতপুরই বোধ হয় ঘরবাড়িতে ভর্তি ছিল। আসলে তা সম্ভব ছিল না। মোগল আমলে (বিশেষ করে প্রথমদিকে, যখন শুজাতপুরের পত্তন) মসজিদ নির্মাণের দিকেই খানিকটা মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল, আবাসিক গৃহ নির্মাণে নয়। তবে, মোগল আমলের শেষদিকে হয়ত শুজাতপুরে দু-একটি অট্টালিকা নির্মিত হয়ে থাকতে পারে, নির্মিত হয়ে থাকতে পারে দু-একটি অভ্যর্থনা কক্ষও। খুব সম্ভবত আঠার শতকের শেষের দিকে বা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে হয়ত আরো কিছু ইটের তৈরি বাড়িঘর নির্মিত হয়েছিল। এ অনুমান করছি ১৮৩২ সালে ওয়ালটারের দেওয়া একটি পরিসংখ্যান থেকে। যা হোক এ দুটি এলাকা ও বাদশাহি বাগের মাঝখানের জায়গাটুকু (আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জুড়েছিল সবুজ ঘাসে ঢাকা চত্বর।

ফারসিতে রমনা শব্দটির অর্থ মুনতাসীর মামুন তার *স্মৃতি বিস্মৃতির ঢাকায়* লিখেছেন– সবুজ ঘাসে ঢাকা চত্বর ইংরেজিতে লন। অন্য অর্থে এই শব্দের অর্থ জব্দ। ইংরেজরা এই এলাকা পরিষ্কার করেছিল ঘোড়দৌড়ের জন্য।

হাইকোর্টের মাজার থেকে শাহবাগের মোড় পর্যন্ত জায়গাটি ছিল ঝোপঝাড় ও জঙ্গল। ইংরেজ শাসন আমলে রমনার জঙ্গল পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তৎকালীন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস্ ডর্স ১৮২৫ সালে জেলের কয়েদিদের নিয়ে রমনার জঙ্গল পরিষ্কার কাজে হাত দেন। বাঙালির অস্তিত্বের সাথে মিশে আছে রেসকোর্স বা আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। সংকটে, সংকল্পে ও সংগ্রামে বাঙালির ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এই উদ্যান। এর শুরুটা ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের একুশ তারিখ। পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দেশ ভাগের পর রেসকোর্স মাঠের জনসভায় ইংরেজিতে ঘোষণা করলেন– 'উর্দু, কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা,' উপস্থিত বাঙালিরা 'না, না' শব্দে প্রতিবাদ করে উঠল। এরপর এই রেসকোর্স-এ হয়েছে অনেক সভা-সমাবেশ। ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের পতনের পর বঙ্গবন্ধু জেল থেকে মুক্ত হন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি এই রেসকোর্সের মাঠেই কারামুক্ত শেখ মুজিবকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করার ঘোষণা দেন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ। আর এই 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি প্রথম তাঁর নামের পাশে যিনি লিখেছিলেন তিনি চট্টগ্রামের রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক। তিনি তখন ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। তার স্বহস্তে লেখা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ-এর প্যাডে 'আজব দেশ' নামক নিবন্ধে 'সারথি' ছদ্মনামে তিনি 'পূর্ব বাংলার নয়নমণি-মুক্তির দিশারী-বঙ্গবন্ধু সিংহশার্দুল জনাব শেখ মুজিবুর রহমান' উল্লেখ করেন। ১৯৬৮ সালে ছাত্রলীগের প্রকাশিত 'প্রতিধ্বনি' বুলেটিনে ঐতিহাসিক ৬ দফা পুনঃমুদ্রণের সময় 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি আনুষ্ঠানিকভাবে ছাপার অক্ষরে রূপ নেয়। এরপর ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ধস নামানো বিজয়ের পর ১৯৭১-এর শুরুতে এই রেসকোর্সেই 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি বাজিয়ে

রমনা রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ দিচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (সাবেক রেসকোর্স ময়দান)-এ স্থাপিত স্বাধীনতা স্তম্ভ

জনসমক্ষে অনানুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। এর পরের ইতিহাস আন্দোলনের, শঙ্কার, সংকটের। চারদিকে সংশয়, কী হয়! কী হয়। ঠিক এমনি এক সময়ে ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ রেসকোর্সের মাঠে আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী সভার সিদ্ধান্ত হয়। যাতে বাংলার জনগণকে আগামী দিনের দিক-নির্দেশনা দেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৭ই মার্চের রেসকোর্স হয়ে ওঠে লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশ। বিপুল আত্মশক্তিতে বলীয়ান সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রিয় নেতা তাঁর স্বভাবজাত ভঙ্গিমায় শুরু করেন ভাষণ, যা বাঙালির যুদ্ধ জয়ের মন্ত্র, কৌশল। যে ভাষণ ইতিহাসের আলো। পরবর্তীতে পৃথিবীর ৭টি ভাষণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হয় এটি। অনেকে এই ভাষণকে জনযুদ্ধের রোডম্যাপ বলে আখ্যায়িত করেন। অবিরল শব্দধারায় ১৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড ও ১১০৮টি শব্দের এই ভাষণকে 'Poetry of Politics'ও বলা হয়। আর এই ইতিহাসের গৌরবময় স্মৃতিবহনকারী কালের সাক্ষী ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। এর পরের ইতিহাস বর্বরতার বিরুদ্ধে লড়াই ও সংগ্রামের। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী বাংলার বুকে গণহত্যা চালায়। বিনা অপরাধে শহিদ হয় লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ। এদেশের মানুষ নেমে পড়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে। দীর্ঘ নয় মাস বুক চিতিয়ে তাড়িয়ে বেড়ায় কথিত বিশ্বসেরা পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীকে। ছিনিয়ে আনে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ১৬ই ডিসেম্বরে আসে ঈপ্সিত বিজয়। স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। যে উদ্যান থেকে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার ডাক দেওয়া হয়েছিল সেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে অস্তগামী লাল সূর্যের আলোয় ৯৩০০০ হাজার বর্বর পাকিস্তানি সেনা তাদের প্রধান লে. জে. আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজীর সাথে আত্মসমর্পণ করে যৌথবাহিনীর প্রধান ও ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার প্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে। সাথে ছিলেন বাংলাদেশ বাহিনীর উপপ্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খোন্দকার। যবনিকাপাত ঘটে পাকিস্তানি বঞ্চনা, অত্যাচার ও বর্বরতার। সৃষ্টি হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। এর ২৪ দিন পর এই উদ্যানেই ফিরে আসেন ইতিহাসের মহানায়ক, স্বাধীনতার কবি, বাঙালির মুক্তির দিশারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে তিনি সরাসরি রেসকোর্স তথা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অপেক্ষমাণ লাখো জনতার মাঝে ফিরে আসেন। আবেগমথিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান।' পিনপতন নিস্তব্ধতায় একাগ্রচিত্তে মানুষ শুনতে থাকে একটি জাতির জন্মদানকারী এক সাহসী মানুষের বিজয়বাণী। সার্থক হয় কবিগুরুর 'হে মহামানব একবার এসো ফিরে'। ফিরে আসেন মহামানব। এখানেই থেমে থাকেনি রেসকোর্স। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মিত্র শক্তি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশে আসলে এ রেসকোর্সেই বানানো হয় ইন্দিরা মঞ্চ। অনুষ্ঠিত হয় বিশাল সমাবেশ।

বাঙালির ইতিহাসে মীর জাফরেরা সব সময় সক্রিয় থাকে। মীর জাফরের প্রেতাত্মাদের কূটচালে বাংলাদেশ আবার সংকটে পড়ে যায়। আসে ১৯৭৫-এর শোকাবহ কালরাত। জাতি হারায় তার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে।

বাঙালি আবারো ফিরে আসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। এখানেই শহিদ জননী, বীরমাতা জাহানারা ইমাম গণ-আদালতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশের অস্তিত্বের সাথে মিশে আছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। ১৯৯৬ সালে এর স্মৃতিকে চিরজাগরুক করে রাখতে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয় শিখা চিরন্তন, স্বাধীনতা স্তম্ভ ও স্বাধীনতা জাদুঘর। আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের গৌরবগাথা এ উদ্যান। যাকে ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশ বললেও অত্যুক্তি হবে না। এর একাংশে এখন অনুষ্ঠিত হয় বাঙালির প্রাণের মেলা 'অমর একুশে বইমেলা', যার গোড়াপত্তন করেছিলেন পুঁথিঘরের চিত্তরঞ্জন সাহা, বাংলা একাডেমির বটতলায়।

স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত রমনার রেসকোর্স হয়ে উঠেছিল হতশ্রী এক ময়দান, যার এক পাশে ছিল রেসকোর্সের কাঠের ক্ষয়ে যাওয়া বিবর্ণ রেলিং, অন্যদিকে দাঁড়িয়েছিল জীর্ণ কালী মন্দির। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনী মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল কালী মন্দির। সরকারি ঘোষণা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ঘোড়দৌড়। আর রমনা রেসকোর্সের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন তাঁর *'স্মৃতি বিস্মৃতির ঢাকা'* গ্রন্থে লিখেছেন–'মূল রমনা এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

> স্বাধীনতার পর যেসব শিশু জন্মগ্রহণ করেছে তাদের কাছে এ নামেই পরিচিত হয়ে উঠবে রমনা। আমাদের কাছে এখন যা স্মৃতি তাও একসময় হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে। ভবিষ্যতের শিশুরা যখন বাংলাদেশের ইতিহাস পড়বে, তখন হয়ত মাঝে মাঝে মুখোমুখি হবে রমনা শব্দটির। কারণ, এই রমনা রেসকোর্সেই ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশাল এক জনসভায় ভাষণ প্রদান করেছিলেন। বলেছিলেন, স্বাধীনতার কথা এবং এখানেই সেই বছরের ১৬ই ডিসেম্বরের অপরাহ্নে, ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল পাকিস্তানের বিশাল সেনাবাহিনী– সৃষ্টি হয়েছিল এক নতুন স্বাধীন দেশ– বাংলাদেশ।

আর সে কারণেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বাংলাদেশের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ, ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশ।

লেখক: ছড়াকার, শিশু সাহিত্যিক ও কলাম লেখক

শোকার্ত মানচিত্র

শাফিকুর রাহী

আগস্ট এলেই অভিশাপের কালাগ্নিতে পবিত্র এই জমিন যেন কাঁদে
আকাশ-বাতাস থমকে দাঁড়ায় কবির কলম পিতার শোকে করুণ শোক বাঁধে।
নিঃস্বার্থ এ ভালোবাসার হয় না মরণ অমর সে যে মৃত্যুহীন সেই প্রাণ,
কোন সে মহামানব তিনি কারাগারে কালের পরে কাল যে একা কাটান!
মাটি মানুষ ভালোবেসে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে একলা একা একা,
সেই যে মহাবীরের নামে বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার হলো গ্রন্থ লেখা।
আগস্ট এলেই কান্না-হাসি ভুলে আমি অবাক হয়ে তাকাই আকাশ পানে,
মনের তারে শোকের সানাই ভালোবাসার সুর বাজে না, কোথাও কোনোখানে।

পিতার পরম ভালোবাসায় লক্ষ প্রাণের জীবনদানে আমরা স্বাধীন জাতি,
একাত্তরের দালাল-খুনি-হন্তারকরা মধ্য আগস্ট গভীর কালো রাত্রি
কী ভয়ানক নিঠুরভাবে হানলো আঘাত; সাধের বাংলা হলো দিশেহারা,
দেশ-বিদেশে সেই না মহান নেতার জন্যে আজও মানুষ হয় যে পাগলপারা।
কোন সে হারমাদ মহাপাপী অপরাধীর অপযুদ্ধে সর্বনাশ যে হলো
সেই খুনিদের বীভৎসতায় কাঁদল আকাশ মাটি মানুষ নীরব নিথর রলো!
আগস্ট এলেই শোকার্ত এই মানচিত্র থমকে দাঁড়ায় পিতার রক্তবানে
সেই ঘাতকের চামচাচেলা আজও আমার স্বদেশ বুকে নিত্য আঘাত হানে।

ভালোবাসার পরম প্রিয় মানবজমিন পিতার রক্তে ভেসেছিল সেদিন,
মহান ঋষির কোনো দিনও শোধ হবে কি মহৎ জীবন দানের মহান সে ঋণ!
দীর্ঘদিবস দীর্ঘরাত্রি চোখের জলে শোকের গাঁথায় সে যে কোন উদাসী
বসতভিটে ঘরগেরস্থি উজাড় করে পথহারা এক করুণ ক্রীতদাসই!
পঁচাত্তরের মধ্য আগস্ট হন্তারক সে জান্তা ঘাতক পাপীর আস্ফালনে
ধ্বংস হলো মানবতার সব আয়োজন মানব নামের ধ্বংস দানব রণে
আগস্ট এলে ফুল ফোটে না চাঁদ ওঠে না বৃক্ষ-পাখি কাঁদে দীর্ঘশ্বাসে
খুনি-দোসর আজও আমার প্রাণের বাংলায় হুংকার ছাড়ে মাতে সর্বনাশে।

ডিজিটালের রূপকার সে সজীব ওয়াজেদ জয়ের অর্জিত গর্বগাঁথায়
নীলসমুদ্র জয়ের স্বরূপ বীর তারুণ্যের অবদানের মহৎ মর্মগাঁথায়
জাতির পিতার আদর্শতে জীবন জয়ে লড়ব সবে একই সে কাতারে,
জয়োল্লাসে বিজয় নিশান বুকে বেঁধে ভাসব না আর শোকার্ত পাথারে!
এই আগস্টেই শোককে আমরা শক্তিতে রূপ দিয়ে নামব দেশের ভালো কাজে
দেশরত্নেরই সাফল্যে আজ বঙ্গবন্ধুর অমরত্বের সেই শুভ সুর বাজে।
আগস্ট এলেই মাগো আমার দু'চোখে বয় শ্রাবণধারা নিত্য সারাক্ষণই
বঙ্গবন্ধুর আদর্শতে আমরা সবাই উৎসর্গ যে করব সবার প্রাণই।

জনক হারা শূন্য হৃদয়

জাকির হোসেন চৌধুরী

৭১-এর বজ্রভাষণে জনসমুদ্রে এনেছিল স্বাধীনতার প্রত্যয়,
মুক্তির উদ্দীপনায় কম্পিত এ স্বদেশ ভূমি
সকল শ্রেণির মানুষের হৃদয়ে শিখাজ্বলে স্মরণ সীমানায়
স্বাধীনতার চেতনায় গর্জে উঠে বাংলার নারী-পুরুষ সমন্বয়।
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'
মহানায়কের সূর্য সূচিত দর্পণে এসেছিল বিজয়।
'পনেরো আগস্ট ৭৫' পিতা হারানো শোকাশ্রু
শ্রাবণ শেষ রাতে অঝোর বৃষ্টি ধারা
পুষ্প পল্লবস্নাত রঞ্জিত বৃষ্টির জলে।
যার মানবীয় স্বর বাঙালির শরীরে শিহরণ তোলে
সে মহানায়কের নিভে যায় জীবন ধারাপাত
হে জনক তুমি চির অম্লান, চির দুর্জয়, চির অক্ষয়
তুমি জেগে রবে যুগ যুগ জনকহারা বাঙালির শূন্য হৃদয়ে।

শোকাহত হৃদয়ে দেখি

লিলি হক

'হাসুবু', তোমার আব্বাকে আমাকে একটু আব্বা ডাকতে দিবে ?
আহা, প্রিয় পিতাকে ডাকার কী আকুলতা সন্তানের
কী অসম্ভব সাহসের রেলিংয়ে ভর দিয়ে বঙ্গবন্ধু দেশকে
ভালোবেসেছিলেন, জেল ফেরত পিতাকে কাছে পেয়ে
আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন আদর নিচ্ছিলেন,
শেখ কামাল তখন একথা বলেছিলেন

তিনি প্রদীপ তাই তিনি নিরন্তর আলো ছড়ান
তিনি ধ্রুবতারা তাই তিনি দিগন্ত চেনান
অবক্ষয় দুর্দশাগ্রস্ত সমুদ্রের তিনি বাতিঘর
সতত পথ দেখান, তাঁর কর্মপ্রিয় দিনরাত্রির
রোজনামচায় দেখি হাজারো কাজের সাফল্য

'৭৫-এর ১৫ই আগস্ট শোকাহত হৃদয়ে দেখি
৩২ নম্বরের সিঁড়িতে রক্তাক্ত পঙ্‌ক্তিমালা
যাঁর ইস্পাতকঠিন ইচ্ছায় পৃথিবীর মানচিত্রে মুক্তিসনদ
হাতে এক আলোর পাখি, তাঁর শাণিত কলমে বার বার
উঠে এসেছে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ, প্রিয় বর্ণমালা
সোনালি ধানের ক্ষেত, শিশুর হাসি, বাবার আদর, মায়ের কোল।

কাদা জলে মেঠোপথে কৃষকের হাল, শ্রমিকের হাত
কর্মমুখর জীবন তৈরিতে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের রূপকার
বাংলার পথে-প্রান্তরে ঘুরে আলোর পথযাত্রী হয়ে, হিংসা
লোভ, ঘৃণা তিনটি শব্দ জীবনের অভিধান থেকে মুছে
ফেলতে আহ্বান জানিয়েছেন বলিষ্ঠ উচ্চারণে

'কোনো ভয় নেই তোমাদের, হাতের কব্জিতে প্রচণ্ড শক্তি
কাজ করার' হৃদয়ে অনেক প্রেম জমা আছে ভালোবাসার
মস্তিষ্কে উর্বর চিন্তা ফসল ফলানোর, এ বাংলা আমার
এ দেশ আমার, এ দেশ সোনার ধান আবাদের,
এ দেশ আমাদের।

অবিনাশী আলো

অঞ্জনা সাহা

কেউ কি ভেবেছিল, তাঁর উদাত্ত আহ্বানের অমোঘ টানে
লক্ষ লক্ষ মানুষ একদিন ঘর ছেড়ে নেমে আসবে পথে?
যার স্বপ্ন-দেখা চোখ দুটো দিয়ে একদিন এই বাংলার মানুষ,
নতুন সূর্যোদয় দেখেছিল–বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাঙালি
পেয়েছিল সবুজের বুকে লাল সূর্য আঁকা স্বাধীন পতাকা।
সেই স্বপ্নীল কৃষক তাঁর অবিনাশী আত্মার আলোকিত বীজ
বুনে দিয়েছিল প্রতিটি মানুষের স্পন্দিত প্রাণে।
অথচ অদ্ভুত অন্ধকারে কারা যেন চুপিসারে তাদের হিংস্র থাবা
মেলে রেখেছিল! হিংসা কী ভয়ংকর সর্বনাশ ডেকে আনে!
একদিন ভোরের আলো ফোটার আগে বিকট শব্দ করে
গর্জে উঠে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল মেশিনগানের গুলি।
তাঁর পবিত্র রক্তে ভেসে গিয়েছিল বেদনার্ত কংক্রিটের সিঁড়ি;
রক্ত-রঞ্জিত হয়েছিল স্বপ্নীল কৃষকের নিথর দেহ–
পড়েছিল ভাঙা চশমা, ছিটকে পড়া শখের পাইপ।
সেই মুহূর্তে ভোরের পাখিরা গান ভুলে গিয়ে
স্তব্ধতায় ডুবে গিয়েছিল ভয়ানক নিকষ আঁধারে।
নিঃশব্দে কেঁদেছিল ভূমিমাতা।
নীরব কান্না আর বুকচেরা আর্তনাদে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল
মানুষের বেদনার্ত বুক।

অবিনাশী আত্মার মৃত্যু নেই। তাঁর আলোকিত স্বপ্নের বীজ
ছড়িয়ে রয়েছে প্রিয় এই বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে।
মানুষের স্পন্দিত প্রাণে–বেঁচে থাকবে চিরকাল অমরতা নিয়ে।

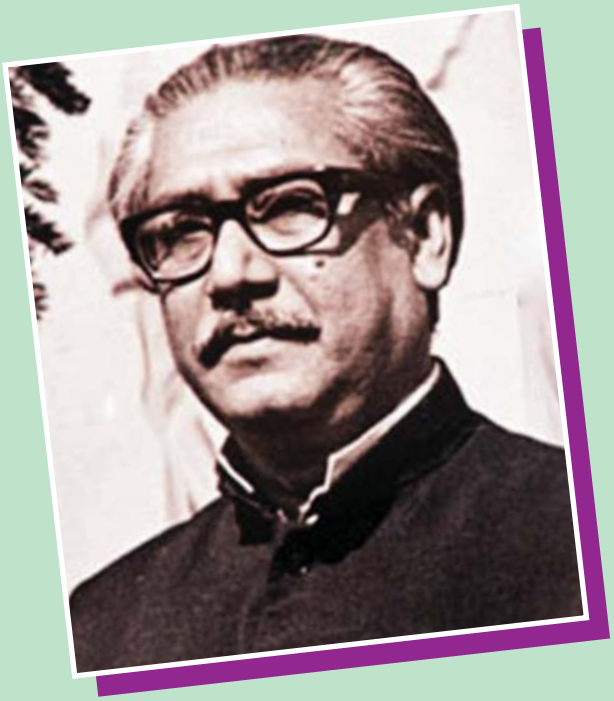

গানে গানে বঙ্গবন্ধু

অসিত কুমার মণ্ডল

বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক অবিনশ্বর পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার ইতিহাসে তিনি অবিসংবাদিত নেতা, বাঙালি জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীনতার মহানায়ক আবার তিনি স্বাধীনতার অগ্রসৈনিক। বাঙালি চেতনায় ও মননে তিনি এক দেদীপ্যমান পুরুষ হিসেবে চিরকাল উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলজ্বল করবেন। তিনি একাধারে রাজনীতির কবি, বাগ্মায় বক্তা, শৌর্য ও বীর্যশালী-দুঃসাহসিক তেজোদীপ্ত ব্যক্তিত্ব! তাঁর চেতনা ও মানসে যে স্বপ্ন সর্বদা লালিত হতো, তা স্বাধীনতার স্বপ্ন, একটি নতুন দেশ, জাতি, মানচিত্র আর ভূ-খণ্ডের স্বপ্ন। যে স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি জীবনে অনেক বছর জেলজুলুম আর অত্যাচার সহ্য করেছেন, পাকিস্তানিদের নির্দয় নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। তাঁরই নেতৃত্বে, নির্দেশনায় এবং ঘোষণায় দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে এদেশ স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় কুচক্রী মহল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করেছিল! কিন্তু তিনি মারা যাননি। মানুষের চেতনা ও মানসে তিনি চির-জাগ্রত হয়ে বেঁচে আছেন। তেমনি বেঁচে আছেন কবির কবিতায়, শিল্পীর তুলিতে, লেখকের লেখনীতে, গায়কের গানের সুরে, গীতি কবির রচিত গানের ছত্রে ছত্রে।

দীর্ঘ তেইশ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি তথা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে প্রথম রচনা করা হয় এ গানটি –

বাঙালি নতুন করে জেগেছে।
শুকনো মরুর বুকে আবার /ঝরনার বারিধারা নেমেছে।।
সব মিথ্যাচারের করি অবসান/বাঙালি কণ্ঠে নিল মুজিবের গান।
সত্য ইতিহাস খুঁজে এনে/ গাঁথল বাঙালি হৃদয় কোণে–
সত্যের বাঁশি বেজে উঠেছে।।
যে সত্য এতদিন গোপন করে/ রেখেছিল যারা দুনিয়ায়।
খুলে গেছে তাদের মুখোশ/ দুর্বিনীত কালের চাকায়।
চক্রান্তকারী যত শয়তানেরা/ধ্বংস হলো তাদের ডেরা!
নিভল তাদের আশার বাতি/ উঠল জেগে বাঙালি জাতি–
মুজিবকে তারা ভালোবেসেছে।।

জাতির পিতার প্রতি বিগলিত হাজারো কণ্ঠ যেন গানের সুরে জেগে উঠল। ধ্বনিময় প্রতিধ্বনি হয়ে গর্জে উঠল! শুধু গান আর গান। শতদিকে উৎসারিত হয়ে গানের ডালি নিয়ে হাজির হলো গীতি কবিরা। '৯৬-এর পনেরোই আগস্টের প্রথম শোক দিবসে লেখা হয়েছিল এ গানটি–

দেশকে তুমি স্বাধীন করে/ রক্ত দিয়েছ শেষে,
রক্ত দিয়ে দেশের মাটিকে/ গিয়েছ যে ভালোবেসে।।
তোমার রক্তে ভেজা এই মাটিতে/ সোনার ফসল ফলে;
নদীর বুকে চাঁদের আলোয়/ রুপালি ঢেউ দোলে।
এই মাটিরই গন্ধে তোমার/ নাম যে আছে মিশে।।
গাছের পাতার মরমরে আজ/ তোমার নাম যে শুনি;
হে মহান পিতা বঙ্গবন্ধু/ বাংলার মহা গুণী।
বিশ্বজুড়ে তোমার নাম যে/ সবার স্মৃতিতে ভাসে।।

প্রতিবছর ফিরে ফিরে পিতার জন্মদিন ১৭ই মার্চ আমাদের সামনে হাজির হয়। উচ্ছল আবেগে আপ্লুত হই আমরা। মার্চ মাস শুধু বঙ্গপিতার জন্ম মাস নয়। এটি অগ্নিঝরা মার্চও । এ মাসের ছাব্বিশ তারিখ বাঙালির স্বাধীনতার দিন। পিতার জন্মদিন আর স্বাধীনতাকে নিয়ে উনিশ'শ নিরানব্বইয়ের মার্চে একটি গানকে ভাষায় রূপ দেওয়া হয় এভাবে–

বাংলার পথে পথে, জীবনের সৈকতে/মিশে আছ তুমি চিরকাল;
রক্তের অক্ষরে লেখা রবে তব নাম/ উড়ছে যে পতাকা লাল।।
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি/ স্বাধীনতার দিলে ডাক;
সাত কোটি বাঙালি উঠল জেগে /শুনে বজ্রকণ্ঠের হাঁক।
মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল/ ছিঁড়ল শত্রুর জাল।।
বাংলার ইতিহাসে–চিরদিন তুমি আছো/স্মরণীয় এক নাম;
যে নাম শুনে উঠবে জেগে/কোটি জনতার গ্রাম।
জন্মদিনে ফেলবে সবাই/ শ্রদ্ধায় অশ্রুজল।।

মহাপুরুষ বা মহামানবের জন্মদিনে অনুভূতি যেন এমন হয় যে, তিনি আমাদের মাঝে নেই অথচ যেন স্ব-শরীরে আমাদের মাঝে অবস্থান করছেন। ঐ যেন তিনি আসছেন সকলের সাথে সাক্ষাতের জন্য। ১৯৯১ সালের মার্চে লেখা এ গানটিতে সেই অনুভূতির প্রতিফলন ঘটেছে–

মানুষের কানে কানে বেজে ওঠে ঝংকার।
ঐ আসে ঐ সেই মহামানব এই বাংলার।।
দিলো যে মুক্তির ঘোষণা/মানুষ ছিল যাঁর ঠিকানা;
বাংলাকে ভালোবেসে, জন্মিল এদেশে–
শোনা যায় ধ্বনি সেই মহাত্মার।।
মানুষকে নিয়ে যে ভাবত/যাঁর ভাষণে সারাদেশ কাঁপত;
সেই বাঙালি জাতির মহান পিতা–
চুপি চুপি আসছে আবার।।

ঠিক একইভাবে ৭ই মার্চ প্রতিবছর যখন ফিরে ফিরে আমাদের মাঝে আসে তখন যেন মনে হয়, সোহারাওয়ার্দী উদ্যানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা তাঁর সেই অনলবর্ষী বজ্রকণ্ঠের, তেজোদীপ্ত ভাষণ উত্তাল জনসমুদ্রের মাঝে ঘোষণা করছেন। এখনো উপলব্ধিতে সেই চেতনা যেন কাজ করে। সেটি এ গানের কথায় ফুটে উঠেছে–

ঐ আসছে ঐ আসছে/ বাঙালি জাতির পিতা আসছে।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর–
যাঁর স্মৃতি আমাদের চেতনায় ভাসছে।।
খুলে দাও খুলে দাও/ বরণ দুয়ার আজি খুলে দাও।
মুক্ত মঞ্চে তাঁকে যেতে দাও।
ঐ শোনো কান পেতে বজ্রকণ্ঠধ্বনি–/ স্বাধীনতার ঘোষণা বাজছে।।
কথা শোনো– শোনো কথা–/আজ আর নেই কোনো ব্যাকুলতা।

এসেছে আমাদের মহান নেতা/ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি–
জনতার মঞ্চে ডাকছে।।

পৃথিবীর প্রতিটি দেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে একজন মহান নেতার অবদান রয়েছে। যাঁর নেতৃত্বে সে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মানচিত্র অর্জিত হয়েছে। বাঙালি জাতির ইতিহাসে স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ গানটিতে সে কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান–

একটি জাতির, একটি দেশের/ স্বপ্নদ্রষ্টা মুজিবুর।
বাংলার ইতিহাসে চিরকাল এই নাম/স্বর্ণাক্ষরে রবে ভাস্বর।।
যাঁর বজ্রকণ্ঠধ্বনি/ আকাশে-বাতাসে ওঠে রণি!
দিকে দিকে তার ওঠে ঝংকার/ কেঁপে ওঠে এ মাটির অন্তর।।
যাঁর স্বাধীনতার ঘোষণা/ জাগালো বাঙালির চেতনা।
ঝাঁপিয়ে পড়ল মুক্তির যুদ্ধে/ কাঁপিয়ে পথ-প্রান্তর।।

একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাঁর ডাকে এদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব অর্জন হলো। পরাধীনতা থেকে আমরা মুক্তি পেলাম। সেই জাতির কর্ণধার, জাতির পিতাকে নির্মমভাবে নিজের রক্ত ঝরাতে হলো! এ গানটিতে সে কথা ব্যক্ত হয়েছে–

রক্তঝরা পথে শুনি যার পদধ্বনি
বাঙালির নয়নমণি শেখ মুজিবুর রহমান।
বাংলার ঘরে ঘরে– বাঙালির অন্তরে–
চিরদিন রবে তুমি অম্লান।।
দেশের জন্যে জীবন দিয়েছ বলি
পিতৃহারা হয়ে কাঁদে বাঙালি।
তোমার স্বাধীন ভূমে/ কত ব্যথা আছে জমে–
পিতৃহারার শোক হয় না তো অবসান।।
বজ্র কণ্ঠধ্বনি পৃথিবী জুড়ে
মানুষের প্রাণে প্রাণে বাজে সুরে।
তোমার ত্যাগের স্মৃতি/ অবিরত হয় গীতি–
দিকে দিকে শত মুখে হয়ে ওঠে গান।।

নিজের বুকের রক্ত দিয়ে পৃথিবীর বহু দেশের নেতারা নিজের দেশকে ভালোবেসে গেছেন সত্য কিন্তু সে সকল দেশের নেতাদের থেকে জাতির পিতার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা। বঙ্গবন্ধুর মতো এত অনন্য সাধারণ ব্যক্তি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এজন্য তিনি অবিসংবাদিত নেতার খেতাবে ভূষিত হতে পেরেছেন। এ গানটিতে তাঁর সেই মহত্ত্বের জয়গান প্রকাশ পেয়েছে–

কত যে মহান বাঙালির প্রাণ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।।
হাজার স্বপ্ন ছিল তোমার চোখে
বুকের রক্ত দিয়ে ছবি এঁকে।
রেখে গেছ সে ছবি বাঙালির অন্তরে
বাংলার ঘরে ঘরে /হাজার বছর ধরে–
মনের মণিকোঠায় রবে চির-অম্লান।।
বজ্রকণ্ঠ ধ্বনি ইথারে ভাসে,
জেগে উঠি আমরা চেতনায় উচ্ছ্বাসে!
তোমার নামের ধ্বনি এই বাংলায়,
পৃথিবীর সীমানায়/ইতিহাসের পাতায়–
জ্বলজ্বল্ করে যেন মূর্ত স্লোগান।।

বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে বাংলার দেশপ্রেমিক মানুষেরা পিতার প্রশস্তি গেয়ে চলেছেন যুগ যুগ ধরে। তাঁর নামের স্লোগান উনিশ'শ পঁচাত্তর থেকে আজ অবধি মানুষের মনের তারে প্রাণের বীণায় বেজে চলেছে–

বাংলার গানে গানে/মানুষের প্রাণে প্রাণে
মিশে আছে প্রিয় নাম মুজিবুর;
টেকনাফ থেকে সুদূর তেঁতুলিয়া
সে নাম ধ্বনিত হয় বার বার।।
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
বাংলা মায়ের বীর সন্তান;
বজ্রকণ্ঠে তুমি গেয়েছিলে
স্বাধীনতার জয়গান।
বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আজো
তোমার নামের ওঠে ঝংকার।।
বুকের রক্তে লিখে গেছ তুমি
ইতিহাসে তব নাম;
সেই গৌরবগাথা বুকে নিয়ে
জন্মভূমি করে ছালাম।
আকাশে-বাতাসে মাটির গন্ধে–
তোমাকে হারানোর হাহাকার।।

পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেলেও ইতিহাস কখনো ধ্বংস হয় না। বাঙালি জাতির ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ইতিহাসও তদ্রূপ। তেমনি থাকবে পৃথিবীর ইতিহাসেও। এ গানটিতে সে কথা অবয়ব পেয়েছে–

স্বর্ণাক্ষরে লেখা রবে চিরকাল একটি নাম।
সে নাম আমার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নাম।।
পৃথিবীর ইতিহাসে অক্ষয় স্মৃতি হয়ে
মনের মণিকোঠায় শিল্পীর গীতি হয়ে।
কবির চিন্তায়–কবিতার ছন্দে;
শিল্পীর তুলিতে–শিশুর আনন্দে
প্রতিটি ঘরে ঘরে–মানুষের অন্তরে–
জেগে রবে একটি নাম।।
লেখকের লেখনীতে নতুন সৃষ্টি হয়ে
সুরের সিম্ফনীতে–গানের বাণী হয়ে।
কোকিলের কুহুতানে–ফুলের গন্ধে;
নদীর মাঝির গানে–নৃত্যের ছন্দে।
বিশ্ববাসীর প্রাণে–বাজবে গানে গানে–
বাংলার অগ্নি পুরুষের নাম।।

ঐতিহাসিক সাতই মার্চ দিনটি যখন আমাদের কাছে ফিরে আসে। তখন আমরা বঙ্গবন্ধুর বিগলিত কণ্ঠধ্বনিতে আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠি। তাঁর শূন্যতায় হৃদয়ে দুঃখ নেমে আসে। এ গানটিতে সে অনুভূতি রঞ্জিত হয়েছে–

বঙ্গবন্ধু আমার জাতির পিতারে
তুমি বিনে সোনার বাংলা/গুমড়ে গুমড়ে কাঁদেরে।।
তোমার বাংলায় তুমি আজকে নাই;
পিতা পিতা পিতা বলে কাঁদিছে সবাই!
তুমি পরাধীন দেশ করলে স্বাধীন/জাগালে বাঙালিরে।।
তোমার স্মৃতি আজো কথা কয়;
সাতই মার্চের ভাষণ বাজে সারাটা বাংলায়।
তুমি মরেও আজো আছ অমর/ বাংলা মায়ের অন্তরে।।

শুধু সাতই মার্চ নয়। পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের সেই দিন পনেরো আগস্ট প্রতিবছর আমরা শোকে মোহ্যমান হই। তখন তাঁর সকল স্মৃতির ভিতর আমরা তাঁকে খুঁজি। তাঁর স্বপ্নে দেখা সোনার বাংলার স্বপ্নের জাতি, বাঙালি জাতি। বাঙালি জাতির নাম পৃথিবীর ইতিহাসে তথা স্বদেশের আপামর মানুষের মনে জ্বলজ্বল্ করছে। অথচ তিনি নেই। তাইতো মনের কষ্টে গেয়ে উঠি–

বাংলা আছে–বাঙালি আছে/বঙ্গবন্ধু নাইরে বঙ্গবন্ধু নাই।
সে-যে মোদের জাতির পিতা/কোথায় গেলে তারে পাই।।
শোকের ছায়া সারা বাংলায়/পিতার শোকে কাঁদি!
আর কতকাল শূন্য বুকে/মনটা রাখব বাঁধি রে মন
মনটা রাখব বাঁধি।
চারিদিকে পিতৃহারার/হাহুতাশ যে শুনতে পাই।।
পিতার স্মৃতি চারিদিকে /স্মৃতি হয়ে ভাসে;
তাইতো সবাই শেখ মুজিবকে /দুঃখেও ভালোবাসে রে মন
দুঃখেও ভালোবাসে!
এদিন সবাই রাখব মনে/ভুলে যেন নাহি যাই।।

মনে সহসাই প্রশ্ন দেখা দেয়। জাতির পিতাকে সেইসব অবাঞ্ছিত শত্রুরা কেন হত্যা করেছিল? কী দোষ ছিল তাঁর? তিনিতো নিজেকে উজাড় করে দেশকে ভালোবেসে ছিলেন। তাঁর ভালোবাসার মধ্যে কোনো খাদ ছিল না। এ প্রশ্ন গানের ভাষায় ও সুরে প্রতিধ্বনি হয়েছে এভাবে–

হাজার প্রশ্ন জাগে মনের ভিতর/
কেন বঙ্গবন্ধুকে মেরেছিল?
জাতির পিতাকে মেরে স্বদেশি বর্গিরা/
দেশ ছেড়ে বিদেশে কেন পালালো?।।
দেশকে ভালোবেসে যে পিতা রাতদিন
থেকেছে কারাবাসে নির্দোষে বহুদিন।
পরাধীন জাতিকে মুক্ত করতে গিয়ে–
জীবনের বহু সময় যে হারালো।।
স্বাধীন দেশের সুখস্বপ্ন নিয়ে
বজ্রকণ্ঠ স্বরে ঘোষণা দিয়ে।
এনেছিল যে পিতা একটি স্বাধীন দেশ-
সে পিতার বুকের রক্ত কেন ঝরালো?।।

বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকী পনেরোই আগস্ট। বাঙালি জাতি এদিন শোকার্ত হয়ে ওঠে! পিতার বিয়োগাত্মক বেদনায় অশ্রুসিক্ত হয় আপামর বাঙালি আর তখনই লেখক লেখেন–

যায় ভেসে যায়–যায় ভেসে যায়
পিতার শোকে আজি/সোনার বাংলাদেশ
চোখের জলে ভেসে যায়।।
কাঁদে আজো বাঙালি স্বাধীন দেশে/
জাতির পিতাকে ভালোবেসে।
সে-তো আর ফিরে কভু আসবে না কখনো
মিছিল মিটিং আর জনসভায়।।
হাজার যুগের এক শ্রেষ্ঠ নেতা
ভুলবে না তাঁর কথা কোনো জনতা।
এ দেশ, জন্মভূমি মানচিত্র–
যতদিন বেঁচে রবে দুনিয়ায়।।

বাঙালি চেতনা ও মানসে বঙ্গবন্ধুকে হারানোর তীব্র কষাঘাত যেমন হাহুতাশে রূপ নেয়। আবার কখনো তা প্রশ্ন ও আলোচনার সীমান্তে লুটোপুটি খায়। বড়ো ব্যথায় কাতর আপামর বাঙালি জাতি সান্ত্বনার সুরে নিজের বিবেককে বোঝানোর চেষ্টা করেন এভাবে–

আমার বঙ্গবন্ধুরে /আমার জাতির পিতারে
এই জনমে আর কোনোদিন /পাবো না তোমারে।।
যাঁর ভাষণে বিশ্ব কাঁপল/ বাংলাদেশটা স্বাধীন হলো
ঘাতকেরা সেই পিতাকে/ কেড়ে নিল চিরতরে।।
জেল জুলুম আর নির্যাতন/ষড়যন্ত্র আর কারাবরণ
সহ্য করে সব অত্যাচার–/ছিলেন মাথা উঁচু করে।।
ঘরের কালসাপ দংশন করল/সপরিবারে তোমায় মারল।
হায়রে নিঠুর বিধি সবার/ভাসালো দুঃখ সাগরে।।

পিতাকে হত্যা করলেও মানুষের অন্তর থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলা যায়নি। পৃথিবীর হাজার দেশের ভিড়ে বঙ্গবন্ধুর নাম কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে ভেসে ওঠে। হত্যাকারীদের মানুষ চিরকাল ঘৃণার চোখে দেখবে আর পিতাকে বার বার শ্রদ্ধা জানাবে। এ গানে সেকথা ব্যক্ত হয়েছে–

মানুষের অন্তরে জেগে ওঠে যে নাম
সে নাম আমার জাতির পিতা।
হাজার দেশের ভিড়ে পাইনে খুঁজে কভু
জন্মেছে কোন দেশে এমন নেতা।।
যাঁর ভাষণে হলো দেশটা স্বাধীন
শত্রুরা চিরতরে হলো যে বিলীন!
স্বদেশি বর্গিরা করল হত্যা তাঁকে-
জাগালো সবার বুকে অবাক ব্যথা।।
তোমাকে এ বাংলায় হত্যা করেছে যারা;
চিরকাল জাতির কাছে ঘৃণিত রবে তারা!
করবে না মার্জনা পৃথিবীর কোনো জাতি–
ইতিহাসে লেখা রবে সকল কথা।।
এ মাটিকে ভালোবেসে বুকের রক্ত দিয়ে
এ মাটির বুকে তুমি আছো ঘুমিয়ে।
বাঙালির হৃদয়ে থাকবে চিরদিন–
তোমাকে শ্রদ্ধার আসন পাতা।।

পৃথিবীর বহু দেশে বহু নেতা জন্মগ্রহণ করেছেন। ডানপিটে, দুঃসাহসী, তেজস্বী, বলবান, কুশলী। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো এমন বজ্রকণ্ঠের অধিকারী নেতা দুনিয়ার আর কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন কি-না জানি না। তবে তিনি আমাদের বাঙালির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন- বাঙালি জাতির পিতা হয়ে। এটি সত্য। গানের ভাষায় সে কথাই বর্ণনা করা হয়েছে–

হাজার বছরের ইতিহাসে বলো/বজ্রকণ্ঠ ছিল কোন নেতার?
বিশ্ব নেতার ভিড়ে শুধু খুঁজে পাই/এমন কণ্ঠ ছিল জাতির পিতার।।
যাঁর ডাক শুনে জেগেছিল বাঙালি/মুক্তিযুদ্ধের মশাল হাতে;
ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শত্রুর বিরুদ্ধে/করেনি কুণ্ঠাবোধ জীবন দিতে।
সে পিতা মোদের কাছে চিরদিন শ্রদ্ধার।।
অসীম সাহস আর তেজ ছিল যাঁর/অন্তর ছিল যাঁর কুসুমকোমল;
উদার আকাশ সম ভালোবাসা আর/হৃদয় ছিল যাঁর দরদে বিমল।
এমন নেতা মানুষের কাছে নয়তো ভোলার।।

বঙ্গবন্ধুর মতো এমন আদর্শের নেতা বিশ্ব রাজনীতির পরিমণ্ডলে বিরল। তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও পৃথিবীর ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর মতো এমন আদর্শিক নেতাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ কারণে তিনি অবিসংবাদিত। পৃথিবীর বুকে বাংলার মাটিতে তিনি একাই জন্মেছেন–এ আদর্শের অধিকারী হয়ে। যা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। গীতের অবয়বে সে কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান–

এই বাংলার বুকে জন্মেছিলেন/ সে এক মহান নেতা।
ক্ষণজন্মা সেই পুরুষ হলো/ বাঙালি জাতির পিতা।।
হাজার বছরের ইতিহাসে দেখ/পাবে না খুঁজে কারো;
দ্বন্দ্ব-কলহ-প্রতিহিংসায়/যতই তর্ক করো।
সারা বিশ্বের ইতিহাসে আজ /বঙ্গবন্ধুর কথা।।
দিকে দিকে আজ কবিতা গানে/তাঁর কথা শুধু বাজে;
সেই সুর পুনঃ সুর হয়ে ফেরে/ বিশ্ব প্রাণের মাঝে।
জন্মদিনে মনে জাগে আজ/ তাঁকে হারানোর ব্যথা।।

বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মাঝে নেই সত্য, কিন্তু তাঁর মহানুভবতা আমাদের কাছে চিরজাগরুক। তাঁর অস্তিত্ব আমাদের চলার গতিকে সরব করে রেখেছে। তাঁকে যে নরাধম, দুর্বোধ, দুষ্কৃতিকারীরা হত্যা করেছিল, যে সব অবোধ কুসন্তানরা তাঁকে বাংলার মাটি থেকে সরিয়ে দিয়েছিল–তারা আজ কোথায়? গানে গানে সে কথা বলা হয়েছে–

কে বলেছে মোদের মাঝে/বঙ্গবন্ধু নাই?
বাংলার অগ্নিপুরুষ যিনি/চেতনায় দীপ্ত সূর্য তিনি
বাংলার আকাশে আমরা তাঁকে/ সদাই দেখতে পাই।।
তাঁর ঘোষণায় পেলাম মোরা/বাংলার স্বাধীনতা;
সাতই মার্চের বজ্রকণ্ঠ/ইতিহাসে হলো গাঁথা।
এমন বীর বাঙালি বিশ্বে/ আর তো কেহ নাই।।
সেই পিতাকে করল গুলি/নিঠুর ঘাতক সেনা;
বিশ্বের কাছে থুৎকার পেল/পাপের খাতায় দেনা।
পিতার শোকের অগ্নি-শিখা/ ছড়াল রোশনাই।।
পিতার স্মৃতি চারিদিকে আজ/আয়োজনে ভরপুর;
বাংলার কুসন্তান তোরা/রইলি কতদূর?
চিরদিন তোদের থুৎকার দেবে/বাঙালিরা সবাই।।

জন্মদিন, মৃত্যুদিন এলে পিতার একান্ত ভক্ত অনুরাগী-স্বজনদের মনে তাঁকে হারানোর অব্যক্ত বেদনা গুমড়ে ওঠে। তাই পিতৃহারা বাঙালিকে সান্ত্বনার সুরে লেখক লিখেছেন–

কেঁদো না কেঁদো না, কেউ কেঁদো না
স্বাধীন দেশে মোর পিতা বেঁচে নেই!

ঘাতকেরা চিরতরে নিয়েছে কেড়ে–
আর কোনোদিন ফিরে পাবো না পিতাকেই।।
যাঁর ডাকে হয়েছিল দেশটা স্বাধীন
বাঁচতে দিলো না তাঁরে শত্রুরা বেশিদিন।
নির্মম বুলেটে মারল যারা–
পৃথিবীর কোনো দেশে তাদের ক্ষমা নেই।।
বাংলাকে ভালোবেসে দিলো যে জীবন;
মরণকে যে বীর করল বরণ।
ভুলব না কখনো আমরা তাঁকে-
এসো প্রতিজ্ঞা করি সকলেই।।

সোনার বাংলা যতদিন আছে, বাঙালি জাতি যতদিন আছে, ততদিন বঙ্গবন্ধুর নাম থাকবে। তাঁর কোনো স্মৃতির পাতায় কোনো মলিন আঁচড় পড়বে না। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এ মাটিতে পিতার স্মৃতিকে লালন করবে বাঙালি জাতি। গীতিকবির গানের বাণী-বন্দনায় সে কথা রূপ পেয়েছে–

এ মাটির বুকে মোরা আছি যতকাল
তোমাকে ভালোবেসে যাব ততকাল।।
জাতির জনক তুমি এই বাংলার
অবকাশ নেই কোনো তোমাকে ভোলার।
তুমি যে চিরদিন স্মৃতি হয়ে থাকবে
মানুষের হৃদয়ে চেতনা হয়ে জাগবে–
অহরহ প্রতিক্ষণ সন্ধ্যা-সকাল।।
বাঙালি জাতিকে তুমি দিয়েছ যে মুক্তি;
পারবে না কেড়ে নিতে কোনো অপশক্তি!
নতুন প্রজন্ম উঠেছে জেগে আজ;
সবার কর্মে দেখি নতুন এক কারুকাজ–
গড়তে সোনার দেশ সবাই উচ্ছল।।

আর কোনো অপশক্তি কোনোদিন বাঙালি জাতির চেতনা থেকে জাতির পিতার নাম মুছতে পারবে না। কবি গানের সুরে সে কথার ঝংকার তুলেছেন–

বাংলার শত নদী যতদিন বয়ে যাবে
জাতির পিতা চির অমর হয়ে রবে–
সবার হৃদয়ে চিরকাল।
যতই আসুক বাধা ঝড়-বাদল।।
ঘরে ঘরে জেগে ওঠো অতন্দ্র প্রহরী/আগামীর মুক্তি সৈনিক;
পিতার স্বপ্ন দেখা সোনার বাংলাদেশ/এবার গড়ব মোরা ঠিক ঠিক।
বাংলা মায়ের যত আদর্শ সন্তান/কিশোর, যুবক আর ছাত্রদল।।
চারিদিকে উড়ে চলো মৌমাছি সৈনিক/নতুন এক প্রচ্ছদে গড়ব স্বদেশ;
স্বপ্নের বাগানে লাগাও নতুন চারা/গড়ে তোলো ডিজিটাল বাংলাদেশ।
বঙ্গ মায়ের যত দামাল ছেলে/জেগে ওঠো চঞ্চল-উচ্ছল।।

আজকের প্রজন্ম জানতে পেরেছে স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। তাঁর নির্দেশে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলার আপামর জনগণ। নয়মাস যুদ্ধ করে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল। তিনি আমাদের জাতির পিতা। তাইতো নতুন প্রজন্মের কণ্ঠে গানের সুরে ভেসে ওঠে–

বঙ্গবন্ধু জাতির জনক/বাঙালি জাতির পিতা।
তাঁর মতো কেউ নেই যে বিশ্বে/এমন মহান নেতা।।
তাঁর নির্দেশে যুদ্ধ হলো /দেশের মুক্তি আনতে;
কিশোর যুবক পড় সবাই /তাঁর ইতিহাস জানতে।
এ ইতিহাস চির অমর / নয় কখনো মিথ্যা।।
শ্রেষ্ঠ বাঙালি উপাধি তাই /জাতির পিতাকে দিলো;
জাতির পিতার ছবিটা এবার /সবার উপরে তোলো।
এ ছবি যে অমর ছবি/ নয় কখনো মিথ্যা।।

আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার মহানায়ক জাতির পিতা যে মাটিতে ঘুমিয়ে আছে, আমরা সে মাটিকে পূতপবিত্র রাখতে সর্বদা তৎপর। তাঁর আদর্শিক চেতনার কোনো অবমূল্যায়ন যেন না হয়, সে দিকে লক্ষ রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। গানটির অন্তরোক্তিতে সেটি প্রকট হয়ে উঠেছে–

গাও বাঙালি বাংলার গান/জেগে উঠুক ষোলো কোটি প্রাণ
যে মাটিতে ঘুমিয়ে আছে–
বাঙালি জাতির পিতা/শেখ মুজিবুর রহমান।।
চারিদিকে জেগেছে উচ্ছল আপামর;
মুজিবের বাংলায় চলবে না অনাচার;
দিকে দিকে সান্ত্রিরা হও সবে হুঁশিয়ার!
স্বাধীন দেশে আর সইব না মোরা/ জাতির পিতার অপমান।।
গড়ব এ দেশটা সোনার বাংলা করে
পিতার স্বপ্ন আছে এ মাটির অন্তরে;
ইতিহাস কথা বলে রক্তের ভিতরে।
পিতার আদর্শে জেগে ওঠো আপামর/আমরাই রাখব পিতার সম্মান।।

বহু ইতিহাস, বহু গান, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ লেখা হয়েছে। কিন্তু সকল লেখাকে, সকল সুরকে, সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করেছে জাতির পিতার নাম। তাঁর কর্মময় ইতিহাস, তাঁর ভাষণ, তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা। সকল সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে যেন তিনি নিজেই শ্রেষ্ঠ ইতিহাস, শ্রেষ্ঠ কবিতা, শ্রেষ্ঠ গানে পরিণত হয়েছেন। এখানে সে কথা গানের শব্দের প্রতিফলনে প্রকাশ পেয়েছে–

যত ইতিহাস হোক না লেখা/লেখা হোক অভিধান।
সবচেয়ে একটি শ্রেষ্ঠ ইতিহাস/শেখ মুজিবুর রহমান।।
যত ছবি হোক না আঁকা/হোক না লেখা গান;
সবচেয়ে একটি শ্রেষ্ঠ ছবি /শেখ মুজিবুর রহমান।।
যত কবিতাই হোক না লেখা/হোক না লেখা গান;
সবচেয়ে একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা/শেখ মুজিবুর রহমান।।
যত বাঙালিই হোক না কেন/ বেশি যাঁর অবদান;
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি/শেখ মুজিবুর রহমান।।

সকল অতীতকে ভুলে, সব বাধা অতিক্রম করে জাতির পিতার আদর্শের চেতনা মাথায় রেখে এগিয়ে চলেছে দেশ। আগামীর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন। আর সেই নতুন দেশের বাস্তবায়ন হবে নতুন প্রচ্ছদে, নতুন আল্পনায়। যা দেখে বিশ্ববাসী বাহবা জানাবে। দেশে থাকবে না ধর্ম-বর্ণ-সাম্প্রদায়িক কোনো প্রতিহিংসা। গানে গানে সে আহবান জানানো হয়েছে–

সব বাধা ঠেলে মোরা সামনে এগিয়ে যাব;
এবার নতুন রঙে আমরা নতুন হব–
গড়ব নতুন করে নতুন এক দেশ।
নাম হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ
বাংলাদেশ, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ।।
জাতির পিতার সেই স্বপ্নে দেখা
সোনার বাংলাদেশ হবে আঁকা;
নতুন এক প্রচ্ছদে-নতুন আল্পনায়-
গড়ব ছবির মতো সোনার এক দেশ
নাম হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ।।
ধর্ম বর্ণ জাতি নির্বিশেষে
গড়ব এ দেশটা মিলেমিশে;
থাকবে না ভেদাভেদ মানুষে মানুষে-
ছোট-বড়ো সকলের হবে এদেশ।
নাম হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ।।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে হাজার হাজার গান লিখলেও লেখার পরিসর ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। লেখার কোনো শেষ হবে না। আমাদের গীতি কবিরা তাই নিরলসভাবে লিখে চলেছেন। পৃথিবীর কোনো রাজনৈতিক নেতাকে নিয়ে কেউ এত গান লিখেছেন বলে মনে হয় না। সেদিক থেকে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা গান সবাইকে অতিক্রম করবে এবং এ সকল গান কালোত্তীর্ণ হবে। সে প্রত্যাশাই করি।

লেখক: কবি, গীতিকার ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

ক্রীড়াঙ্গনে বঙ্গবন্ধু পরিবার

শামসুজ্জামান শামস

বাঙালি জাতির মহানায়ক, বাংলার বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির শত শত বছরের পরাধীনতার গ্লানি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। তাই ছাত্রজীবন থেকেই বিদেশি শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন প্রতিবাদী। এই সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাঁর জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না, আরও শত শত বছর বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শিকল পরে মৃত্যুর যন্ত্রণায় দিন কাটাতে হতো। কেবল স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ নয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ এই বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় যেদিন শেখ মৌলবী লুৎফর রহমানের ঘর ও বেগম সাহেরা খাতুনের কোল আলো করে যে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সেদিন কেউ কি জানত যে এই শিশুই বাংলার ভাগ্যাহত দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মুক্তির দূতরূপে আবির্ভূত হবেন একদিন। ব্রিটিশ যুগে শৃঙ্খলিত বা পরাধীন বাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে জন্মগ্রহণ করেও পরবর্তীকালে এতদঞ্চলের বাঙালিদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির দিশারিরূপে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অভ্যুদয় ঘটেছিল জনগণের হয়ে অকুতোভয় আপোশহীনভাবে ও দৃঢ় প্রত্যয়ে লড়াই সংগ্রাম করে যাওয়ার কারণে। বঙ্গবন্ধুর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয় গ্রামের বিদ্যালয়ে। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন এক দীর্ঘাঙ্গী মানুষ। ছাত্রাবস্থায় তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলি প্রকাশিত হতে থাকে। শৈশব, কৈশোরেই তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে তৎকালীন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগদানের কারণে বঙ্গবন্ধু প্রথমবারের মতো গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন। এরপর থেকে শুরু হয় তাঁর বিপ্লবের জীবন। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করার পর তিনি কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। তাঁর শৈশব-বাল্য-কৈশোর-প্রথম যৌবনের লালন গ্রামীণ পরিমণ্ডলের ওই গোপালগঞ্জে। কৃষির আর নদীর বাংলায় ভিত তৈরি হয়েছিল শেখ মুজিবের। স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ক্রীড়াপ্রেমি। ক্রীড়া বিশ্বে বাংলাদেশ আজ আপন মহিমায় এগিয়ে চলছে। ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, দাবা, কাবাডি, গলফ, ভলিবল, জুডো, কারাতেসহ সব খেলাই বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদরা সাফল্য অর্জন করছে। ক্রিকেটে বাংলাদেশ ক্রিকেট পরাশক্তিদের মাটিতে নামিয়ে আনছে অনায়াসে।

স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তরুণ বয়সে অসাধারণ ফুটবল খেলতেন। চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে তিনি ঢাকায় মাঠ মাতিয়েছেন ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের হয়ে। দলের মূল একাদশের নির্ভরযোগ্য ফুটবলার ছিলেন তিনি। স্কুলজীবন থেকেই তিনি খেলার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে গড়ে উঠেছিল ফুটবল ও ভলিবল দল। শুরু থেকেই তিনি ছিলেন স্কুল দলের নিয়মিত সদস্য। ব্যক্তিগত পারফরমেন্সে অল্প দিনেই স্কুলের সেরা খেলোয়াড় হয়ে যান। ১৯৪০ সালের দিকে পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় ওয়ান্ডারার্স ক্লাবটি ছিল নেতৃস্থানীয়। ঢাকার মাঠে ক্লাবটির দাপট ছিল অপ্রতিহত। বঙ্গবন্ধু তখন মাঠে নামতেন ওয়ান্ডারার্সের একজন নিয়মিত ফুটবলার হিসেবে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দেখিয়ে দর্শকদের মন জয় করেন। তিনি হয়ে ওঠেন ওয়ান্ডারার্সের নির্ভরতার প্রতীক। একই সময় শেখ মুজিব ক্লাবটির সংগঠকের ভূমিকাও পালন করেন। কলকাতা চলে যাওয়ার পর খেলাধুলায় ছেদ পড়ে তাঁর।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে ফুটবলার ছিলেন বলে ক্রিকেটের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কমতি যে ছিল তা কিন্তু নয়। ক্রিকেটের প্রতি ছিল অগাধ ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার তাগিদে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড গঠন করেন, যা বর্তমানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড, বিসিবি নামে পরিচিত। দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, যা এখন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নামে পরিচিত। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এটি। এটি বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাধীন ৪৩টি ভিন্ন ভিন্ন খেলাধুলা বিষয়ক সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন সংক্ষেপে বাফুফে বাংলাদেশের ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা। বাফুফের যাত্রাও শুরু হয়েছে ১৯৭২ সালে। ক্রীড়াপ্রেমি বলেই সব খেলার প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুর্বলতা ছিল। ফুটবলের প্রতি জাতির পিতার দুর্বলতা একটু বেশি ছিল। কারণ নিজেও ওয়ান্ডারার্স ক্লাবে খেলেছেন। ভলিবল ও হকিও খেলেছেন তিনি।

১৯৭৪ সালে আবাহনীর খেলোয়াড়দের মাঝে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ কামাল

স্বাধীনতার পর দেশের ক্রীড়া উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর আন্তরিকতার কমতি ছিল না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপ্রেরণা আর আন্তরিক সহযোগিতায় স্বাধীন বাংলাদেশে ফুটবল মাঠে গড়ায় মাত্র দুমাসের ব্যবধানে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। তারকা ফুটবলারদের সমন্বয়ে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ একাদশ ও রাষ্ট্রপতি একাদশের মধ্যে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালের মে মাসে ঢাকায় খেলতে আসে ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম সেরা দল কলকাতা মোহনবাগান। প্রথম ম্যাচে কলকাতা মোহনবাগান ঢাকা মোহামেডানকে হারালেও পরের ম্যাচে হোঁচট খায় সফরকারীরা। দ্বিতীয় ম্যাচে মোহনবাগান ঢাকা একাদশের মোকাবিলা করে। খেলার আগে ঢাকা একাদশের খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করেছিলেন জাতির পিতা। ম্যাচের দিন প্রধান অতিথি হিসেবে মাঠে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের মনোবল চাঙা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে সেইদিন দুর্দান্ত এক জয় উপহার দিয়েছিলেন ফুটবলাররা। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে খেলতে আসে রাশিয়ার মিন্সক ডায়নামো

ক্লাব। ফুটবলপ্রেমি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছোটো ছেলে শেখ রাসেলকে নিয়ে ভিআইপি গ্যালারিতে বসে ঢাকা একাদশ এবং রাশিয়ার মিন্সক ডায়নামো ক্লাবের খেলা উপভোগ করেন। ১৯৭৫ সালে মালয়েশিয়ার মারদেকা ফুটবল টুর্নামেন্টে খেলতে গিয়েছিল ফুটবল দল। খেলোয়াড়দের উজ্জীবিত করতেই জাতির পিতা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় দলের বিদায়ক্ষণে গণভবনে ডেকেছিলেন। খেলাধুলার প্রতি ভালোবাসা না থাকলে এমনটি সম্ভব নয়। দলের সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় করে ছবিও তুলেছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান।

শেখ কামাল

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ কামাল ১৯৪৯ সালের ৫ই আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শেখ কামালকে বাংলাদেশের আধুনিক ফুটবলের পথিকৃৎ বলা হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত *আবাহনী ক্রীড়া চক্র* আজ দেশ-বিদেশে পরিচিত একটি ক্লাব। ক্লাব ভবন থেকে শুরু করে সব কিছুতেই শেখ কামাল আধুনিকতার নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। বিশেষ করে ফুটবল খেলায় তিনি শুধু বাংলাদেশ কেন, গোটা উপমহাদেশেই পশ্চিমা স্টাইলে বিপ্লব এনেছিলেন। ১৯৭৩ সালে আবাহনীর জন্য বিদেশি কোচ বিল হার্ট-কে এনে ফুটবল প্রেমিকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন! তখন ক্লাব তো দূরের কথা, এই উপমহাদেশে জাতীয় দলের কোনো বিদেশি কোচ ছিল না। ১৯৭৪ সালে আবাহনী যখন কলকাতার ঐতিহ্যবাহী 'আই এফ এ' শিল্ড টুর্নামেন্ট খেলতে যায়, তখন আবাহনীর বিদেশি কোচ আর পশ্চিমা বেশভূষা দেখে সেখানকার কর্মকর্তা আর সমর্থকদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। আজ উপমহাদেশে জাতীয় দল থেকে শুরু করে ক্লাব পর্যায়ে বিদেশি কোচের ছড়াছড়ি। অথচ শেখ কামাল তা করেছিলেন সেই ১৯৭৩ সালে। আজ শেখ কামাল বেঁচে থাকলে খেলাধুলা বিশেষ করে ফুটবলে এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দেশে পরিণত হতো বাংলাদেশ। আমাদের দেশের ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার মান উন্নয়নে শেখ কামাল অক্লান্ত শ্রম দিয়েছিলেন। ক্রীড়া জগতে তিনি রেখেছেন অপরিসীম অবদান। পাশাপাশি নতুন খেলোয়াড় তৈরি করার জন্য প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তুলেছিলেন। তারুণ্যের প্রতীক শেখ কামাল অনেক নাটকে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে একটি নাটক পশ্চিম বাংলার কলকাতায় মঞ্চস্থ হয়। এদিকে নাট্য অভিনয় ছাড়া তিনি ভালো সেতার বাদক ছিলেন। ছায়ানটে সেতার বাদন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বলিষ্ঠ সংগঠক শেখ কামাল বন্ধু শিল্পীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন স্পন্দন শিল্পীগোষ্ঠী।

ছোটোবেলা থেকেই শেখ কামাল ছিলেন প্রচণ্ড ক্রীড়ানুরাগী। শাহীন স্কুলে পড়ার সময় স্কুল একাদশে নিয়মিত ক্রিকেট, ফুটবল, বাস্কেটবল খেলতেন। আজাদ বয়েজ ক্লাবের হয়ে শেখ কামাল প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে নিয়মিত খেলেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ কামাল শুধু খেলোয়াড় হিসেবে নয়, ক্রীড়া সংগঠক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেন। বন্ধুদের নিয়ে ধানমন্ডির সাত মসজিদ এলাকায় গড়ে তোলেন 'আবাহনী ক্রীড়া চক্র'। শৈশব থেকে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবলসহ বিভিন্ন খেলাধুলায় প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল তাঁর।

সুলতানা কামাল

বাংলাদেশে আধুনিক ক্রীড়াঙ্গনের অগ্রদূত শেখ কামালের সঙ্গে ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্লু' দেশবরেণ্য অ্যাথলেট সুলতানা খুকুর বিয়ে হয়। সুলতানা খুকু শুধু একজন ভালো অ্যাথলেটই ছিলেন না, ছিলেন দক্ষ সংগঠকও। মেয়েরা যেন খেলাধুলায় মন ঢেলে দেয়, সে জন্য রীতিমতো কাউন্সিলিংও করতেন তিনি। ১৯৬৭ সালে মুসলিম গার্লস কলেজ থেকে এসএসসি পাস করেছিলেন সুলতানা খুকু। তার এক বছর আগেই জাতীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের লং জাম্পে রেকর্ড গড়ে স্বর্ণপদক জিতে তাক লাগিয়ে দেন তিনি। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান অলিম্পিক গেমসে লং জাম্পে নতুন রেকর্ড গড়ে চ্যাম্পিয়ন হন খুকু। ১৯৭০ সালে অল পাকিস্তান উইমেন্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে লং জাম্পে মেয়েদের মধ্যে সেরা হন তিনি। ১৯৭৩ সালে ১০০ মিটার হার্ডলসেও প্রথম জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন সদাহাস্য মেয়েটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাথলেটিক্সে প্রথম নারী ব্লু–খুকু। ১৯৭৩ সালে সুলতানা কামাল খুকু নিখিল ভারতে গ্রামীণ খেলাধুলায় অংশ নিতে গিয়েছিলেন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে। যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু সুলতানা কামালকে বলেছিলেন, বাঙালির মান রাখতে পারবি তো? খুকু এক কথায় উত্তর দিয়েছিলেন, পারব। কথা রাখতে পেরেছিলেন তিনি। পুরো ভারত থেকে আসা সেরা মেয়েদের পেছনে ফেলেন তিনি। পরে কোনো এক পুরস্কার বিতরণীতে বঙ্গবন্ধু হাসতে হাসতে খুকুকে বলেছিলেন, 'তুই তো আমার সবচেয়ে প্রিয়।' খুকু তখনো বঙ্গবন্ধুর পুত্রবধূ হননি।

ক্রীড়াবান্ধব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সম্প্রতি আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। আর এ সুবাদে ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার সুযোগ লাভ করেছে টাইগাররা।

শুধু ক্রিকেট নয়, ক্রীড়া বিশ্বে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে আপন মহিমায় জায়গা করে নিয়েছে। আর এ সবই সম্ভব হয়েছে একজন ক্রীড়াবান্ধব প্রধানমন্ত্রীর কারণে। স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জ্যেষ্ঠ সন্তান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ক্রীড়াবান্ধব প্রধানমন্ত্রী তা বহু বার প্রমাণিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শত ব্যস্ততার মধ্যে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের ৪টি ম্যাচের (তিনটি ওয়ানডে এবং একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ) মধ্যে তিনটি ম্যাচেই মাঠে উপস্থিত ছিলেন। ইন্দোনেশিয়া সফরে থাকায় পাকিস্তানের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডে ম্যাচটি মাঠে বসে দেখতে না পারলেও বিদেশের মাটিতে বসে টেলিভিশনে টাইগারদের ম্যাচ দেখেছেন। সেই কারণেই অনেকেই তাকে ক্রীড়াবান্ধব প্রধানমন্ত্রীর স্বীকৃতি দিয়েছেন। দেশবাসী টেলিভিশনে দেখেছে কখনো তামিম-মুশফিক-সৌম্য-সাব্বিদের চার-ছক্কায় আবার কখনো মাশরাফি-তাসকিন-রুবেল-সাকিব-সানিদের বোলিং-এ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন প্রধানমন্ত্রী। কখনো অনুপ্রাণিত করতে হাততালি দিয়েছেন। কখনো বিজয়ের মিছিলে যোগ দিয়েছেন জাতীয় গৌরবের লাল-সবুজের পতাকা হাতে। ক্রিকেট মাঠে তাঁর উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। টাইগাররা বিশ্বকাপের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের আগে গণভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ক্রিকেটারদের তাদের স্বাভাবিক খেলা খেলার কথা বলেছেন।

পাকিস্তানের বিপক্ষে স্মরণীয় বিজয় উদ্‌যাপনের শুভক্ষণেই প্রধানমন্ত্রী ক্রিকেটারদের সংবর্ধিত করেছেন। আইসিসি বিশ্বকাপ ২০১৫ আসরে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের চোখ ধাঁধানো সাফল্যের পাশাপাশি পাকিস্তান ক্রিকেট দলের বিপক্ষে ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জনের ভূয়সী প্রশংসা করে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলকে ২ কোটি টাকা পুরস্কার দিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাহলে ক্রিকেটের ভক্ত? প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এমনটি যারা ভাবছেন তারা ভুলের রাজ্যে বসবাস করছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব খেলারই ভক্ত। ফুটবলের টানে অনেকবার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ছুটে গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৮ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপের ফাইনালে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে হাই ভোল্টেজ ফাইনাল ম্যাচে শেষ মিনিটের গোলে বাংলাদেশ ৩-২ গোলে হেরে রার্নাসআপ হয়। মালয়েশিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের শুরুটা ভালো না হলেও বিরতির পর স্নায়ু চাপ কিছুটা কাটিয়ে ওঠে টপাটপ দুই গোল পরিশোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি বাংলাদেশ দল। শেষ মিনিটে মালয়েশিয়ার ফাইজাতের গোলে লাল-সবুজের প্রতিনিধিদের স্বপ্ন নসাৎ হয়ে যায়। ওই ম্যাচের ৬৫ মিনিটে মাঠে উপস্থিত হয়ে হাইভোল্টেজ ফাইনাল ম্যাচটি উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ম্যাচ শেষে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা মার্চ ২০১৭ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬'-এর ফাইনাল খেলা উপভোগ করেন –পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ফুটবলের অতীত ঐতিহ্য ফিরে আসতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের ফুটবল আবার জেগে উঠবে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি ভাবিনি বাংলাদেশ এ আসরের ফাইনালে উঠবে। তারা খুবই ভালো খেলেছে। ফাইনালে পরপর দুটি গোলও দিয়েছে। আমি অপেক্ষায় থাকলাম পরবর্তী টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হবে।'

তিনি আরও বলেছেন, এবারের আসর দিয়ে ফুটবল আবারো প্রাণ ফিরে পেয়েছে। গ্রামেগঞ্জে আবারো ফুটবল ছড়িয়ে পড়ুক, আমি সেটাই চাই। একদিন বাংলাদেশ ফুটবলের মধ্য দিয়ে বিশ্বজয় করবে, সে অপেক্ষায় থাকলাম।

কীভাবে খেলোয়াড়দের উদ্বুদ্ধ করতে হয় তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চেয়ে ভালো অন্য কেউ জানেন কি–না সন্দেহ! ২০১০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশীয় গেমসে বাংলাদেশ দল যাতে ভালো ফল করতে পারে, তার জন্য খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে এগিয়ে এসেছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণভবনে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ বহরের ৩০০ ওপরে খেলোয়াড়-কর্মকর্তার সঙ্গে কথাও বলেছেন। শুভেচ্ছা বিনিময়ের ফাঁকে হাস্যোজ্জ্বল প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে খেলোয়াড়রা পেয়েছিলেন এগিয়ে চলার প্রেরণা। এসএ গেমসে পদক জয়ের জন্য নিজেদের উজাড় করে দেওয়ার সবচেয়ে বড়ো যে মহৌষধ, সেই অর্থ পুরস্কারও এদিন ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

ওই দিন গণভবনে প্রধানমন্ত্রীকে মনে হলো তিনি যেন খেলোয়াড়দের বন্ধু। 'হারলেই সব শেষ নয়। খেলায় হার-জিত আছেই। তাই খেলোয়াড়দের ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। খারাপ করলে সমালোচনা করে লেখা হয়, এটা উচিত নয়। এতে খেলোয়াড়দের মন ভেঙে যায় এবং গেমস চলাকালীন তাদের হতাশ করা যাবে না।' পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের এক ফাঁকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিন। শচীনও তো ১ বলে আউট হয়।'

এসএ গেমসে ক্রীড়াবিদদের মধ্যে ক্রীড়া স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে যারা সোনা-রুপা-ব্রোঞ্জ জিতবে তাদের জন্য ৫ লাখ, ২ লাখ ও ৫০ হাজার টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করেন। এছাড়া ফুটবল, ক্রিকেট, হকি দলের জন্য ১৫ লাখ, ১০ লাখ ও ৩ লাখ পুরস্কার ঘোষণা করেন। কাবাডি, ভলিবল, বাস্কেটবলসহ অন্যসব দলগত খেলায় পুরস্কারের অঙ্কটা ছিল ১০ লাখ, ৪ লাখ, দেড় লাখ টাকা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া এই ঘোষণা বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। কোনো সরকারপ্রধান এভাবে গেমসের আগে পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন বলে শোনা যায়নি। পুরস্কারের কথা শুনে খেলোয়াড়রাতো মহাখুশি। খেলোয়াড়দের খুশিতে ২০১০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত একাদশ এসএ গেমসে ১৮টি স্বর্ণ, ২৩টি রৌপ্য, ৫৬টি ব্রোঞ্জসহ ৯৭টি পদক জিতে আট জাতির শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে বাংলাদেশ তৃতীয় হয়েছিল। বাংলাদেশের ১৮টি স্বর্ণের ৪টি কারাতে, তিনটি শুটিংয়ে, উশু, বক্সিং, তায়কায়ন্দো এবং গলফে দুটি করে, ফুটবল, ক্রিকেট ও ভারোত্তোলনে এসেছে একটি করে স্বর্ণ।

ক্রীড়াঙ্গনে শেখ জামাল-শেখ রাসেল

স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামাল ১৯৫৪ সালের ২৮শে এপ্রিল গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শেখ জামালের স্মৃতিকে জাগরূক রাখার জন্য ২০১০ সালে একঝাঁক তারকা ফুটবলার নিয়ে ঘরোয়া ফুটবলে আত্মপ্রকাশ করে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব লিমিটেড। ২০১০–১১ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জয় করে হলুদ-নীল জার্সিধারীরা। মাঝে দুটি ফেডারেশন কাপ শিরোপা জিতেছে ক্লাবটি। গত মৌসুমে দুরন্ত ফুটবল খেলে প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় শিরোপা ঘরে তুলেছে তারা। ২০১১ সালে নেপালে অনুষ্ঠিত পোখরা কাপ জিতেই অভিষেকটা রঙিন করে রেখেছে শেখ জামাল। আইএফ শিল্ডে দুরন্ত ফুটবল নৈপুণ্য প্রদর্শন করে কলকাতার ফুটবল সমর্থকদের মন জয় করে বাংলাদেশের জনপ্রিয় ক্লাবটি। ফাইনালে কলকাতা মোহামেডানের বিপক্ষে টাইব্রেকারে হারলেও খেলেছে দারুণ। শিরোপা জয়ের বাসনা নিয়ে ভুটানে গিয়েছিল শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব লিমিটেড। কিংস কাপে প্রতিবেশী ভুটান, ভারত ও নেপালের তিন ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে শেখ জামাল। শিরোপা নির্ধারণী লড়াইয়ে ভারতের অন্যতম শক্তিধর পুনে এফসিকে ১-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব লিমিটেড।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের স্মৃতিকে অম্লান রাখার জন্য ক্রীড়াঙ্গনে শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলের সবচেয়ে জনপ্রিয় আসর হচ্ছে প্রিমিয়ার ফুটবল লিগ। এই প্রিমিয়ার লিগের জনপ্রিয় এক ক্লাব হচ্ছে শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র। ২০১২–১৩ মৌসুমে ঘরোয়া ফুটবলে ট্রেবল জয়ী শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র ২০১৪ সালে কলম্বোয় অনুষ্ঠিত এএফসি প্রেসিডেন্ট কাপের বাছাই পর্বে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

ছেলেটির নাম রাখে শেখ মুজিব

আখতারুল ইসলাম

আকাশের সূর্যটা খুব ঝলমলে, রোদ্দুর লুটোপুটি খায় জারুল গাছের পাতায় পাতায়। চারদিকে জুঁই-চামেলির ঘ্রাণে মোহিত মন। মোহিত মন শুধু আনচান করছে কিসের যেন একটা শঙ্কা। উৎকণ্ঠায় বুকের ভেতর অন্যরকম এক অনুভূতি কাজ করছে কামাল সাহেবের। বাড়িতে এসেছেন তিন দিনের ছুটি নিয়ে। সরকারি চাকুরে, ঘর-পরিবারে তেমন সময় দিতে পারেন না। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিনি। উপজেলার সরকারি সব কাজ তার কাঁধের ওপর। এমন কাজ হলেও তার মাঝে তেমন কোনো বিরক্তি নেই। স্বাচ্ছন্দ্যে কাজগুলো সারেন। কোনো কোনো দিন বাসায় ফিরতে রাত ৯টা এমনকি ১০টা পর্যন্ত হয়। স্ত্রী অনিতার চেহারাটা তার ঠিকমতো দেখা হয় না।

চেহারা না দেখলেও এমন অবস্থায় যা যা করণীয় তার খোঁজখবর রাখতে চেষ্টা করেছেন সর্বক্ষণ। ছুটি নেওয়াও না পারতে। কারণ সন্তান সম্ভবা স্ত্রী। ডেলিভারির সময় আজ বা কাল।

একদিকে পরিবার-পরিজন হলেও অন্যদিকে দেশ সবার ঊর্ধ্বে। দেশকে প্রচণ্ড ভালোবাসেন কামাল সাহেব। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পাকবাহিনী ও পাকিস্তানি দোসর আল-বদর বাহিনীর হাতে বাবার মৃত্যু। নিজের চোখের সামনে তার বাবাকে চোখ বেঁধে নিয়ে গেলে, আর দেখেনি বাবার প্রিয় মুখ। বাবার দোষ ছিল– বাবা একজন শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। দেশকে মেধাশূন্য করতে এ কুচক্রান্তের কারণে প্রাণ দিতে হলো তার বাবাকে। ভুলতে পারেনি কামাল সাহেব বাবার কথা। কিন্তু নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করেন। কারণ তিনি শহিদ বুদ্ধিজীবী পিতার সন্তান। সেজন্য সবার উপরে তার দেশ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বিসিএস-এর মাধ্যমে সরকারি ক্যাডার সার্ভিসে চাকরি। চাকরি জীবনে কোনোদিন অন্যায়, অসৎ ও মিথ্যার আশ্রয় নেননি। দুর্নীতির সাথে কোনো আপোশ করেননি। পুরো উপজেলা ও জেলায় তার সুনাম রয়েছে। সরকারি চাকরি করার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিগত কাজ বা সুবিধা ভোগ করেননি।

আজ বাসায় আসতে কাজগুলো বুঝিয়ে দিয়ে আসলেও রাজ্যের যত চিন্তা মাথায় কিলবিল করছে। ভাবনার শেষ নেই। অবচেতন মনে হাসপাতালের বেলকনিতে দাঁড়িয়ে।

স্ত্রী ওপারেশন থিয়েটারে। কী খবর আসে সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই তার। একমাত্র বোন শায়লা এসে বলল, ভাইয়া, এমন কোনো খবর পাচ্ছি না। ব্যথা উঠেছে প্রায় ১১ ঘণ্টা শেষ। ডাক্তার বলেছে ১২ ঘণ্টা পার হয়ে গেলে সিজার করতে হবে।

কামাল সাহেব সিজারের কথা শুনে ভয়ে অজানা এক আশঙ্কায় আঁতকে উঠেন।

–কী বলিস শায়লা?

–হ্যাঁ ভাইয়া, আল্লাহ আল্লাহ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। বোনের কথায় আল্লাহকে ডাকেন, হে আল্লাহ দয়া কর। শোন ভাইয়া, আমি যাচ্ছি।

শায়লা?

–হ্যাঁ ভাইয়া।

–আমি আছি, কিছু লাগলে, কী অবস্থা আমাকে জানাবি।–

–ঠিক আছে বলে শায়লা ভেতরে ঢুকে।

আবার কামাল সাহেবের মনে সব চিন্তা ভর করে। কী হবে, জীবনেতো কখনো কারো কোনো ক্ষতি করেননি, উপকার করতে না পারলেও ক্ষতি হোক তা চাননি। নিজের এই বিপদের সময় আল্লাহকে ডাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

হঠাৎ দরজা ফাঁক করে বোন শায়লা বের হয়।

–ভাইয়া।

–কী খবর?

–শোন, তোর ফুটফুটে ছেলে হয়েছে। মাশাআল্লাহ।

–আলহামদুলিল্লাহ।

ধন্যবাদ হে সৃষ্টিকর্তা।

– শোন, আত্মীয়স্বজন সবাইকে খবর দিস।

– ঠিক আছে, তুই দেখ।

– শায়লা পুনরায় ভেতরে গেল

সবাই খবর শুনে দলে দলে ছুটে আসছে।

এবার শায়লা কোলে নিয়ে কামাল সাহেবকে ছেলে দেখাতে আনে।

–ভাইয়া আজান দে, নাম রাখ।

কোলে নিয়ে ছেলেকে আজান শেষে নাম দেন শেখ মুজিবুর রহমান।

আত্মীয়স্বজন সবাই তো হা।

কেউ তো স্বপ্নেও কল্পনা করেনি কামাল সাহেব এমন একটা নাম রাখবেন।

শায়লা বলল, ভাইয়া!

– শোন, পৃথিবীতে এর চেয়ে বড়ো নেতা, বড়ো দেশপ্রেমিক, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গকারী এমন আমি আর দেখিনি। আমার ছেলের নাম হবে শেখ মুজিব। আমি চাই ও বড়ো হয়ে শেখ মুজিবের মতো আদর্শবান, মহৎ, সৎ, যোগ্য দেশপ্রেমিক হবে। যে মানুষটি সারাজীবন দেশকে ভালোবেসে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

আমার ছেলের নাম শেখ মুজিব।

– আমি চাই সবাই এই নামকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে ডাকবে।

কামাল সাহেবের যুক্তিতে আর কেউ কথা বলার সাহস করেনি।

লেখক: সাহিত্যিক

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ

নজমুল হেলাল

এখন মুজিব নেই কে বলে
ওই দ্যাখো পতাকায়
ধর্ষিত মা-বোন শহিদের রক্তে লেখা
স্বাধীন এ বাংলায়!

কতখানি ত্যাগ সফল হলে
একটি মুজিব হয়
কতখানি প্রেম অমর হলে
এক সুরে কথা কয়!

এক নেতা এক দেশ হলো
শোষণের ঘায়ে ঘায়ে
বৈষম্যের বিশাল দেয়াল
ভেঙে ভেঙে পায়ে পায়ে !

মাটি ও মানুষ এক না হলে
হয় নাকো এক নেতা
কথায় ও কাজে এক না হলে
মানুষ পায় যে ব্যথা!

জাতির ব্যথা ও বেদনা বুঝেই
মুজিব নেতা যে মহান
নিরাময়ে ছিল তাঁরই কাজ কথা
নিপীড়িত জনতার জয়গান!

কোথায় পাব এমন নেতা
আঁধার রাতের আলো
মুজিব প্রদীপ লুকিয়ে না রেখে
ঘরে ঘরে আজ জ্বালো!

আঁধার ঘুচাবে বাধার প্রাচীর
ভেঙে হবে চৌচির,
কোথায় পালাবে জঙ্গি-মঙ্গি
দুর্নীতিবাজ হয়ে যাবে স্থির!

মহান মুজিব বঙ্গবন্ধু
স্বাধীন আমাদের বাংলাদেশ
একুশের চেতনা ত্যাগের বিজয়
ভোগবাদীদের শুধু ক্লেশ!

বেদনাবিধুর আগস্ট

ম. মীজানুর রহমান

আমাদের হৃদয়ে রয়েছ অমর হে পিতা!
বাংলাদেশ জেগে আছে রাত্রিদিন
সূর্যসম সোনালি কনক!
চির ঘৃণ্য ঘাতকেরা হয়েছে বিলীন।
আজ বাংলাদেশের সবুজ পতাকায়
জ্বলছে সূর্য লাল!
তুমি আছ বলে জেগে আছে বাংলার মানুষ।
দুস্তর পাথারে সংগ্রামীজনে পাড়ি দেয় নিষ্কলুষ!
তাদেরই অকুণ্ঠ সংগ্রামে ঝলকায়
সমগ্র দিক্-চক্রবাল।
এই দিন, এই রাত যায় চলে যায় আপন ইচ্ছায়;
সময় থাকে না বসে কোনো মহাজনের অপেক্ষায় !
তবু দিনের কথা জানে রাত, রাতের কথা দিন।
কপট মিথ্যে কলঙ্কিত, সত্য থেকে যায় অমলিন!
ব্যথা দিলে ব্যথা পেতে হয়,
জেনে যাক সারা দেশের মানুষ!
এমন বেদনার কোনো শেষ নেই,
হে মানুষ, হইও না অজ্ঞ, হইও না বেহুঁশ!

বঙ্গবন্ধু মরে নাই

বাতেন বাহার

নরাধম বলে বঙ্গবন্ধু মরে গেছে বহু আগে
যে কথা আমার বিশ্বাসী বুকে তীরের মতো লাগে।
গুণীদের মতে এই মন বলে 'বন্ধু মরে নাই'
মরে নাই বলে এই মনে আমি স্বাধীনতা খুঁজে পাই।
জাতির পিতা মরে নাই বলে– পাখিরা আগের মতো
নিশীথের শেষে সূর্যের ঘুম ভাঙায় অবিরত।
বঙ্গবন্ধুর বজ্র ভাষণে জোনাকিরা নেভে-জ্বলে
বটের ছায়ায় বাঁশের বাঁশরি মাটি-মা'র কথা বলে।

বঙ্গবন্ধু মরে নাই বলে পাখিরা আজও গায়
রুপালি ইলিশ জেলেদের জালে নিশিদিন ঝলকায়।
আবেদা বৈশাখের রুদ্রমূর্তি শ্রাবণে অঝোর ধারা
শরতের মেঘে পরীদের হাসি,অঘ্রাণে জাগে পাড়া।
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি, পৌষ-পার্বণ মেলা
কোকিলের ঠোঁটে সুমধুর গান-ফাগুনে আগুন খেলা।
আগুন খেলায় বঙ্গবন্ধু– আছে মাটির গন্ধে
ভাবুক কবির বিশ্বাসে আছে– আছে ছড়ার ছন্দে।

বিপ্লবী এক ধ্বনি

নাহার আহমেদ

জয় বাংলা ধ্বনিতে যে
শক্তি লুকিয়ে আছে,
সেই শক্তি বাঙালি জাতি
পেয়েছিল তাঁর কাছে।
উঠল কেঁপে বাংলাদেশ
বজ্রকঠিন হুংকারে।
উদ্ধত সেই তর্জনী তাঁর
ভরা ছিল ক্ষুরধারে
রক্তে জাগে প্রলয় দোলা
সংগ্রামী চেতনায়
এ মাটি করব মুক্ত স্বাধীন
নতুন ঐ পতাকায়।
শোনেনি পৃথিবী কখনো এমন
ঐতিহাসিক ভাষণ
বাঙালি দিয়েছে প্রাণের নেতাকে
জাতির পিতার আসন।
লাখো বাঙালির আত্মত্যাগের
ফসল বাংলাদেশ,
জীবন দিয়ে এ মাটির ঋণ
কখনো হবে না শেষ।

পিতা তোমাকেই মনে পড়ে

আব্দুস ছবুর মিঞা

পিতা তোমাকেই ভীষণ মনে পড়ে, মনে পড়ে প্রতিটি ক্ষণে
তুমি নেই বিশ্বাস হয় না, মানতে চায় না মন।
তুমি মিশে আছ আমার অস্তিত্বে
কাদা-জল-মাটিতে, জড়িয়ে আছ চেতনা জুড়ে
অসহায় বঞ্চিত মানুষের মাঝে, আপামর জনতার মাঝে
জানো, তোমার ছবি মিশে আছে, রক্তার্জিত পতাকায় আমার স্বাধীনতায়।
পিতা তুমিই আমার স্বাধীনতা, আমার আত্মমহিমার বিশ্বাস
তোমাকেই ঘিরে বসবাস করে, আমার মৃত্যুহীন শান্তির আকাঙ্ক্ষা।
তুমি যে আছ চির সুন্দর অম্লান, যেন অন্ধকার ভেদ করা আলো
তুমি বঞ্চিত মানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, মুক্ত করার হিরন্ময় হাতিয়ার
তাইতো চির স্বাধীনতায় স্বপ্নসাধের সৌধে
গর্বের কেতন ওড়াই, শুধু তোমাকেই ভালোবেসে।

নিবন্ধ

১৫ই আগস্ট মহাকালের সাক্ষী

সাদত আল মাহমুদ

বাংলার সোনার মাটিতে একাধিক সোনার ছেলের জন্ম হয়েছে। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানীসহ অসংখ্য সোনার মানুষের জন্ম হয়েছিল এই সোনার বাংলায়। এ সকল সোনার মানুষেরা হয়ত ইতিহাসের পাতায় নিজেদের নাম দীর্ঘ সময়ের জন্য দখলে রাখবে। অবশ্য এটা তাঁরা তাঁদের যোগ্যতার বলেই করবে। কিন্তু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তকমাটি শোভা পাবে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ললাটে। হ্যাঁ, এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথাই বলা হচ্ছে। তিনিই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ার এক মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর থেকেই কিশোর মুজিবুরের চিন্তা-চেতনার মধ্যে গভীর নেতৃত্বের ভাব ফুটে ওঠে। তার প্রতিটি কাজে, চলনে-বলনে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রবণতা সবার নজরে আসে। পরের ইতিহাস সকলের জানা। ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ দাঙ্গার সময়ে ইসলামিয়া কলেজের অর্থনীতির শিক্ষক ভবতোষ দত্তকে যে কজন ছাত্র মুসলমান এলাকা পার করে হিন্দু অঞ্চলের সীমান্তে পৌঁছে দেন, তাদের দলনেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। এই ঘটনাই প্রমাণ করে, তিনি দলনেতা হিসেবে কতটা পারদর্শী ছিলেন।

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের পটভূমি ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস থেকেই। ১৯৪৮ সালে কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করলে বাঙালি জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৫২ সালে এই চিত্র চরম আকার ধারণ করে। ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। যখনই পূর্ব পাকিস্তানের কোনো নেতা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতেন, তখনই যে কোনো অজুহাতে তাদেরকে পদচ্যুত করা হতো। এক পর্যায়ে নানা অজুহাতে জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের শাসন-ক্ষমতা দখল করে দীর্ঘ ১১ বছর স্বৈরশাসন চালু রাখেন। এরপর শুরু হয় ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭০-এর নির্বাচন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে ৩১৩টি আসনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৬৯টি আসন লাভ করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো শেখ মুজিবুর রহমানের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিরোধিতা করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ পূর্ব নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন কোনো কারণ ছাড়াই ১৯৭১ সালের পহেলা মার্চ বাতিল করেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করায় তীব্র প্রতিবাদে ঢাকা পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের শাসকচক্রের চালাকি বুঝতে পেরে ৭ই মার্চ রেসকোর্সের (সোহ্‌রাওয়ার্দীর) বিশাল ময়দানে সমাবেশ ডাকেন। বিপুল লোকের সমাবেশে সকলকেই তিনি ইঙ্গিত দেন যে, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়ে সকলেই বুঝে নেয়, দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য সবাইকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান করছেন।

এরপর পাকিস্তানি শাসক দল ২৫শে মার্চ রাতেই ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে অপারেশন সার্চলাইট চালায়। এই অপারেশন সার্চলাইটে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর তাণ্ডবলীলায় ঐদিন রাতেই ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে। সবচেয়ে বেশি হত্যাযজ্ঞ চলে ঢাকা শহরে। ঐদিন রাতেই পাকিস্তানি হায়েনাদের নিষ্ঠুর আক্রমণে ঢাকাতেই মারা যায় কয়েক হাজার বাঙালি নরনারী। ঐদিন রাত ১২টার পরই বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। স্বাধীনতা ঘোষণা করার কয়েক ঘণ্টা পর পাক সেনাদের হাতে বঙ্গবন্ধু বন্দি হন। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে দুদিন রাখার পর বঙ্গবন্ধুকে করাচি কারাগারে নিয়ে বন্দি করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাকিস্তানিরা পরাজিত হয়ে রেসকোর্স ময়দানে ৯৩ হাজার পাকিস্তান আর্মিসহ জেনারেল নিয়াজী মিত্রবাহিনীর কমাণ্ডার জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এরপর পাকিস্তান শাসক দল বহিঃবিশ্বের চাপের কাছে মাথা নত করে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেন। ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ সকাল ৮টা বেজে ১০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে বহন করা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কমেট বিমানে করে অবতরণ করেন। ঐদিন কলকাতার জনসভা স্থগিত করে বিকেলেই বঙ্গবন্ধু ঢাকায় পৌঁছেন। প্রাণের নেতাকে বরণ করার জন্য আগে থেকেই লক্ষ লক্ষ বাঙালি অপেক্ষারত অবস্থায় ছিলেন। অবশেষে বঙ্গবন্ধু জন্মভূমির মাটিতে নেমে আসলে সকলের জমানো ভালোবাসায় সিক্ত হলেন। এরপর তিনি বাংলাদেশের শাসনভার নিজের কাঁধে তুলে নিলেন।

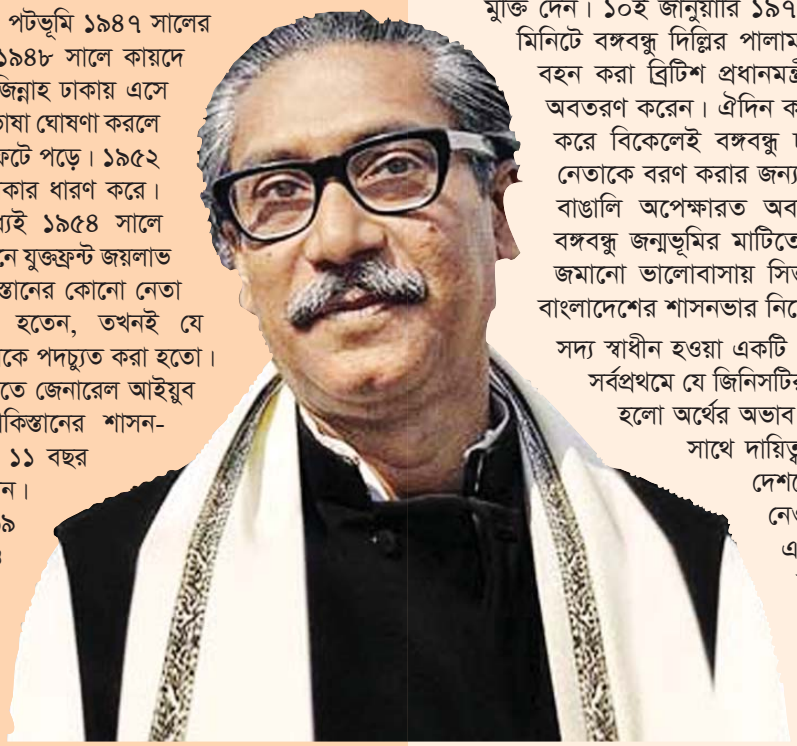

সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশ, যুদ্ধবিধ্বস্ত এ দেশে সর্বপ্রথমে যে জিনিসটির অভাব চোখে পড়ে সেটি হলো অর্থের অভাব। এরপরও বঙ্গবন্ধু নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এত স্বল্পতার মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে হাঁটি হাঁটি পা পা করে দেশটি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধু এক এক করে ১৯৭২, ৭৩,

১৫ই আগস্ট ১৯৭৫-এর শহিদগণ

বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব

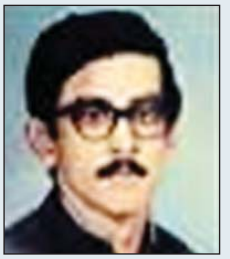
শেখ কামাল

শেখ জামাল

শেখ রাসেল

সুলতানা কামাল

পারভীন জামাল রোজী

শেখ আবু নাসের

আবদুর রব সেরনিয়াবাত

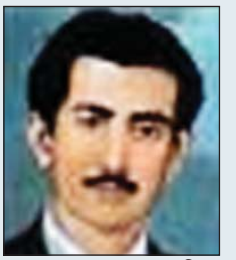
শেখ ফজলুল হক মণি

বেগম আরজু মণি

শহীদ সেরনিয়াবাত

বেবি সেরনিয়াবাত

সুকান্ত আবদুল্লাহ

আরিফ সেরনিয়াবাত

কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ

আবদুল নঈম খান রিন্টু

৭৪ সফলতার সাথে পার করে ১৯৭৫- এর মধ্য আগস্ট পর্যন্ত চলে আসে। হঠাৎ কী হলো! ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোররাতে বিপথগামী কিছু সেনা সদস্য বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে আক্রমণ চালায়। এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর মিলিটারি সেক্রেটারি কর্নেল জামিল উদ্দিনকে ফোনে বলেন, জামিল তুমি তাড়াতাড়ি আসো। আর্মির লোক আমার বাসা অ্যাটাক করেছে। সফিউল্ল্যাহকে ফোর্স পাঠাতে বলো। বঙ্গবন্ধু সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্ল্যাহকেও ফোন করে বলেন, সফিউল্ল্যাহ, তোমার ফোর্স আমার বাড়ি অ্যাটাক করেছে। কামালকে (শেখ কামাল) বোধ হয় মেরে ফেলেছে। তুমি জলদি ফোর্স পাঠাও। এর কিছুক্ষণ পরই বঙ্গবন্ধু শহিদ হন।

বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ মুজিব ফোন করার পর বন্ধ দরজা খুলে বাইরে আসেন। মেজর এ কে এম মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে কয়েকজন সেনা সদস্য ঘিরে ধরে তাঁকে। তারা বঙ্গবন্ধুকে নিচে নিয়ে যেতে থাকে। সিঁড়ির বারান্দায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ঘাতকদের তর্কবিতর্ক হয়। মেজর মহিউদ্দিনকে বঙ্গবন্ধু চড়া স্বরে ধমক দিয়ে এসবের কারণ জানতে চান। বঙ্গবন্ধুর মতো ব্যক্তিত্বের এ প্রশ্নের মুখে মহিউদ্দিন ঘাবড়িয়ে যায়। সে দুর্বল কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে নিয়ে যেতে চায়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বঙ্গবন্ধু স্বাভাবিক কণ্ঠে ঘাতকদেরকে প্রশ্ন করেন– তোরা কি চাস? কোথায় নিয়ে যাবি আমাকে? কী করবি? বেয়াদবি করছস কেন? বলতে বলতে সিঁড়ির কয়েক ধাপ নামতেই নিচের দিক থেকে ৭-৮ ফুট দূরে অবস্থানকারী দুই ঘৃণিত ঘাতকের স্টেনগান থেকে বেরিয়ে আসে ১৮টি তাজা বুলেট। সিঁড়ির ধাপে গড়িয়ে পড়েন বঙ্গবন্ধু। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে চলে সিঁড়ি বেয়ে। ঐদিন ঘাতকেরা বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে হত্যার সূচনা করে। এরপর এক এক করে শেখ কামাল, শেখ জামাল, বেগম মুজিব এবং সবশেষে ৭/৮ বছরের ছোট্ট রাসেলকেও হত্যা করে।

ঐদিন ভাগ্যক্রমে বঙ্গবন্ধুর দুই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা প্রবাসে থাকার কারণে প্রাণে বেঁচে যান। আল্লাহর কাছে হাজারবার শুকরিয়া জানাচ্ছি, ঐদিন তাঁরা দুজন দেশের বাইরে অবস্থান করছিলেন। ঐদিন দেশের বাইরে থাকার কারণে আজ আমরা দেশবরেণ্য গণতন্ত্রের মানসকন্যা প্রাণপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পেয়েছি। জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় প্রায় ৭৭ বার গ্রেফতার হয়ে দীর্ঘ বারো বছর মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য জেল খেটেছেন। ৫৫ বছরের জীবনের বেশিরভাগ সময়ই তিনি অনেক কষ্ট-যন্ত্রণা, অভাব-অনটনের মধ্যে কাটিয়েছেন। এতকিছুর পর যখন তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন করলেন, তখন দেশের মানুষের সেবা করার মধ্য দিয়ে একটু স্বস্তির নিশ্বাস নেওয়ার আশায় দেশের শাসনভারের দায়িত্ব কাঁধে নিলেন। কিন্তু চার বছর না যেতেই বিপথগামী কিছু সেনা সদস্যের বুলেটের আঘাতে বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন। দীর্ঘদিন জেল-জুলুম-নির্যাতন-অত্যাচারের বিনিময়ে দেশকে স্বাধীন করলেন বঙ্গবন্ধু। এর পুরস্কার কি বুলেটের আক্রমণে বঙ্গবন্ধুর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া! এর পুরস্কার বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সকলকে হত্যা করা ! কিন্তু কেন? কী দোষ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার ! এই প্রশ্ন এই জাতির কাছে। ১৫ই আগস্টের সেই ভয়াল কালো রাত্রি শুধু ইতিহাসের সাক্ষী নয়, এই রাত মহাকালেরও সাক্ষী হয়ে থাকবে সারাজীবন।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী ও নাট্যকার।

গবেষণা নিবন্ধ

বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ

সৌম্য সালেক

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি এবং বাঙালি জাতির এক অবিসংবাদিত নেতা। বাঙালির অধিকার এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তিনি রেখেছেন অসামান্য অবদান। এদেশের সাধারণ মানুষের অধিকার, আকাঙ্ক্ষা পূরণের সংগ্রামে তিনি জাতিকে নেতৃত্ব দেন, এজন্য তাঁকে বার বার কারাবরণসহ অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সাহস, বাগ্মিতা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এদেশের সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করে। বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিষয়টি বর্ণনা করতে হলে ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে মীর জাফরদের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। রাজা-বাদশা নয়, বর্গি-হার্মাদ নয় বা নয় কোনো বর্গিমার্কা জনগোষ্ঠী; সাগর পাড়ের একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি) কাছে পরাজয়ের বেদনা এবং অপমানের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশ পরাধীন যুগে পা রাখে। দেশীয় অমাত্যবর্গ এবং বিদেশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই কোম্পানির বণিকের মানদণ্ড, রাজদণ্ড লাভ করে। বিভেদ নীতি ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইউরোপীয় শিক্ষার যে মুক্ত বাতাস এসেছিল তাও রুদ্ধ হয়ে পড়ে। শোষণ, বঞ্চনা ও অমানুষিক নির্যাতনের মাধ্যমে ব্রিটিশরা যাত্রা শুরু করে। এদেশে দেখা দেয় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০), রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩), শমসের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-১৭৬৮), চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬-১৭৮৭), সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ (১৮৭২-১৮৭৩), গারো বিদ্রোহ (১৮৩৭-১৮৮২), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-১৮৫৭), সন্দীপ বিদ্রোহ (১৭৬৯), নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-১৮৬১), ওয়াহাবী আন্দোলন (১৮৩১), ফরায়েজি আন্দোলন (১৮৩৮-১৮৪৮) এবং সর্বোপরি সিপাহী বিপ্লব (১৮৫৭)। এছাড়া মীর নিসার আলী তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা, ফকির মজনু শাহ বিদ্রোহ ও সিপাহী বিপ্লবের হাবিলদার রজব আলীর ভূমিকা এদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে গণমানুষের চেতনাকে জাগ্রত করেছে। এখানেই থেমে থাকেনি, বঙ্গভঙ্গকে (১৯০৫) কেন্দ্র করে হয় স্বদেশি আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। প্রায় দুশ বছরের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হিসেবে বাংলা ছিল ব্রিটিশদের উপনিবেশ। তবে স্বাধীনতার ডাক এ উপমহাদেশে সর্বপ্রথম বাঙালিরাই দেয়। তিতুমীর থেকে সূর্যসেন, মজনু শাহ থেকে সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম বিদ্রোহী রজব আলী সবাই বাংলার কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, বাঙালিদেরই সৃষ্টি। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শেষ মুহূর্তে হিন্দু-মুসলমানদের দ্বিধাবিভক্তি ব্রিটিশদের কূটকৌশলেই ঘটে। ১৯২০ সালের তেমনি এক মুহূর্তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি বিপ্লবী বাঙালির সূর্যসন্তান। পরে তিনিই লাখো শহিদ অগ্রজ ভাইদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠলেন। ১৯৪২ সালে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শেখ মুজিব উচ্চ শিক্ষার্থে কলকাতার বিখ্যাত ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমানে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ) ভর্তি হন এবং বেকার হোস্টেলে আবাসন গ্রহণ করেন। সময়টি ছিল বাংলার ইতিহাসে এক উত্তাল সময়। শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আর আবুল হাশিমের মতো বাঘা বাঘা নেতা বাংলার রাজনীতিতে তখন সক্রিয়। দেশপ্রেম, স্বজাত্যবোধ আর হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পাশাপাশি, তখন কংগ্রেস-মুসলিম লীগের বিভেদের রাজনীতিতে ক্ষতবিক্ষত বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক জীবন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক বিকাশ হয়েছিল এমনই বিরাজমান আবহে। উদার গণতান্ত্রিক চেতনার পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয় ঐক্যের চেতনায় তাঁর দীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছিল সোহরাওয়ার্দী–আবুল হাশিমের সান্নিধ্যে। তিনি ১৯৪৫ সালে ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৬-এর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় শান্তি স্থাপনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা হিসেবে তিনি যে অসম সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন তা তাঁকে পরবর্তী জীবনে হিংসা-দ্বেষের বিপরীতে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি আস্থাবান করে তুলেছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর তিনি চলে আসেন পূর্ব বাংলায় এবং ঢাকাকে তাঁর কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেন। দেশ বিভাগের পূর্বকালে স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক বাংলা গঠনের দাবি নিয়ে এগিয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ও শরৎ চন্দ্র বসু। বিভক্ত ভারত ও পাকিস্তান দাবি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ও স্বতন্ত্র এই প্রস্তাব ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনা। কিন্তু সময় ছিল বৈরী। হিন্দু-মুসলিমের বিভেদ সম্প্রদায় দুটিকে এত দূরত্বে নিয়ে

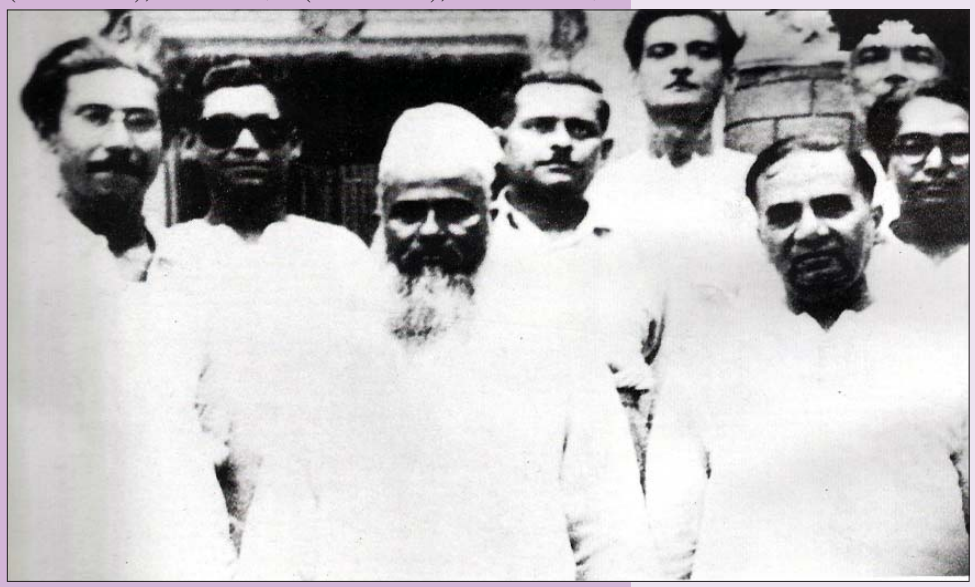

ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭, কাগমারী আফ্রো-এশীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গিয়েছিল যে, অবিভক্ত বাংলার দাবি কাগজপত্রে বক্তৃতা-বিবৃতিতে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। কিন্তু স্বাধীন-সার্বভৌম গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক বাংলা গঠনের এই দাবি বঙ্গবন্ধুর অন্তরাত্মায় এক স্বাধীন বাংলার স্বপ্নকে চিরস্থায়ী করে গেঁথে দেয়। ভাষা আন্দোলনের ফলে দেশ বিভাগের পর পরই পূর্ব বাংলার রাজনীতি উত্তাল হয়ে ওঠে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলা সফরে এসে ঘোষণা দেন– পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু। তাঁর এ ঘোষণা দেশের বিশেষত পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ছাত্র নেতারা তীব্র ভাষায় এ ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বাংলাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এখানেই শেষ নয়, পাকিস্তান গণপরিষদে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব উত্থাপিত হলে, পূর্ব বাংলায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৪৮ সালে এ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এবং ১১ই মার্চ ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতিকালে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। সদ্য প্রতিষ্ঠিত পূর্ব বাংলা মুসলিম ছাত্রলীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ছাত্রনেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ব বাংলার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার এবং আরো অনেকে। তারপরও সেই আন্দোলনকে থামানো যায়নি। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল। সামরিক শাসন চলাকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে বিশৃঙ্খলা ও ডেপুটি স্পিকার নিহত হওয়ার কারণে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সহজেই এ অঞ্চলে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অজুহাত খুঁজে পায়। এ ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি দেশের শাসনতন্ত্র, আইন পরিষদ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেন এবং রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সকল রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। নতুন সামরিক সরকার পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে আবুল মনসুর আহমদ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বহু নেতা ও পরিষদ সদস্যকে গ্রেফতার করে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার ভাগ্যে বিপর্যয় ঘটে। প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব খান মাত্র ২০ দিনের ব্যবধানে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং দেশত্যাগে বাধ্য করেন। সামরিক শাসন কখনো শুভ কিছু আনতে পারে না। সারা পৃথিবীতে একটিও উদাহরণ নেই, যেখানে সামরিক শাসন একটি দেশকে এগিয়ে নিতে পেরেছে। আইয়ুব খানও পারেনি। দেশে সামরিক শাসন, তার ওপর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর এত বঞ্চনা, কাজেই বাঙালিরা সেটি সহজে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। বাঙালিদের সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের তেজস্বী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণা করেন। ৬ দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সবরকম অর্থনৈতিক শোষণ, বঞ্চনা আর নিপীড়ন থেকে মুক্তির এক অসাধারণ দলিল। ফলে দিনে দিনে ৬ দফা কর্মসূচির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ৬ দফার এ জনপ্রিয়তায় সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ৬ দফাকে রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন বলে অপব্যাখ্যা করতে থাকে। এরপর সরকার ৬ দফা আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য দমন নীতির আশ্রয় নিয়ে ১৯৬৬ সালের ৮ই মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বহু আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। এ গ্রেফতারের বিরুদ্ধে ঢাকাসহ প্রদেশের সর্বত্র ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে। অতঃপর বন্দি নেতাদের মুক্তির দাবিতে ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন প্রদেশব্যাপী এক সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেওয়া হয়। সরকার হরতাল বন্ধ করতে ১৪৪ ধারা জারি করে কিন্তু জনগণ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এই গুলিতে কিশোর মনু মিয়াসহ ১২ জন নিহত ও শত শত লোক আহত হন। ৬ দফার সমর্থনে ক্রমশ বাঙালির মধ্যে একটি জাতীয়তাবাদী সার্বিক আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। এই আন্দোলন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বায়ত্তশাসনকামী বাঙালি জনগণের কাছে নির্ভীক ও আপোশহীন নেতায় পরিণত করে। ৬ দফা আন্দোলন নস্যাৎ করতে না পেরে সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা মামলা দায়ের করে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তাঁরা ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আগরতলায় ষড়যন্ত্র করছিল। আসামিরা নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করে। কিন্তু স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য তাঁদের ওপর চালানো হয় অমানুষিক নির্যাতন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র পূর্ব বাংলায় আইয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে প্রচণ্ড গণ-আন্দোলন চলাকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। এ সংগ্রাম পরিষদ ১৯৬৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ৬ দফাকে অন্তর্ভুক্ত রেখে ১১ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১১ দফা কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিলসহ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি, জরুরি নিরাপত্তা প্রত্যাহার ও রাজবন্দিদের মুক্তি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে গণ-আন্দোলনের উচ্চারণ ছিল স্পষ্ট– 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর/ বাংলাদেশ স্বাধীন কর।' এই আন্দোলনের চরম পর্যায়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ চেতনার প্রচণ্ড অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে– 'জয় বাংলা' স্লোগান এবং 'তোমার দেশ, আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ'- ধ্বনির মাধ্যমে। উনসত্তরের গণ-আন্দোলন শুরুর পেছনে ৬ দফা ও ১১ দফার ভূমিকা অপরিসীম। মওলানা ভাসানীর ঘেরাও আন্দোলন এখান থেকেই। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ১৯৬৯ সালের ১৯শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিছিল বের করে, আহত অবস্থায় বন্দি হন বীর ছাত্ররা। ২০শে জানুয়ারির আন্দোলনে আসাদুজ্জামানকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ২৪শে জানুয়ারির প্রতিবাদ দিবস হয়ে ওঠে গণ-অভ্যুত্থান দিবস। সেক্রেটারিয়েটের সামনে কিশোর রুস্তম আলী, মকবুল এবং নবম শ্রেণির ছাত্র মতিয়ুর রহমান পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দিদের হত্যার ষড়যন্ত্র হয়। বন্দি অবস্থায় হত্যার শিকার হন মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক। ১৫ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয়। সে রাতেই কারফিউ ভেঙে হাজার হাজার মানুষ সামরিক বাহিনীর সাথে লড়াই করে। ২২শে ফেব্রুয়ারি কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর এক বেতার-টিভি ভাষণে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। তাঁর ঘোষণায় তিনি এক ইউনিট ভেঙে দেন, এক ব্যক্তি এক ভোট নীতি ঘোষণা করেন এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কায়েমসহ বেশ কিছু মৌলিক নীতির কথা তুলে ধরেন। এর মাঝে ১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর মাজার প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, 'আর পূর্ব বাংলা নয়, আর পূর্ব পাকিস্তান নয়, জনগণের পক্ষে আমি ঘোষণা করছি, আজ থেকে বাঙালি জাতির এ আবাসভূমির নাম বাংলাদেশ'– এই ঘোষণার মাধ্যমে তিনি এদেশের নামকরণ করেন। নানা ষড়যন্ত্র ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে জয়লাভ করে নির্বাচনে তাৎপর্যময় বিজয় অর্জন করে। নির্বাচনের কিছুদিন আগে ১২ই নভেম্বর পূর্ব বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে

স্মরণকালের এক ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। বঙ্গবন্ধু দুর্গত এলাকায় দলের পক্ষ থেকে ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা ও পুনর্বাসনের কাজ চালান। এ সময় দুর্গত মানুষের প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অবহেলা ও উপেক্ষায় ক্ষুব্ধ বঙ্গবন্ধু শাহবাগ হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা দেন, 'ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে নিহত ১০ লাখ লোকের মতো আরো ১০ লাখ প্রাণ দিয়ে হলেও আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার আদায় করে নেব।'

বাংলার মানুষের স্বাধিকার তথা স্বাধীনতার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মপ্রয়াসকে কাজে লাগিয়ে ১৯৭০-এর নির্বাচনে বাংলার মানুষের পক্ষে কথা বলার একক ম্যান্ডেড ও আইনি অধিকার লাভ করেন। নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত আন্দোলনকে একটি পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। চক্রান্ত চলতে থাকে যাতে বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় বসতে না পারেন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার না হয়। ৬ দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন করতে সামরিক বাহিনী ও শাসকগোষ্ঠীর বেসামরিক মুখপাত্র জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রকাশ্য বিরোধিতার ফলে পাকিস্তানের ঐক্যবদ্ধ কাঠামো ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। বঙ্গবন্ধু তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নীতি-কৌশল গ্রহণ করতে থাকেন। ৭ই মার্চ ১৯৭১ তিনি রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন- 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম...। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।'

২৫শে মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশকে চির পদানত করার লক্ষ্যে কথিত-সংকটের সমাধানের সামরিক চক্রান্ত নিয়ে স্বাধীনতাকামী নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর রাতের আঁধারে হামলে পড়ে। পাকিস্তানিদের এই আক্রমণের মোকাবিলায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতের অবসানে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে। শুরু হলো আমাদের মুক্তি সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় সশস্ত্র-যুদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার-টিভি ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন-Mujib is a traitor to the nation, this time he will not go unpunished'; সমগ্র বাংলাদেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম। এই সংগ্রামকে সুসংঘবদ্ধ করতে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হয় গণপরিষদ। এ পরিষদের মাধ্যমে ১০ই এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হয়। ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামানের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ ৯ মাস বঙ্গবন্ধুর নামে চলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র জনযুদ্ধ। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ শহিদ ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পরিপূর্ণ বিজয় অর্জিত হয়। ওই দিন রেসকোর্স ময়দানে ৯৩ হাজার সদস্যবিশিষ্ট পাকিস্তানি সেনা ও সহযোগী বাহিনীসমূহ, ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং বাংলাদেশ থেকে চিরতরে পাকিস্তানি দখলদারিত্বের অবসান ঘটে। আর লক্ষ শহিদের শবের পলিতে উর্বর পুণ্যভূমি বাংলায় উদিত হয় বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার নব সূর্য। ১৯৪৭ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন অর্থাৎ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলির বিশ্লেষণ করলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁকে বাদ দিয়ে প্রাক কিংবা উত্তর-বাংলাদেশের তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ইতিহাস রচনা অসম্ভব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের বাঙালির লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের অগ্রপথিক এবং তিনিই বিশ্ব মানচিত্রে বাঙালিদের জন্য একটি স্বাধীন ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার প্রধান সেনানী; যে দেশের নাম 'বাংলাদেশ'। এ জন্য আমরা গর্বিত। আমাদের আগামী সকল প্রজন্মও গর্বিত হবে। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি এবং বাংলাদেশ বেঁচে থাকবে সেই গর্বের সমৃদ্ধি ও চেতনা বজায় রেখে। দেশমাতৃকার প্রতি আত্মত্যাগ ও শ্রমের অনন্য প্রতীক হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকবেন চিরদিন। আর এ অমরত্বকে আমরা কেবল কবির ভাষাতেই শোভন বলে বোধ করতে পারি।

'যতকাল রবে পদ্মা-যমুনা-গৌরী-মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।'

লেখক: সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

ঐতিহাসিক '৬ দফা'

প্রথম দফা–শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি: ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সরকারের বৈশিষ্ট্য হবে Federal বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ও সংসদীয় পদ্ধতির; তাতে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলো থেকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ এবং সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। প্রদেশগুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্বাচন জনসংখ্যার ভিত্তিতে হবে।

দ্বিতীয় দফা–কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা: কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দায়িত্ব থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

তৃতীয় দফা–মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যা পারস্পরিকভাবে কিংবা অবাধে উভয় অঞ্চলে বিনিময়যোগ্য। এক্ষেত্রে দুঅঞ্চলে স্বতন্ত্র বা পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাংক থাকবে এবং মুদ্রার পরিচালনা ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। অথবা এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে একটি মুদ্রা ব্যবস্থা চালু থাকতে পারে এই শর্তে যে, একটি কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার অধীনে দুই অঞ্চলে দুটি রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। তাতে এমন বিধান থাকতে হবে যেন এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পদ হস্তান্তর কিংবা মূলধন পাচার হতে না পারে। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধ করার জন্য সংবিধানে কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

চতুর্থ দফা–রাজস্ব কর ও শুল্ক বিষয়ক ক্ষমতা: সকল প্রকার রাজস্ব ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে। কেন্দ্রীয় তথা প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় রাজস্বের জোগান আঞ্চলিক তহবিল থেকে সরবরাহ করা হবে। সংবিধানে নির্দেশিত বিধানের বলে রাজস্বের এই নির্ধারিত অংশ স্বাভাবিকভাবেই ফেডারেল তহবিলে জমা হয়ে যাবে। এহেন সাংবিধানিক বিধানে এমন নিশ্চয়তা থাকবে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারটি এমন একটি লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে যেন রাজস্ব নীতির উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিশ্চিতভাবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকে।

পঞ্চম দফা–বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা: পঞ্চম দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে নিম্নরূপ সাংবিধানিক বিধানের সুপারিশ করা হয় : (ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যের বহির্বাণিজ্যের পৃথক পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে। (খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাজ্যগুলোর এখতিয়ারে থাকবে এবং অঙ্গরাজ্যের প্রয়োজনে অঙ্গরাজ্য কর্তৃক ব্যবহৃত হবে। (গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত নির্দিষ্ট হারে অঙ্গরাজ্যগুলো মিটাবে। (ঘ) অঙ্গরাজ্যের মধ্যে দেশজ দ্রব্য চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা করজাতীয় কোনো বাধা থাকবে না। (ঙ) সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণের এবং স্ব স্ব স্বার্থে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

ষষ্ঠ দফা–আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা: (ক) আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বাহিনী বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে। (খ) কেন্দ্রীয় সরকারের সকল শাখায় বা চাকরি ক্ষেত্রে প্রতিটি ইউনিট থেকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ করতে হবে। (গ) নৌবাহিনীর সদর দপ্তর করাচি থেকে চট্টগ্রামে স্থানান্তর করতে হবে।

একজন গায়কের ঢাকা যাত্রা

রফিকুর রশীদ

লোকটাকে কিছুতে ঠেকানো গেল না, সে ঢাকা যাবেই, তার চোখমুখের অভিব্যক্তি দেখে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়– এখনই ঢাকার উদ্দেশে রওনা না হলেই নয়; যত দ্রুত সম্ভব ঢাকায় তাকে পৌঁছুতেই হবে।

কেন, ঢাকায় কী কাজ তার?

নিভৃত এক পাড়াগাঁয়ের অতি সাধারণ মানুষ সে। নিজের গায়ের একমাত্র জামাটিরও উলটো-সিধা যে বোঝে না ঠিকমতো, ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট এবং শতেক রকম গলি-তস্য গলির কীই-বা চেনে, কেমন করে যাবে ঢাকায়? তার বাপ-দাদা কেউ কোনো কালে ঢাকা দেখেছে এমন ইতিহাসও কারো জানা নেই। নিকটজনের মধ্যে কারো বিবরণ থেকে ঢাকা শহরের সাধারণ চিত্র জানার সুযোগও হয়নি তার। তবু সে ঢাকায় যাবে। কে যে মাথায় দিব্যি দিয়েছে তার, কাজেই এখন না গেলেই নয়। সে যাবেই।

ঢাকার উদ্দেশে রওনা হবার আগে যাদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, তারা অনেকেই এ সময়ে পথে পা বাড়াতে নিষেধ করেছে। দেশের অবস্থা সত্যিই বিশেষ ভালো না। দিনে-দুপুরে খুন-খারাবি, ছিনতাই-ডাকাতি হরহামেশা হয়েই চলেছে। এই আতান্তর সময়ে তার মতো সহজ-সরল সাধারণ একজন মানুষ অচেনা-অজানা একটা গন্তব্যে যাত্রা করে কোন সাহসে! সারল্য শুধু নয়, তার স্বভাবের মধ্যে প্রখর অনুভূতিসম্পন্ন কবিত্ব শক্তির উপস্থিতি দেখা গেছে। চারপাশে অঘটন-সুঘটন যাই ঘটুক, তার মনে ধরে গেলেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে গানের কলি অথবা কবিতার পঙ্‌ক্তি। চারণ কবি মুখে মুখেই গান বাঁধে, ক্লান্তিহীন গেয়ে বেড়ায় পথে পথে। সেই মানুষ গান থামিয়ে চলে যাবে ঢাকায়।

সে এক সময় ছিল বটে, যখন এই মানুষের মধ্যে অনেকেই তাকে ঢাকায় যেতে প্ররোচিত করেছে। যারা এখন ঢাকায় যাবার সম্ভাব্য বিপদের কথা ভেবে উৎকণ্ঠিত, তারাই কত না অবলীলায় একদা তাকে প্রলুব্ধ করেছে– যাও, ঢাকায় গিয়ে তোমার গান শোনাওগে। সেটাই হবে কাজের কাজ।

চোখে চোখে অবিশ্বাসের ছায়া দুলে ওঠে তার। সলজ্জভঙ্গিতে প্রতিবাদ করে সে,

– সিখানে আমার গান শুনবে কিডা ! ঢাকায় কি গায়কের অভাব?

তাকে বুঝিয়ে বলা হয়,

– না না গায়ক নয়, বড়ো বড়ো অনেক শিল্পী আছে ঢাকায়। দিনরাত রেডিওর মধ্যে কত রকম গান গায় তারা; কিন্তু তোমার গান একেবারেই আলাদা। তুমি ঢাকায় যাও ভাই।

প্রস্তাব শুনে অন্তরে বেশ খুশির ঢেউ জাগে, আবার সংশয়ও জাগে–সবাই তার সারল্যের সুযোগ নিয়ে ঠাট্টা করছে না তো ! এমন কী আছে তার গানে! ঢাকার মানুষ শুনবে কেন তার গান?

ভেতরের এই খচখচানি সে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখতে পারে না। মুখের মানচিত্রে ঠিকই ছায়া ফুটে ওঠে। একজন অন্যজনকে ছাপিয়ে এগিয়ে এসে আঙুল নেড়ে নেড়ে পরামর্শ দেয়–ঢাকায় যাও দেখি, দেশের রাজা থাকে তো ঢাকায়, রাজাকে শোনাও গান। তবে যদি হয় কোনো সমাধান।

সমাধানের কথা উঠছে এই জন্য যে, লোকটার গানের ভেতরে অসংখ্য সমস্যার কথা থাকে, সামাজিক নানা সংকটের ছবি থাকে। গায়ক তার গানে গানে এই সব অসংগতি ও সংকটের সমাধান খোঁজে, প্রতিকার চায়। শুরুর দিকে তার মন মজেছিল মুক্তিযুদ্ধে। গানের পরতে পরতে মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট নানান ঘটনার বর্ণনা। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৫শে মার্চের পৈশাচিক হামলা, শরণার্থীদের অবর্ণনীয় দুঃখ-ক্লেশ, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই,পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ও আত্মসমর্পণ এবং বীর বাঙালির বিজয় লাভ– এই ছিল তার অধিকাংশ গানের বিষয়বস্তু। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সব গানের শেষে ভনিতা অংশে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার সকাতর আহ্বান থাকবেই– 'ও আমার দেশের নায়ক, দেখে যাও আসিয়া/ তোমার তরে আমজনতার দুচোখ যায় ভাসিয়া... ।' সে যে কোথায় পেয়েছে এ সম্বোধন কে জানে। সবার মতো করে বঙ্গবন্ধু বা জাতির পিতা বলে না, বলে সে দেশের নায়ক, গভীর আন্তরিকতার সঙ্গেই আহ্বান জানায়। দেশের নায়ক তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন নিয়ে মহাব্যস্ত। কোথাকার এক নামগোত্রহীন গায়কের আহ্বানে সাড়া দেবার সময়–সুযোগ তিনি পাবেন কোথায়! গাঁওগেরামের মানুষ তখনো পরামর্শ দিয়েছে ঢাকায় যাবার। বুঝিয়ে বলেছে, বঙ্গবন্ধুই বলো আর দেশের নায়কই বলো, তিনি থাকেন তো সেই ঢাকায়, তুমিও যাও, ঢাকায় গিয়ে তোমার গান শুনিয়ে এসো। কেউ কেউ অন্যভাবেও প্রলুব্ধ করেছে– তুমি চেনো তাঁকে? তাঁর বুকের দুয়ার হাট করে খোলা। যাও না ঢাকায়, তোমার এসব গান একবার তাঁর কানে ঢুকলেই জনম সার্থক। বলা যায় না বিরাট কোনো পুরস্কারও জুটে যেতে পারে। যাও, ঢাকায় যাও।

না গায়ক নিজের গাঁওগেরাম ছেড়ে বেশি দূরে যেতে রাজি নয়। থানা শহর আর মহকুমা শহর পর্যন্ত যে দু'চার দফা গেছে, বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি। বেলায় বেলায় নিজ গ্রামে ফিরে তবে স্বস্তি। রেলগাড়ি দেখার কৌতূহল নিয়ে সে স্টেশন পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। ঢাকা যেতে হলে এখান থেকে রেলগাড়িতে চেপে যেতে হয় গোয়ালন্দঘাট, তারপর নদী পেরিয়ে মোটরবাসে সোজা ঢাকা– এসব বিবরণ খুব ভালো জানে, তাই বলে সে ঢাকায় যাবে! কেন যাবে, কী কাজে যাবে? গান শোনাতে! দেশের নায়কের কাছে সে পৌঁছুতে পারবে! না এতদূর ভাবতেও সে রাজি নয়। গান গেয়ে সে আনন্দ পায়, গান গেয়েই যাবে পথে পথে, ঢাকায় যাবে কী করতে?

হ্যাঁ, পুরস্কার প্রাপ্তির ব্যাপারটাও সে ভেবে দেখেছে। গান বেঁধে সেই গান মানুষকে শুনিয়ে সে নির্মল আনন্দ পায়। এই আনন্দটুকুই তার পুরস্কার, এর অধিক কীই-বা তার প্রত্যাশা আছে মনে! দশ দিগরের মানুষ যে গান শুনে তাকে বাহবা দেয় (এমনকি ফুলের মালাও পরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে), একি তার পুরস্কার নয়! না না, এর বেশি লোভী সে হতে পারবে না। গাঁয়ের মানুষ সে গাঁয়েই থাকতে চায়। চারপাশের মানুষের সুখ–দুঃখ, আশা–নিরাশার কথা গানের বাণীতে সাজিয়ে গেয়ে শোনাবে– এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু নেই তার কাছে। ভেতরে ভেতরে খুনখুনিয়ে হেসে ওঠে লোকটা। নিজের সঙ্গে নিজেই যেন পরিহাসে মেতে ওঠে–কী হে গায়ক, পুরস্কার নিবা না?

লোভ তার থাক আর নাই থাক, একদিন এক রাজকীয় পুরস্কার তাকে টেনে নিয়ে যায় মহকুমা শহরে। এমসিএ সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন, গান শুনবেন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তিনি। সংসদের ভেতরে-বাইরে কত কাজ তার। তবুও তিনি গান শুনবেন, পেয়াদা এসে জানিয়ে গেল। তারপর মান্নান মেম্বর এসে সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসিয়ে টেনে নিয়ে যায় টাউনে। এমসিএ সাহেবের বাড়ির সামনে এসে কী কেলেঙ্কারি যে ঘটে যায়। সাইকেলের প্যাডেল থেকে পা হড়কে এক গাদা মানুষের মধ্যে দু'জনের সে কী লটরপটর দুর্দশা! গায়ের ধুলোবালি ঝেড়ে দাঁড়াতেই মান্নান মেম্বর চোখ রাঙিয়ে তাকায়। তীব্র ভর্ৎসনা করে ওঠে– তোর জন্যই তো এ হাল, সাইকেল নড়ালি কেন? হ্যান্ডেল কেঁপে গেল যে!

গায়ক নির্বিবাদে ঘাড় কাত করে সমস্ত দায়-দোষ মেনে নেয়। ইচ্ছে করে সে হ্যান্ডেল কাঁপায়নি বটে, তবুও অঘটন তো একটা ঘটে গেছে। অগত্যা কী আর করা অকারণে হি হি করে হেসে চেহারায় উদ্ভাসিত বিব্রতকর ভাবটা আড়াল করতে তৎপর হয়। নিজে থেকেই ঘোষণা দেয়– গায়ক মানুষ তো, গান গাওয়া ছাড়া অন্য কুনু কাজ তো করতি পারিনি। গোল হয়ে ঘিরে থাকা মানববৃত্তের মধ্যে থেকে কে যেন কুটুশ করে মন্তব্য করে– গান গাওয়ার মজা দ্যাখাচ্ছি দাঁড়া! গা ছমছম করে গায়কের। চোখ তুলে তাকায়। মন্তব্যকারীকে শনাক্ত করার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। সেই লোকটা অতিদ্রুত অনেকের মধ্যে মিশে যায়। এমসিএ সাহেব গটমট করে সামনে এসে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেন,

– তুই গান বাঁধিস?

ঘাড়-মাথা চুলকাতে চুলকাতে বিনয়ের সঙ্গে সে জানায়,

– জি, আমার গান আমি নিজে বাঁধি, আবার নিজেই গাই।

– কী গান বাঁধিস বল দেখি, পল্লিগীতি?

– পল্লি সুরেই গাওয়া হয়। আগে বাঁধতাম মুক্তিযুদ্ধের গান, শোনবেন একটা ?

– মুক্তিযুদ্ধ ছেড়ে এখন কিসের গান বাঁধা হয়?

– সমাজ-সংসারের কত কিছু নিয়েই তো গান বাঁধা যায় হুজুর। আমি গান বাঁধি সমিস্যা নিয়ি। মানুষের যে কত রকম সমিস্যা আছে!

'সমিস্যা' মানে হচ্ছে সমস্যা। মুক্তিযুদ্ধের বিষয় থেকে সরে এসে গায়ক এখন সামাজিক নানান সমস্যা নিয়ে গান বাঁধে। তবে গানের ভনিতাতে সেই আগের মতো দেশের নায়কের কাছে তার আহ্বান থাকে। তিনি যেন অন্তত একবার এই দেশগ্রামে এসে সরেজমিনে দেখে যান মানুষের সমস্যার চিত্র। তার এ আহ্বান দেশের নায়কের কান পর্যন্ত পৌঁছেনি হয়ত, এমসিএ সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে বড্ড সাধ জাগে সেই সব গান শুনাতে। তাই সে প্রস্তাব রাখে, মুক্তিযুদ্ধের গান দিয়া শুরু করি তাহলি!

– না, গর্জে ওঠেন এমসিএ সাহেব– সমিস্যার গান কী রকম?

– সে তো অনেক রকম গান আছে হুজুর, শোনাব?

এমসিএ সাহেব গড়গড় করে ওঠেন,

– আমার জামাইকে নিয়ে তুই গান বেঁধেছিস?

জামাই! গায়ক জানেই না কে এমসিএ সাহেবের জামাই। অবাক হয়ে সে মান্নান মেম্বরের দিকে তাকায়। মেম্বর তখন সূত্র ধরিয়ে দেয়।

– কেন, রসুলপুরের হামিদ মাস্টারকে নিয়ে গান বাঁধনি তুমি?

– হ্যাঁ, গান আছে তো ! গাবো সেই গান– লোকে বলে হামিদ ডাকাত...

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে এমসিএ সাহেব ঠাস করে চড় বসিয়ে দেন গায়কের গালে। এরপর তার শিষ্য-সাগরেদরাও হাতের সুখ মিটিয়ে দক্ষিণা দেয় গায়ককে।

ন্যায্যমূল্যের দোকানের মালপত্তর লুটপাট করে বর্ডারে চালান করার অভিযোগে রক্ষীবাহিনী এসে হামিদ মাস্টারকে ধোলাই দিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যায়। আবার এক সপ্তাহের মধ্যে ছাড়াও পেয়ে যায়। সে সময় হামিদ মাস্টারের অবৈধ সম্পদের পরিমাণ নিয়ে কত রকম কেচ্ছা যে রটে যায়। সেই কেচ্ছাকে গানে গানে বেঁধেছে, –এই হচ্ছে গায়কের অপরাধ। এমসিএ সাহেবের বড়ো ভাইয়ের জামাই হামিদ মাস্টার– সে খবর সে নেয়নি কেন? যার-তার নামে এভাবে থুতু ছিটানো চলে!

সেদিন আর এমসিএ সাহেবকে গান শোনানো হয়নি গায়কের, কেবল নিজের মান খোয়ানোই হয়েছে। তারপর প্রায় মাসখানেক সে মন খারাপ করে গুম ধরে বসে থেকেছে, নতুন গান বাঁধেনি, পুরোনো গানও গায়নি। এমসিএ সাহেবের কাছে অপমান হবার এই ঘটনা ভেতরে ভেতরে দানা বেঁধে গানের কলি হয়ে বাকযন্ত্রের দরজায় এসে বেশ কদিন ধাক্কা দেয়। কিন্তু সে শক্ত হাতে গলা টিপে ধরে, সেই কলি আর স্ফুট হতে দেয় না। তবু গানের শক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত তাকে হার মানতেই হয়। প্রতিদিনই চারপাশে কত না অনিয়ম–অসংগতি ঘটে চলেছে, খুন–খারাবি-লুটতরাজ লেগেই আছে,

পেটের ভাত, পরনের কাপড়ের দাম হু হু করে বেড়েই চলেছে– বাস্তবে এই সব দৃশ্য দেখেও আশ মেটে না গ্রামের সাধারণ মানুষের। তারা গায়কের গানে গানে এসবের বয়ান শুনতে চায়, দিনের পর দিন তাকে প্ররোচিত করে। ফলে এক সময় বাঁধ ভেঙে যায়, বানের শ্রোতের মতো ভেসে আসে গানের কলি, নিজের ওপরে আর নিয়ন্ত্রণ থাকে না তার। এমনকি মান্নান মেম্বরের হুমকি–ধামকিতেও সে আর পরোয়া করে না।

কিন্তু ভাবনার কথা হচ্ছে, লোকটা এত সাহস পায় কোথা থেকে। সে তো অতি সামান্য মানুষ, অতি সাধারণ মানুষ! তার মতো মানুষের শক্তি-সাহসের উৎস কোথায়! এ প্রশ্নের উত্তর সে সোজাসুজি দিতে চায় না, গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওঠে প্রবল প্রত্যয়ে–'ও ভাইরে ভাই, এই জনগণ জাগলে তখন রক্ষা কারো নাই...।'

তবে কি জনগণের জাগরণের ওপরেই তার ভরসা? স্বাধীনতার পরও জনগণের শোষণ-বঞ্চনা–প্রতারণার তো শেষ হচ্ছে না। ভাগ্যের কোনো বদল হচ্ছে না। গরিব মানুষ আরো গরিব হচ্ছে, কেউ কেউ আবার আঙুল ফুলে কলাগাছও হয়ে যাচ্ছে তাহলে এসব মানুষ দাঁড়াবে কোথায়, কোন ভরসায়! গায়কের বুকে ভয়ডর বলে কিছু নেই। হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ কেউ সাবধান করে, অমুকের দুর্নীতির গানটা চেপে যাবার পরামর্শ দেয়, গানের ভেতরে রক্ষীবাহিনীর কথা না-বলার কথা বলে। গায়ক এসব কানেই তোলে না। গেয়ে ওঠে ভরাট কণ্ঠের গান– ওরে ভয় নাই রে নাই /আমার নেতা জাতির নেতা/চলো তাহাকে জানাই। তার মানে বঙ্গবন্ধুই তার অন্তরে সাহসের অনির্বাণ বাতি জ্বালিয়ে রাখেন। সবাই ঠেলাঠেলি করে– তাহলি তুমি একবার ঢাকায় যাও, নেতার সামনে গিয়ে দাঁড়াও।

– মাথা খারাপ! গায়ক একগাল হাসি ছড়িয়ে নিজেকে সরিয়ে নেয়। উপস্থিত ভক্তদের পরামর্শ দেয়– তোমরা দল বাঁধো। ঢাকায় যাও। দেখা করো। বুঝিয়ে বলো দেশের কথা। অবশ্যই শোনবে, তুমরা যাও।

কে একজন তখনো যুক্তি দেখায়– আমাদের মুখের কতা আর তুমার গানের মধ্যি আকাশ-পাতাল তফাৎ। তুমিই যাও। যাব সুময় হলি আম্যু একদিন যাব ঢাকায়।

শুনে সবাই আশ্বস্ত হয়। কিন্তু সেই সময় যে কখন হয়, সেটাও দেখার বিষয়।

চারপাশে কত কিছুই ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। কটা নিয়ে গান বাঁধবে গায়ক! কত কথা লেখা যায় গানে গানে! কদিন পরে নিজের স্ত্রীর পরনে ছেঁড়া-ফাটা শাড়ি দেখে আঁতকে ওঠে সে, বেশ কয়েক হাটে ঘুরে ঘুরে উচ্চমূল্যের জন্য শাড়ি কিনতে পারেনি, সেই কথা মনে পড়ে যায়। তবে কি নিজের বউয়ের এই বেহাল দশা নিয়ে গান বাঁধবে এবং হাটেঘাটে সেই গান গেয়ে বেড়াবে!

সেদিন রাতে ঘুম আসে না গায়কের চোখে। বার বার ভেসে আসে একটি মুখের ছবি। কোনোদিন তো কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়নি, কাগজে মুদ্রিত পোস্টারে নানান রকম ছবি দেখেছে। দেশের নায়ক। কত রকম যে ছবি আছে তাঁর। থাকবেই তো, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এতদিন পর সবগুলো ছবিতে নায়কের চোখে বিষণ্নতা ছলকে উঠছে কেন! তবে কি ভালো নেই দেশের নায়কের মন! গায়কেরও মন খারাপ হয়ে যায়। ঘুমন্ত স্ত্রীর পাশ থেকে উঠে সে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে। উঠানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকায়। মেঘে ঢাকা শ্রাবণ আকাশ অন্ধকারে নত হয়ে আছে, যে-কোনো সময় ঝরে পড়বে অশ্রুধারায়, তারই প্রস্তুতি চলছে সারা আকাশ জুড়ে। ঝলসে ওঠা বিদ্যুতের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। গায়কের তখন নতুন গান বাঁধার সাধ হয়। সে গানের বিষয়বস্তু আর কিছু নয়, শুধুই বঙ্গবন্ধু। না, তাঁর কাছে কোনো কিছু চাওয়া নয়, দেশের সংকট-সমস্যার কথা জানানো নয়, তাঁর চোখের কোণে কেন অশ্রুবিন্দু জমা হয়েছে তাই নিয়ে একটা গান বাঁধতে ইচ্ছে করে। কিন্তু শব্দগুলো কিছুতে গুছিয়ে আসে না, ঠিকমতো ধরা দিতে চায় না। বার বার চেষ্টা করে, তবু শব্দের গায়ে শব্দ গাঁথা হয়ে ওঠে না, তখন গায়ক শুধু দেশের নায়ক শব্দ যুগল উচ্চারণ করতে করতে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে। স্ত্রীর পাশে শুয়েও তার ঠোঁট জোড়া বিড়বিড় করে তড়পায় 'দেশের নায়ক' বলে বলে। সে রাতে গায়কের চোখে ঘুম আসুক আর নাই আসুক, ভোরবেলার দিকে চোখের পাতা ভারী হয়ে স্বপ্ন নেমে আসে। সেই স্বপ্নের সূত্র ধরে সকালে উঠেই সে ঘোষণা দেয়– আমি ঢাকায় যাব।

– স্ত্রী চমকে উঠে,

– ঢাকায় যাবা ক্যানে?

– কাজ আছে।

– কী কাজ?

– দেশের নায়ক স্বপ্নে আমাক ডাইকিছে!

– স্ত্রীর কণ্ঠে বিস্ময়– তুমায় ডাইকিছে!

– হ্যাঁ, আমি স্বপ্নে দ্যাখলাম যে! হাত ইশারায় ডাকল...

– দেশের নেতা তুমাক চেনে? তুমার নাম জানে?

– চেনেই তো! সব মানুষকে চেনে। আমরাই অনেকে তাঁকে চিনতি পারিনি।

– গায়কের স্ত্রী এবার ফ্যাচ করে কেঁদে ওঠে। গায়ককে জড়িয়ে ধরে বলে,

– তুমি ঢাকায় গেলি আমার কী হবে?

– কী আবার হবে, আমি কি চিরকালের জন্যি যাচ্ছি?

– স্বপ্নের কতা শুইনি কেউ অ্যামুন কইরি নাচে! পাগল হয়িচো?

– না না, আমাক যাতিই হবে। অনেক কতা আছে, তাঁকে বুলতি হবে। দেখা হলেই কথা হবে। কতা হলিই আমি চইলি আসপো।

এরপর কেউ আর গায়কের গতিরোধ করতে পারে না। ঢাকায় সে যাবেই। যারা একসময় তাকে ঢাকা যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে তাদের মধ্যে অনেকেই আপত্তি জানায়, বুঝিয়ে বলে, দেশের অবস্থা ভালো না, এ সময় ঢাকায় যাওয়া ঠিক হবে না। দু'একজন তো প্রবল বাধা দেয়, কাঁধে থাবা দিয়ে বলে, স্বপ্নের কথা আর বাস্তবের কথা এক হলো! বঙ্গবন্ধু কোথায় থাকে জানো? সেখানে পৌঁছাতে পারবা?

গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে গায়ক জানায়, যেভাবেই হোক সে ঠিকই পৌঁছে যাবে দেশের নায়কের কাছে। অনেক কথা জমা হয়ে আছে। দেশের নায়ক সেটা জানে বলেই তো ডেকে পাঠিয়েছে। অত বড়ো মানুষের ডাক না-শুনে কি পারে! দেখা করেই সে গ্রামে ফিরে আসবে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে পরদিন সকালটা আসে একেবারে অন্যরকমভাবে। আঁতকে ওঠে দেশের মানুষ, চমকে ওঠে বিশ্ববিবেক– এটাও সম্ভব! বাঙালির যে নেতাকে পাকিস্তানিরা পারেনি হত্যা করতে, কতিপয় পথভ্রষ্ট বাঙালি সৈনিক তাই করে বসল! ঢাকাসহ সারাদেশ স্তব্ধ। কে বলবে আজ পাড়াগাঁয়ের সামান্য এক গায়ক ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছেছিল কি-না, দেশের নায়কের দেখা পেয়েছিল কি-না! তবে তাকে আর গ্রামে ফিরতে কেউ দেখেনি। অনেকদিন পর গ্রাম্য মসজিদের ইমাম মাওলানা মো. তকিউল্লাহ আচনক এক তথ্য প্রকাশ করেন। ঢাকা যাত্রার আগের রাতে স্বপ্ন দেখে গায়ক নাকি তার কাছে গিয়ে জানতে চেয়েছিল–

– ভোররাতের স্বপ্ন কি সত্যি হয় হুজুর?

– কেন, কেন, কী স্বপ্ন দেখেছিস ব্যাটা?

ইমাম সাহেব এভাবেই সম্বোধন করেন সবাইকে। সবাই তার আপন। গায়ক নামাজ পড়ে না জেনেও কটু কথা বলেন না। গায়ক তাই পরম নির্ভরতায় স্বপ্নবৃত্তান্ত জানায়– দেশের নায়ক উঁচু পাহাড় থেকে নিচে নেমে যাবার সময় হাত বাড়িয়ে তাকে ডেকেছেন। এ স্বপ্নের মানে কী? চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ইমাম সাহেব জানান, এ যে বড়োই অশুভ স্বপ্ন ব্যাটা। গায়ক তখনই ঢাকায় যাবার সিদ্ধান্ত ফাইনাল করে ফেলে।

লেখক: শিক্ষাবিদ, বঙ্গবন্ধু গবেষক ও সাহিত্যিক

নিবন্ধ

বঙ্গবন্ধু এক ঐশ্বরিক আগুন

মুহাম্মদ ফরিদ হাসান

এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা নিজের আলোয় আলোকিত করেন পৃথিবীকে, যাঁদের কথায় উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত হয় আপামর মানুষ, যাঁদের মানবিক জ্যোৎস্না স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দেয় মন ও মননভূমিতে– তাঁরা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সূর্যসন্তান, কীর্তিমান মানুষ। এমন সূর্যসন্তানকে ধারণ করে, তাঁদের কর্মযজ্ঞে ঋদ্ধ হয়ে ধুলির পৃথিবী হাজার হাজার বছর ধরে হয়ে উঠেছে শ্যামল-সুন্দর, রত্নগর্ভা। এই বিরলপ্রাণরা পথের দিশা দিয়েছেন পথ ভোলাদের। কখনো শান্তি ও প্রগতির চাকা ঘুরিয়েছেন একনিষ্ঠ শ্রম ও ঘামে, আবার কখনো তাঁদের নেতৃত্বে শৃঙ্খল ঘুচেছে পরাধীন জাতির। তবে আলোচ্য নিবন্ধে আমরা সচেতনভাবেই পরাধীন বাঙালি জাতির স্বাধীনতা অর্জনের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করব, যে দৃষ্টির প্রথম থেকে অন্তিম পর্যন্ত জুড়ে আছেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর প্রতি তৎকালীন বিশ্বনেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালির মুক্তির দূত, দুর্দিনের কাণ্ডারি। উইলিয়াম শেক্সপিয়র একবার বলেছিলেন, 'এ জগতে কেউ কেউ জন্মগতভাবে মহান, কেউ মহত্ত্বের লক্ষণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, আবার কেউ স্বীয় প্রচেষ্টায় মহানুভবতা অর্জন করেন।' কথাটি বঙ্গবন্ধুর জীবনের সাথেও মিলে যায়। শৈশব থেকেই শেখ মুজিব সচেতন ও সমগ্রতার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠেন। তিনি জন্ম থেকেই যেন ঐশ্বরিকভাবে নেতৃত্বের ও মানবতার গুণাবলি পেয়ে এসেছেন। তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম বলেছেন, শেখ মুজিব ছিলেন 'ঐশ্বরিক আগুন'। তিনি তাঁর নেতৃত্বে এ দেশের মানুষকে সেই মুক্তির পথ দেখিয়েছেন, যে পথ পূর্বে আর কেউ দেখাতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগ, আজন্ম লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন তাঁকে ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠানে, দেশ থেকে বিশ্বে, কাল থেকে মহাকালের শাশ্বত পথের দিকে ধাবিত করেছে। অন্যায়কে প্রতিরোধ, অবিচারকে প্রতিহত, শৃঙ্খলকে বন্ধনহীন করার মধ্য দিয়ে তাঁর ঐশ্বরিক আগুন জ্বলে উঠেছে বারংবার। যার ফলে বাঙালি জাতি পেয়েছে তাদের বহুল প্রতীক্ষিত নেতাকে, স্বাধীনতাকে।

কবি শামসুর রাহমান শেখ মুজিবকে কাছ থেকে দেখেছেন। ১৯৪৯ সালের মার্চে শেখ মুজিবসহ ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনে নামে। শামসুর রাহমানও সেই দলে ছিলেন। তাঁর জবানীতে সেদিনের স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ছাত্রনেতা মুজিবের নেতৃত্বগুণ। শামসুর রাহমান লিখেছেন, 'শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আমরা কিছু সংখ্যক সাধারণ ছাত্র তখন ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবন ঘেরাও করেছিলাম।...মনে পড়ে, সেদিন দশাসই ঘোড়সওয়ার পুলিশের তাড়া খেয়েছিলাম। একটি বলবান অশ্বের খুরের ঠোকন আর পুলিশের ব্যাটের বাড়ি খেতে খেতে বেঁচে যাই কোনোমতে। দীর্ঘকায় কান্তিমান শেখ মুজিব তাঁর কথা এবং জ্বলজ্বলে দৃষ্টি দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করছিলেন, যোগাচ্ছিলেন সাহস। সেদিন ঘোড়ার পায়ের নিচে পড়ে থেঁৎলে গেলেও হয়তো কোনো খেদ থাকতো না। প্রকৃত নেতার প্রেরণার শক্তি বোধহয় এইরকমই হয়।' শুধু একটি নয়, এমন অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়েই শেখ মুজিব ধাপে ধাপে উঠে এসেছেন বাঙালির হৃদয়ে।

অনেক প্রাজ্ঞজনই যুবক শেখ মুজিবকে দেখে বলেছিলেন, মুজিব নিশ্চয়ই একদিন বড়ো কিছু হবেন। তৎকালীন অনেক রাজনীতিবিদও মুজিবের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের স্ফূরণ ও সম্ভাবনার আলো দেখতে পেয়েছেন। স্বয়ং মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীও তাঁর ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। তিনি তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও মনে করতেন শেখ মুজিব তাঁর নামকে কাজ দ্বারা ছাড়িয়ে যাবেন। একবার সোহরাওয়ার্দী ঢাকা হাইকোর্টের বিখ্যাত আইনজীবী এসআর পালকে বলেছিলেন, 'আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, মুজিব একদিন

জনতার মাঝে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ইতিহাস সৃষ্টি করবে।' গণতন্ত্রের মানসপুত্রের এই ভবিষ্যদ্বাণী যে কতটা সত্য হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মুজিব সত্যি সত্যিই উজ্জ্বল ইতিহাস গড়লেন। দেশ স্বাধীন করলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিকামী অসংখ্য বাঙালির মতো অল্পসংখ্যক বিদেশি নাগরিক ছিলেন, যারা বিশ্বাস করতেন বাঙালিদের আর কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। এই বিশ্বাসীদের দলে অ্যালেন্স গিন্সবার্গদের মতো ছিলেন আমেরিকান মিশনারি জেনিন লকারবি। তিনি তাঁর *অনডিউটি ইন বাংলাদেশ* গ্রন্থে শেখ মুজিবকে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে, 'এমন একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, যে অনগ্রসর বাঙালি জাতিকে মুক্তির আস্বাদ দিবে। তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান।'

বিশেষত ১৯৭১ সাল পরবর্তীতে শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন বিশ্ব নেতাদের চোখে বিস্ময়, ঘোরলাগা এক ব্যক্তিত্ব। তৎকালীন বিশ্ব মিডিয়াগুলোও বঙ্গবন্ধুকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২রা মে *নিউইয়র্ক টাইমসে* প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলা হয়েছিল : 'সাধারণ বাঙালির কাছে তাঁর কাপড় স্পর্শ করা ছিল তাবিজে শুভ ফল পাওয়ার মতো। তাঁর বাক্যই হয়ে উঠেছিল আইন। ধানমন্ডিতে তাঁর বাসা থেকে তিনি সব করছিলেন। সবার সঙ্গেই ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, তাঁর কাছে যাওয়ায় কোনো বাধা ছিল না।...সম্পদ বা পদমর্যাদার দিকে তাঁর কোনো নজর ছিল না, সম্পূর্ণভাবে আন্তরিক ছিলেন জনগণের প্রতি।...প্রতিদানে বাঙালিরাও তাঁকে বিশ্বাস করতেন; তাঁর সততা, আত্মত্যাগ, সাহস ও তাদের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার বিষয়টিও তারা (জনগণ) বিশ্বাস করতেন।'

শেখ মুজিবুর রহমান যে বাগ্মী মানুষ ছিলেন, তা কেবল এদেশের মানুষই নয়, বিশ্বের বাঘা বাঘা মানুষও এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। মুজিবের বাগ্মিতা এজন্য নিরেট যে, তিনি কখনো কোনো বক্তব্যে মানুষকে মিথ্যা আশ্বাস দেননি। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাই বলতেন। যা বলতেন তা অন্তর থেকেই উচ্চারণ করতেন। বঙ্গবন্ধু একজন মৌলিক চিন্তাবিদ, একজন রাজনীতির কবি, শিল্পীমনের অধিকারী বলে পরিচিত। তাই তাঁর কথার প্রভাব সহজেই ঐন্দ্রজালিক মায়ায় ছড়িয়ে পড়ত শ্রোতাদের মনের গভীরে। ফলে তারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতেন বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা। তাঁর বলার দৃপ্ত ভঙ্গি, দৃঢ় অঙ্গীকার বাঙালিদের তৃপ্ত করতে পেরেছিল। তাঁর বাগ্মিতা সম্পর্কে বিশিষ্ট সাংবাদিক, *নিউজ উইক* সাময়িকীর সম্পাদক লোরেন জেনিকন্স লিখেছিলেন, '...একরাশ কাঁচাপাকা চুল, ঝোঁপসদৃশ গোঁফ এবং সতর্ক কালো চোখের অধিকারী মুজিব দশ লক্ষ শ্রোতার সমাবেশে আবেগপূর্ণ বাগ্মিতার উত্তাল ঢেউয়ের মাধ্যমে তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে সক্ষম।' লোরেন জেনিকন্স যে 'আবেগপূর্ণ বাগ্মিতার' কথা বলেছেন, তা যে কেবলমাত্র শেখ মুজিবমুগ্ধরাই জানতেন, উপলব্ধি করতেন তা নয়। বরং শেখ মুজিববিরোধীরাও তাঁর চরিত্র সম্পর্কে, বাগ্মিতা ও বিশ্বাস সম্পর্কে সচেতনভাবেই অবগত ছিলেন। তৎকালীন পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন দিয়ে আসছিল। তাই স্বভাবতই শেখ মুজিব ছিলেন তাদের অপছন্দের ব্যক্তি। কেননা, 'সংকীর্ণ' পাকিস্তান সরকারের চলার পথের অন্তরায় ছিলেন ব্যাপৃত হৃদয়ধারী বঙ্গবন্ধু। এতকিছু সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র তাঁর গুণগুলোর প্রশংসা না করে পারেনি। ১৯৭০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকায় নিযুক্ত কনসাল জেনারেল আর্থার কে ব্লাড পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পাঠানো এক গোপন নথিতে লিখেছিলেন, 'মুজিব সারাজীবনই একজন রাজনীতিবিদ। ১৯৪৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১০ বছর তিনি কাটিয়েছেন পাকিস্তানি জেলে, যার চূড়ান্ত পরিচয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা... মানুষ মুজিবকে ছাঁচে ফেলা কঠিন। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তিনি আত্মবিশ্বাসী, শান্ত, চমৎকার। বেশ ঘুরেছেন তিনি। মঞ্চে তিনি জ্বালাময়ী বক্তা। মুষলধারায় বৃষ্টির মধ্যেও তাঁর বক্তৃতা সাধারণকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারে। দলীয় নেতা হিসেবে কঠিন এবং কর্তৃত্বপরায়ণ, অনেক সময় একগুঁয়ে। বাঙালিদের অভিযোগের কথা বলতে গেলে তিনি হয়ে পড়েন স্বতঃস্ফূর্ত এবং আবেগপ্রবণ।' সুহৃদ হিসেবে প্রায় কাছাকাছি কথা বলেছেন ইয়াসির আরাফাত, 'আপোশহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব আর কুসুম হৃদয় ছিল মুজিব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।'

মূলত মুজিব চরিত্রে আবেগ, বাগ্মিতা, সাহসিকতা ও ত্যাগের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে। যার ফলে তিনি পরিণত হয়েছেন মহানায়কে। মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত এই নেতা সবসময়ই জনগণকে আপন ভেবেছেন। তাদের কষ্টকে নিজের কষ্ট হিসেবে দেখেছেন। অন্যায় ও অপশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ এতই সুউচ্চ ছিল যে, মৃত্যুভয়ও তাঁকে কুণ্ঠিত করতে পারেনি। জেল-জুলুম-নিপীড়নের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠী শেখ মুজিবকে দমাতে চেয়েছে। কিন্তু বাংলার মেহনতি মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠধারকের স্বর থেমে যায়নি। বরং বিরুদ্ধ স্রোতেও তিনি পথ চলেছেন অবিরাম, স্বপ্ন দেখেছেন সোনার বাংলার। তাঁর এবং সাত কোটি মানুষের স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল একাত্তরের যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে। এ কারণেই তিনি মহৎ ও মহান। শ্রীলংকার একসময়কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী লক্ষ্মণ কাদির গামা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেছেন, 'শেখ মুজিব বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী উভয় শ্রেণির মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন। বাংলার মানুষ তাদের ইতিহাসে শেখ মুজিবুর রহমানের চেয়ে জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষিত, বাগ্মী বা প্রাণবন্ত নেতার সাক্ষাৎ পেলেও তাঁর মতো সফল নেতা কেউ ছিলেন না। তিনি বাঙালি জাতির স্বপ্নপূরণ করেছেন, তাদেরকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন।' 'দক্ষিণ এশিয়া গত কয়েক শতকে বিশ্বকে অনেক শিক্ষক, দার্শনিক, দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক, রাজনৈতিক নেতা ও যোদ্ধা উপহার দিয়েছে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সবকিছুকে ছাপিয়ে যান, তাঁর স্থান নির্ধারিত হয়ে আছে সর্বকালের সর্বোচ্চ আসনে।'

তাই বিখ্যাত সাময়িকী *নিউজ উইক* তাঁকে আখ্যায়িত করেছিল 'পোয়েট অব পলিটিক্স' হিসেবে। লেলিন, ফিদেল ক্যাস্ত্রোর মতো বঙ্গবন্ধুও সফল নেতা ছিলেন। সংগ্রামের দিক দিয়ে তিনি তাঁদের মতোই সফল। ফিদেল ক্যাস্ত্রোর কাছে শেখ মুজিব ছিলেন বিশেষ এক নাম। তিনি একবার বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি, তবে শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তি ও সাহসে এ মানুষটি হিমালয়ের সমতুল্য।' মানবতাবাদী মনীষী লর্ড ফেনার ব্রকওয়ে শেখ মুজিবকে আরো একধাপ এগিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, 'জর্জ ওয়াশিংটন, মহাত্মা গান্ধী, ডি ভ্যালেরার চেয়েও শেখ মুজিব এক অর্থে বড়ো নেতা।'

শেখ মুজিবের সাহসিকতা ও ব্যক্তিত্ব কেবল দক্ষিণ এশিয়াতে নয়, সারা বিশ্বেই বিরল। মুজিব এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁর প্রশংসা পাকিস্তানি সেনারা পর্যন্ত করেছিল। '৭১-এর পাকযোদ্ধা মেজর জেনারেল তোজাম্মেল হোসেন মালিক যুদ্ধপরবর্তী তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'বস্তুত শেখ মুজিব দেশদ্রোহী ছিলেন না। নিজ জনগণের জন্য তিনি ছিলেন এক মহান দেশপ্রেমিক।' মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীতে যেসব সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তারমধ্যে মিশরের হাসনাইন হাইকেল অন্যতম। তিনি তাঁর মূল্যায়নে বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরেছেন এভাবে, 'নাসের কেবল মিসরের নন, সারা আরব্য জাতির মুক্তির দূত। তাঁর জাতীয়তাবাদ আরব জনগণের শ্রেষ্ঠ মুক্তিপ্রেরণা। তেমনি শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের নন, সারা বাঙালি জাতির মুক্তিদূত। তাঁর বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাঙালির সভ্যতা ও সংস্কৃতির নব অভ্যুদয়মন্ত্র। মুজিব বাঙালির অতীত ও বর্তমানের শ্রেষ্ঠ মহানায়ক।'

বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের পর বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনের কাজে হাত দেন। তাঁর প্রচেষ্টায় স্বল্প সময়েই বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। তিনি দেশ গঠনের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে মনোযোগী হন। সে সময়ে বিশ্বের অধিকাংশ প্রভাবশালী নেতাই বঙ্গবন্ধুকে সম্মান করতেন। বঙ্গবন্ধু যখনই কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গিয়েছেন তখনই বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিশ্ব নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। ১৯৭৩ সালের আগস্টে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন শেখ মুজিবুর রহমান। সেই সময়ে তাঁর সাথে ছিলেন বাংলাদেশি কূটনীতিক ফারুক চৌধুরী। সেই সম্মেলনে

বিশ্বনেতারা বঙ্গবন্ধুকে কীভাবে গ্রহণ করেছেন তাঁর বর্ণনা ফারুক চৌধুরীর 'আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধু' নিবন্ধে পাওয়া যায়। তাঁর ভাষ্যে, 'অটোয়াতে প্রথমবারের মতো অনেক রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পরিচয় হয়। অস্ট্রেলিয়ার হুইটলাম, জ্যামাইকার মাইকেল ম্যানলি, মালয়েশিয়ার তুন রাজ্জাক, মরিশাসের শিবসাগর রাম গোলাপ, সিঙ্গাপুরের লি কোয়ান ইউ, নিউজিল্যান্ডের নরম্যান ক্লার্ক, শ্রীলংকার শ্রীমাভো বন্দরনায়েকেসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনের জাঁদরেল সব ব্যক্তিত্ব। প্রথম পরিচয়েই মনে হতো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যেন তাঁদের পরিচয় অনেকদিনের। বঙ্গবন্ধুর ব্যবহারের উষ্ণতা ও অমায়িকতায় তাঁদের সবার মনকে ছুঁয়ে যেতে দেখেছি।'

১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু যখন ওআইসি সম্মেলনে যোগ দেন, তখন তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনের মতোই বিশ্বনেতারা ওআইসি সম্মেলনেও বঙ্গবন্ধুকে বিশেষ সম্মান করেন। তোফায়েল আহমেদের লিখনী, 'বক্তা হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের সভাপতি স্বীয় আসন থেকে উঠে এসে বঙ্গবন্ধুকে মঞ্চে তুলে নিয়েছিলেন। পিনপতন নিস্তব্ধতার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রায় ৪৫ মিনিট বক্তৃতার শেষে সভাপতি নিজেই যখন দাঁড়িয়ে করতালি দিচ্ছেন, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বিপুলভাবে করতালি দিয়ে আলিঙ্গন করে অভিনন্দিত করেছেন বঙ্গবন্ধুকে। অভাবনীয় সেই দৃশ্য। নিজ চোখে না দেখলে লিখে বোঝানো সম্ভবপর নয়। বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিশ্বনেতাদের ছিল গভীর শ্রদ্ধা। আন্তর্জাতিক রাজনীতির হিমালয়সম উচ্চতায় আসীন ছিলেন তিনি। আমার মনে পড়ে, অধিবেশনে আগত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা আমাদের কাছে এসে বলেছিলেন, 'সত্যিই তোমরা গর্বিত জাতি। তোমরা এমন এক নেতার জন্ম দিয়েছ, যিনি শুধু বাংলাদেশের নেতা নন, এশিয়ার নেতা নন; তিনি সমগ্র বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা।' এই যে বঙ্গবন্ধুকে এভাবে দেখা এবং তাঁকে সম্মান করা– তো ছিল বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক ব্যাপার। যার জন্য বাংলাদেশ পরবর্তীতে অনেক রাষ্ট্রের কাছ থেকেই বন্ধুত্বসুলভ আচরণ ও সহযোগিতা লাভ করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী দেশ গঠনের কাজে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা করেছেন। ১৯৭২ সালে তিনি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এক ভাষণে বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জনগণের নিকট স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁদের তা এনে দিয়েছেন।' ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বকে এতই সম্মান করতেন যে, তিনি বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন। বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধীর কথোপকথনটি এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হলো :

> ইন্দিরা গান্ধী : এক্সেলেন্সি, আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে আগামী ১৭ মার্চ বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে।
>
> শেখ মুজিব : মাদাম, কেন এই বিশেষ দিন ১৭ মার্চের কথা বললেন?
>
> ইন্দিরা গান্ধী : এক্সেলেন্সি, প্রাইম মিনিস্টার, ১৭ মার্চ হচ্ছে আপনার জন্মদিন!

প্রতিশ্রুতি স্বরূপ ১৯৭৩ সালের ১৭ই মার্চই ভারত বাংলাদেশ থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন শুরু করে। সেদিন ইন্দিরা গান্ধী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বক্তব্যদানকালে বলেন, 'আজকের দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও সুখের দিন বটে। কারণ আজ শেখ মুজিবের জন্মদিন। তিনি হলেন এদেশের মুক্তিদাতা।...শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের বন্ধু।' ভারতের অনেক নেতাই বঙ্গবন্ধুকে 'অহিংস গান্ধীবাদী' নেতা হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন। আবার শুধু ইন্দিরা গান্ধী নন, বিশ্বের অনেক বরেণ্য ব্যক্তিই শেখ মুজিবকে 'বিশ্ববন্ধু' হিসেবে অভিহিত করেছেন। ১৯৭৩ সালে 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এ পদক বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন বিশ্ব শান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশচন্দ্র। তিনি তাঁর বক্তব্যের একপর্যায়ে সেদিন বলেছিলেন, 'শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নন, আজ থেকে তিনি বিশ্ববন্ধুও বটে।'

ফ্রান্সের বিখ্যাত সাহিত্যিক আঁদ্রে মালরো স্বাধীনতার প্রশ্নে বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি মুক্তিবাহিনীর অধীনে একটি দল পরিচালনা করতে চান। এমনকি তিনি একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রশ্ন করেছিলেন–'পৃথিবীর সবচেয়ে পরাক্রমশালী সেনাবাহিনীকে যদি নগ্নপদ ভিয়েতনামীদের হাতে নাজেহাল হতে হয়, তাহলে কি আপনি বিশ্বাস করেন যে ইসলামাবাদের সেনাবাহিনী বারোশ' মাইল দূর থেকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত একটি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামকে পরাভূত করতে সক্ষম হবে?' বাংলাদেশের পক্ষে তিনি বিশ্বদরবারে স্পষ্টভাবে কথা বলেছিলেন। ১৯৭৩ সালে আঁদ্রে মালরোকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। সেসময়ে তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন, 'স্টালিন নয়, হিটলার নয়, মাও সেতুং নয়– গান্ধী ও শেখ মুজিবুর রহমান! যদি জগৎ এখনো না বুঝে থাকে এঁদের মতের মর্মবাণী, তবে সময় এসেছে এ বিষয়ে দৃষ্টি উন্মোচনের।'

১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু নিহত হবার পর আস্তে আস্তে এমন পরিস্থিতি দাঁড়ায় যে, শেখ মুজিবের নাম উচ্চারণ করাও প্রায় 'নিষিদ্ধ' হয়ে যায় যেন। কিন্তু একথা সত্য, জীবিত শেখ মুজিব ও মৃত শেখ মুজিব– উভয়েই সমান শক্তিশালী। শেখ মুজিবকে হত্যা করতে পারলেও তাঁর আদর্শকে হত্যা করতে পারেনি ঘাতকরা। কারণ আদর্শকে হত্যা করা যায় না। আদর্শই বাঁচিয়ে রাখে ব্যক্তিকে। তাই তৎকালীন সময়ে যতই বঙ্গবন্ধুর নাম ও কর্মকে ছাইচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হোক, তা সফল হয়নি। কারণ বঙ্গবন্ধু মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। আমরা সেই 'নষ্ট সময়ে'ও দেখি কারো তোয়াক্কা না করে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক নিঃসঙ্কোচে এক বক্তব্যে বলেছিলেন, 'এই উপমহাদেশের সমগ্র অঞ্চল বা কোনো কোনো বিশেষ অংশের সঙ্গে ধর্ম বা সমাজের শ্রেণিগত কাঠামোর দিক দিয়ে আমাদের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু স্বতন্ত্র পরিচয় রাখার ক্ষেত্রে আমাদের অদম্য ইচ্ছাই এ সবকিছুকে অতিক্রম করেছে। এই আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু এবং এটাই এই বিশেষ মানুষটা আর জনতার মধ্যে গড়ে তুলেছিল এক অবিচ্ছেদ্য সেতুবন্ধ। ...জনতা তাঁকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল। কারণ তাঁর মধ্যে তারা জাতি হিসেবে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখার গভীর ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ দেখেছিল।' এভাবেই বঙ্গবন্ধু ও তাঁর আদর্শ শত প্রতিকূলতার মধ্যেও বেঁচে থাকে এবং বাঁচিয়ে রাখে জাতিকে।

শেখ মুজিবুর রহমান নিজের ভাবনা সম্পর্কে তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, ' একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।' বাঙালিদেরকে নিরন্তর ভালোবাসার কারণেই বঙ্গবন্ধুর পথচলা হয়ে উঠেছিল কণ্টকতায় পরিপূর্ণ, সংগ্রাম ও ত্যাগের মহিমায় উৎকীর্ণ। হুমায়ুন আজাদ মনে করতেন বঙ্গবন্ধু আর সবার মতো রাজনীতি করেননি। তাঁর নীতি জনতার নীতি ছিল। তিনি 'যুগান্তরের রাজনীতি' করেছিলেন। তিনি শৈশব, কৈশোর, যৌবন থেকে বেড়ে উঠেছিলেন ইতিহাস বদলে দেওয়ার জন্য। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় শেখ মুজিব পরিণত হয়েছেন মহানায়কে। সময় যত এগিয়ে যাবে, বাংলাদেশ যতদিন থাকবে, ততদিনই শ্রদ্ধার সাথে, হৃদয়ের গহীন থেকে উচ্চারিত হবে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। কোনো ষড়যন্ত্রই তাঁর নামকে ম্লান করতে পারবে না। কারণ বঙ্গবন্ধু মানেই স্বাধীনতার বাণী, বঙ্গবন্ধু মানেই শ্যামল সবুজ বাংলাদেশ।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন বিষয়ক একান্ত সাক্ষাৎকার

অর্থনীতিবিদ খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ। দেশের খ্যাতিমান ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদ। তিনি ১৯৪১ সালের ৪ঠা জুলাই ফরিদপুর জেলার তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি, এমএসসি পাস করেন এবং ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি পূবালী ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ ২০১১ সালে সরকার কর্তৃক গঠিত পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক তিনি একাধিকবার পুরস্কৃত হয়েছেন। তিনি ২০০০ সাল থেকে শিশু-কিশোর সংগঠন কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলার পরিচালক, নির্বাহী পরিষদের সভাপতি এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দেশের এই বরেণ্য অর্থনীতিবিদ ও প্রথিতযশা ব্যাংকার ছাত্রজীবনে বঙ্গবন্ধুর সাহচর্য লাভ করেছেন। *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: আপনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সাহচর্য লাভ করেছেন, বিষয়টি বিস্তারিত বলবেন কি?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: আমার দাদা খোন্দকার আফছার উদ্দিন আহমেদ শিক্ষা বিভাগের প্রথম রেঞ্জ অফিসার ছিলেন। আমার আব্বা খোন্দকার আহসান উদ্দিন আহমেদ কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে বঙ্গবন্ধুর সিনিয়র ছিলেন। সেই সূত্রে পরিবারের সাথে পূর্ব থেকেই বঙ্গবন্ধুর জানাশুনা ছিল। তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং খুব ছোটোবেলা থেকেই আমাকে আদর করতেন। আমার ছাত্রজীবনে তাঁর রাজনৈতিক সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য হয়। ব্যাংকার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করার পরও যোগাযোগটা অব্যাহত ছিল।

প্রশ্ন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক শোষণ বা বৈষম্য থেকে মুক্তি লাভ করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য শুধু রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন ছিল না। সকল ধরনের অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি দেওয়াটা ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মূলমন্ত্র। সাধারণ মানুষকে সকল ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ থেকে মুক্ত করে উন্নত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তিনি সারাজীবন কাজ করে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন তাঁর বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, স্বাধীনতার আগে যেসব আন্দোলন হয়েছিল তার প্রত্যেকটিতে বেশকিছু অর্থনৈতিক কর্মসূচি ছিল। ১৯৭০ সালে জাতীয় নির্বাচনের আগে প্রকাশিত একটি বিখ্যাত পোস্টারের কথা স্মরণ করতে পারি। পোস্টারের শিরোনাম ছিল, 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন ?' এই পোস্টার স্বাধীনতার আগে আন্দোলনে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। এই বিখ্যাত পোস্টারের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান পর্বতপ্রমাণ অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি তিনি উপযুক্ত পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে বাঙালি সেনা সদস্যের সংখ্যা কম ছিল। অন্যান্য সরকারি চাকরিতে বাঙালিদের সুযোগ দেওয়া হতো না। শ্রমিকদের মধ্যে যারা দেশের বাইরে যেতেন তাদের প্রায় সবাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। এছাড়া পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে দ্রব্যমূল্যের যে অসমতা তাও এতে তুলে ধরা হয়েছিল। পাকিস্তানের রপ্তানি বাণিজ্যে সিংহভাগ জুড়ে থাকা পাট জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখত। সেই পাট পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত হতো। কিন্তু পাট রপ্তানি থেকে অর্জিত অর্থের প্রায় পুরোটাই পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করা হতো। এসব অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রদর্শন করে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমাদের পূর্ব বাংলা হচ্ছে সোনার খনি। কিন্তু শোষণের ফলে সেই পূর্ব বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়েছে। তিনি ন্যায্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার দাবি করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে যে পোস্টার প্রণীত হয়েছিল তা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষের মনে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। মানুষ জানতে পারে যে, তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কীভাবে আমাদের শোষণ করছে এবং অধিকার হরণ করে নিচ্ছে।

প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালে ৬ দফা উত্থাপন করেন । ৬ দফার সাথে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন কতটুকু সম্পৃক্ত ছিল বলে আপনি মনে করেন?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু যুগান্তকারী ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। ৬ দফা দাবির প্রায় প্রতিটিতেই অর্থনৈতিক বিষয় ছিল। যেমন তিনি উল্লেখ করেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান যে যতটা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করবে সংশ্লিষ্ট এলাকাতেই তা ব্যবহার করতে হবে। এক অংশের উপার্জিত অর্থ অন্য অংশে ব্যবহার করা যাবে না। উভয় অংশের আয়-ব্যয়ের হিসাব স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। তিনি আরো বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েন এবং কাগজি মুদ্রা আলাদা হবে, যাতে এক অঞ্চলের অর্থ অন্য এলাকায় পাচার হয়ে যেতে না পারে। এসব কারণে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত সোচ্চার হয়ে ওঠে। তারা কিছুতেই ৬ দফা দাবি গ্রহণ করতে চাইল না।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এই ৬ দফা আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করে। পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বলেছিলেন, ৬ দফা ছিল স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতার মাঝখানে একটি সেতু। আমরা সেতুর ওপারেও থাকতে পারতাম। কিন্তু যখন তারা আমাদের ওপাশে থাকতে দিল না তখন সেতু পেরোনো ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় থাকেনি। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য বিদ্যমান তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

প্রশ্ন: সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু অনেক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সেগুলো কী কী?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: বঙ্গবন্ধু প্রায়ই শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন। যে সমাজে বিত্তবান এবং বিত্তহীনের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য তুলনামূলকভাবে কম থাকবে। এমন একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেখানে সবাই ন্যায্যতার ভিত্তিতে তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ভোগ করতে পারবে। এই বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থার চালিকাশক্তি হিসেবে তিনি সমাজতন্ত্র সন্নিবেশিত করেছিলেন আমাদের সংবিধানে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বঙ্গবন্ধু কিন্তু বামপন্থি ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রকৃত একজন জাতীয়তাবাদী। আমার জানা মতে, বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের কথা বলেছিলেন তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের একটি বড়ো সভায়। আমি নিজে সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। সভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, আমি সমাজতন্ত্র বলতে বুঝি শোষণহীন সমাজব্যবস্থা। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি পন্থা হিসেবে আমি সমাজতন্ত্রকে ব্যবহার করব। তবে এই সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্রের ছাপ থাকবে। অর্থাৎ গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। এটি তাঁর প্রথম কথা।

প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে যে সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন তাতে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এমন সমন্বয় কীভাবে করা সম্ভব হয়েছে?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মিশ্রণটি কেমন তা জানতে হলে আমাদের যেতে হবে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রণীত সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদে। এতে বলা হয়েছে, 'উৎপাদন যন্ত্র এবং উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে–

(ক) 'রাষ্ট্রীয় মালিকানা অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা'।

(খ) 'সমবায় মালিকানা অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়-সমূহের মালিকানা।' এবং

(গ) 'ব্যক্তি মালিকানা অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা'।

আমরা যদি তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক দেশ চীন বা রাশিয়ার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব তাদের সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা একমাত্র রাষ্ট্রের হাতে। এটা হলো তাদের সমাজতন্ত্র। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন তাতে সম্পত্তিতে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি উভয়ের মালিকানাই স্বীকৃত। অর্থাৎ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকলেও সেখানে ব্যক্তিগত সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ রুদ্ধ করা হয়নি। এটি ছিল গতানুগতিক সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে একটি নতুন ধরনের পন্থা। কাজেই বঙ্গবন্ধুর সমাজতন্ত্র বুঝতে হলে সংবিধানের এই ধারাটি বিবেচনায় রাখতে হবে।

সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে, 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দান করা।' একই সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯-এর (১)–এ বলা হয়েছে,'রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা সৃষ্টি করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবে'। অনুচ্ছেদ ২০-এর (১)–এ বর্ণিত হয়েছে, 'প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতা অনুসারে এবং প্রত্যেকের কর্মানুযায়ী এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকেই স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন'। সংবিধানে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জীবনধারণসহ সকল প্রকার মৌলিক অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন: শহুরে ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা কেমন ছিল?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ এবং গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের ব্যবস্থাকরণ, কুটির ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষার বিকাশের অঙ্গীকার অন্যতম। এসবই বঙ্গবন্ধুর শোষণহীন সমাজব্যবস্থা তথা সংস্কারকৃত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রূপরেখা। আগেই বলেছি,

১৯৭৩, জাতীয় সংসদে বক্তব্য দিচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সংবিধানের কিছু ধারায় বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। বঙ্গবন্ধু যে সামান্য কয়েক বছর রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন ছিলেন তখন তিনি তাঁর এই অর্থনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছিলেন।

প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধু যে কৃষি বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য কী ছিল?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, বাংলাদেশ হচ্ছে একটি কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন এবং ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হলে কৃষির ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। ১৯৭৩ সালে তিনি কৃষির উন্নতির জন্য কৃষি বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। সেই কৃষি বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল, বাংলাদেশে যেন কোনো পতিত জমি না থাকে। প্রতি ইঞ্চি জমি যেন চাষের আওতায় নিয়ে আসা যায়। এজন্য বঙ্গবন্ধু কৃষি মন্ত্রণালয়কে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাজিয়েছিলেন। আমার পরিষ্কার মনে পড়ছে, ধানমন্ডিতে তখন একতলা-দোতলা বাড়িই বেশি ছিল। অধিকাংশ বাড়িতেই প্রায় অর্ধেক জমি পতিত পড়ে থাকত। বঙ্গবন্ধুর কৃষি বিপ্লবের ডাকের পর দেখা গেল প্রত্যেকটি বাড়িতে নানাধরনের ফল অথবা সবজির বাগান গড়ে উঠেছে। তখন ধানমন্ডির রাস্তাগুলো খুবই সরু ছিল। বাড়ির দেয়াল থেকে রাস্তা পর্যন্ত বেশকিছু জায়গা খালি থাকত। এই খালি স্থানে বহিরাগত কে বা কারা ধান রোপণ করেছিল। ধানমন্ডিতে ধান চাষ হওয়ার কথা আমরা বইতে পড়েছি। কিন্তু বাস্তবে তা প্রত্যক্ষ করেছি ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর কৃষি বিপ্লবের ডাক দেবার পর। আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো সেনানিবাস। সেনানিবাসে বেশকিছু পতিত জমি ছিল। সেখানে সৈনিকরা স্ব-উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের ফসল রোপণ করেছিল। দেখতে দেখতে পুরো বাংলাদেশ, গ্রাম এবং শহর যেন সবুজে ভরে উঠল। মূলত তখন থেকেই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি শুরু হলো।

প্রশ্ন: অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তাই না?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: ঠিক তাই। কৃষিতে গুরুত্বারোপ করেই বঙ্গবন্ধু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তিনি ভাবলেন, বাংলাদেশ হচ্ছে একটি ছোটো দেশ। আমরা যদি বিভিন্ন এলাকাকে উন্নত সড়ক যোগাযোগের মাধ্যমে সংযুক্ত করে ফেলতে পারি তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সহজ হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গকে তিনি উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এটা শেষ করে যেতে পারেননি। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথেই পরে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশে এক ধরনের বিপ্লব সাধিত হয়।

প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু চূড়ান্ত পর্যায়ে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর এই দ্বিতীয় বিপ্লবকে নানাভাবে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল সমবায় খাতকে বিকশিত করা। তিনি বলেছিলেন, যেহেতু রাষ্ট্র খুব ভালো ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে না, তাই কিছু বিষয় রাষ্ট্রের হাতে থাকলেও বেশিরভাগ কাজ পরিচালিত হবে সমবায়ের ভিত্তিতে। মানুষ একত্রিত হয়ে সমবায়ের ভিত্তিতে কাজ করবে। তারা যদি সমবায়ের ভিত্তিতে কাজ করে তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন সহজতর হবে। তিনি গ্রামগঞ্জের জমি সমবায়ের ভিত্তিতে চাষাবাদের স্বপ্ন দেখেছিলেন। যাতে আইলের কারণে যে বিশাল এলাকা চাষের বাইরে থেকে যায় তা রোধ করা যায়। জমিতে কোনো আইল থাকবে না। সবাই সমবায়ের ভিত্তিতে চাষাবাদ করবে এবং উৎপাদিত ফসল থেকে নিজেদের জমির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে ফসলের ভাগ পাবে। রাষ্ট্র এই সমবায় সৃষ্টি করবে না, ব্যক্তিরাই সমবায় সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্র সেখানে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করবে।

প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধু নিয়ম করেছিলেন কারো ১০০ বিঘার বেশি জমি থাকতে পারবে না। এ সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: গ্রামের মানুষের মাঝে যাতে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পায় সে লক্ষ্যে কাজ করছিল বঙ্গবন্ধুর সরকার। জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। কেউই ১০০ বিঘার বেশি জমি নিজ দখলে রাখতে পারবে না। এছাড়া তখন ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেওয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু সমাজের সকল মানুষকে একই ছায়াতলে এনে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলেন।

গ্রামে মানুষের যে বসতবাড়ি আছে বঙ্গবন্ধু তার ব্যবহার নিয়েও ভেবেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, অনেকেই বিশাল বাড়ি তৈরি করে বসবাস করছেন। তারা হয়ত সেখানে গাছপালা লাগাচ্ছে কিন্তু বাড়িগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন। বাড়িগুলো বিচ্ছিন্ন হবার ফলে প্রায়শই চুরি-ডাকাতির মতো ঘটনার শিকার হচ্ছে। এছাড়া এতে মানুষের মাঝে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তাই তিনি গুচ্ছগ্রামের মতো প্রকল্পের চিন্তাভাবনা করেছিলেন। অর্থাৎ পুরো গ্রামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস না করে গ্রামেরই একটি অংশ বসবাসের জন্য নির্বাচন করা হবে। সেখানে গ্রামের অধিবাসীরা থাকবেন। তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। বসবাস স্থানে উন্নত সেনিটেশন ব্যবস্থা থাকবে। এতে গ্রামে বসবাসকারী মানুষের জীবন-মান উন্নত হবে। তারা তুলনামূলক ভালো পরিবেশে উন্নত জীবনযাপনে সক্ষম হবে। বসবাসের জন্য যে ঘর নির্মাণ করা হবে তা সম্ভব হলে পাকা করা হবে।

প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধু দেশের সকল কলকারখানা তথা উৎপাদন যন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিলেন। এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: স্বাধীনতার পর শুধু উৎপাদন যন্ত্রই নয়, দেশের ব্যাংক-বীমা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়েছিল। তখন যারা প্লানিং কমিশনের সদস্য, এমনকি চেয়ারম্যান ছিলেন আমি তাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে, বঙ্গবন্ধু তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন পরিত্যক্ত কলকারখানা নিয়ে আমরা কী করব? কারণ দেশের বেশির-ভাগ কলকারখানার মালিক ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। তাদের অনেকেই স্বাধীনতার পর এমন কী স্বাধীনতা যুদ্ধ চলার সময় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। তাদের ফেলে যাওয়া এসব কলকারখানা ম্যানেজ করার ব্যাপার ছিল। প্লানিং কমিশনের সদস্য এবং চেয়ারম্যানই বঙ্গবন্ধুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন পরিত্যক্ত শিল্প-কারখানাগুলোকে আপাতত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য। এর বিকল্প ছিল স্থানীয় বাঙালিদের কাছে এসব কলকারখানা বিক্রি করে দেওয়া। কিন্তু এসব কলকারখানা ক্রয় করার মতো টাকা বাঙালিদের হাতে ছিল না। এছাড়া এগুলো ভালোভাবে পরিচালনা করার মতো দক্ষ লোকের অভাব ছিল। তাই সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে এসব কলকারখানা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়েছিল। একই সঙ্গে তিনি এটাও ঘোষণা করেছিলেন যে, আস্তে আস্তে এসব প্রতিষ্ঠান আমরা বিরাষ্ট্রীয়করণ করব। তিনি এই কাজটি শুরুও করেছিলেন। তখন ঢাকার বেশিরভাগ দোকানপাটের মালিক ছিলেন অবাঙালি। এসব দোকানও রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করা হয়েছিল। তিনি প্রথমেই রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করা দোকানপাট ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দিলেন। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সবচেয়ে প্রবীণ বাঙালি কর্মচারী বা ম্যানেজারের কাছে প্রতিষ্ঠানের মালিকানা হস্তান্তর করা হয়। দোকানের মূল্য তার জন্য ঋণ হিসেবে থাকবে। আস্তে আস্তে দোকানের মুনাফা থেকে ঋণ শোধ করবে। এরপর তিনি তুলনামূলকভাবে ছোটো শিল্পগুলোকে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করা শুরু করলেন। শেষ পর্যায়ে বড়ো বড়ো শিল্প-কারখানা ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করার কথা ছিল। কিন্তু সেই সুযোগ তাকে দেওয়া হলো না। তিনি গণমানুষের মালিকানায় বিশ্বাস করতেন। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর আমলে যেসব শিল্পনীতি প্রণীত হয়েছিল তাতে রাষ্ট্রীয় খাতের পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতকেও উৎসাহিত করা হয়েছিল। যৌথ উদ্যোগে বিদেশি বিনিয়োগ আহরণকে উৎসাহিত করা হয়েছিল।

প্রশ্ন: আমরা জানি স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর আমলে এক বছর সর্বোচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। সেই প্রবৃদ্ধির হার এখনো অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে যদি কিছু বলেন?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: বঙ্গবন্ধু যদি বেঁচে থাকতেন এবং তিনি যেভাবে গণমানুষের উন্নয়নে কাজ শুরু করেছিলেন তা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ অনেক উন্নত থাকত এবং আমরা অনেক আগেই উন্নত দেশের কাতারে চলে যেতাম। কারণ বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষকে যেভাবে উন্নয়নে সম্পৃক্ত হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন তা আর কারো পক্ষে সম্ভব

হয়নি। বঙ্গবন্ধু সব সময় গণমানুষের অর্থনীতির কথা ভাবতেন। কিন্তু তাঁকে হত্যার পর তো আর গণমানুষের অর্থনীতি রইল না। ১৯৭৫ সালের পর থেকে শুরু হলো লুটপাটের অর্থনীতি। ব্যাংকের অর্থ লুটপাট হতে থাকল। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কলকারখানা বেসরকারি খাতে হস্তান্তরের নামে দলীয় লোকজন এবং ক্ষমতাসীনদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে 'পানির দরে' বিক্রি করা শুরু হয়। মূলত এ কারণেই '৭৫-পরবর্তী সময়ে দেশের অর্থনীতি মন্থর হয়ে গিয়েছিল। '৮০ দশকে এই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির মন্থরতা মারাত্মক আকার ধারণ করে। শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার তিন শতাংশেরও নিচে নেমে আসে।

প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা এখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত দেশের অর্থনীতিতে আবার প্রবৃদ্ধি বেড়েছে । এ সম্পর্কে কিছু যদি বলেন–

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: আশির দশকের এ অর্থনৈতিক মন্থরতা দীর্ঘ দিন চলে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের অর্থনীতি আবারো ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পর উন্নয়নের ধারা শুরু হয়েছিল। মাঝখানে এই উদ্যোগ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। ২০০৯ সালে পুনরায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পর অর্থনৈতিক উন্নয়নের নব যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতি, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের জন্য 'রোল মডেল'- এ পরিণত হয়েছে। গত প্রায় এক দশক ধরে বাংলাদেশ গড়ে সাড়ে ৬ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ইতোমধ্যেই দেশের ২/১টি ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে। অন্তত দুটি সমজাতীয় বিশেষায়িত ব্যাংক একীভূত করা হয়েছে। শিল্প-কারখানা এখন আর রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেই বললেই চলে। ব্যক্তিগত সৃজনশীলতাকে বিকশিত করার সব ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নতুন মাত্রা পেয়েছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। আগামী ২০৪১ সালের বাংলাদেশকে একটি কার্যকর উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ।

প্রশ্ন: বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর যেভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হয়েছিল তা '৭৫-পরবর্তী সময়ে ধরে রাখা যায়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গণতন্ত্র এবং সরকারের ধারাবাহিকতা কতটা প্রয়োজন–বলবেন কি?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা প্রয়োজন। আমরা যদি সামরিক শাসনামল এবং গণতান্ত্রিক শাসনামলকে পাশাপাশি রেখে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে, সামরিক শাসনামলে অর্থনীতির গতি অনেকটাই মন্থর হয়ে পড়ে। কারণ সামরিক শাসনামলে অর্থনীতি নানারকম চাপের মধ্যে থাকে। মানুষও কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে সাহস পায় না। অবশ্য আপনি যদি বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্রই একমাত্র পথ কি-না তাহলে আমি কিছুটা দ্বিমত প্রকাশ করব। চীন একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এতটাই বিস্ময়কর যে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও হারিয়ে দিয়েছে। জাপান দীর্ঘ ৪৪ বছর ধরে বিশ্ব অর্থনীতিতে দ্বিতীয় শীর্ষ শক্তি হিসেবে অবস্থান করছিল। সেই জাপানকে পেছনে ফেলে চীন দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মালয়েশিয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মাহাথির মোহাম্মদের কঠোর শাসনের মাঝে থেকে মালয়েশিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করেছে। কাজেই এটা বলা বোধ হয় ঠিক হবে না যে, শুধু গণতান্ত্রিক শাসনামলেই অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব। তবে এটা বলা যায় যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

প্রশ্ন: দেশে বেশ কয়েক বছর ধরেই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা মন্থরতা বিরাজ করছে। এর কারণ কী এবং কীভাবে এ থেকে উত্তরণ সম্ভব বলে মনে করেন?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: বাংলাদেশ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি দেশ। ১৬ কোটি মানুষের দেশে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে আগ্রহী হবে–এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমানে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে কিছুটা ধীরগতি লক্ষ করা যাচ্ছে, তার কারণ ভিন্ন। বাংলাদেশে শিল্প-কারখানা স্থাপনের উপযোগী জমির খুব অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বড়ো একটি শিল্প স্থাপনের জন্য যে বিপুল জমির প্রয়োজন তা একত্রিত করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কয়েক বছর আগে একজন জাপানি উদ্যোক্তা বাংলাদেশে বড়ো ধরনের বিনিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত জমি না পাওয়ায় তিনি ফিরে যেতে বাধ্য হন। সরকার এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে শিল্প স্থাপনযোগ্য জমির অভাব অনেকটাই পূরণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সরকার নিজস্ব উদ্যোগে এসব অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করে দেবে। পরবর্তীতে উদ্যোক্তারা এখানে শিল্প স্থাপন করতে পারবেন। তবে আমি জমির চেয়েও আর একটি সমস্যাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাই, তাহলো জ্বালানি সমস্যা। শিল্পকারখানা স্থাপন করতে গেলেই গ্যাস এবং বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে। গ্যাস সংযোগ তো এখন দেওয়াই যাচ্ছে না। বিদ্যুৎও বেশ সীমিত আকারেই দেওয়া হচ্ছে। তবে আশার কথা এই যে, সরকার বিগত অর্থবছরের বাজেটে এবং চলতি অর্থবছরের বাজেটে বিপুল পরিমাণ অর্থ এ খাতের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন। আগের তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা অনেক বেড়েছে। প্রকৃত উৎপাদনও ব্যাপকভাবে বেড়েছে। কিন্তু চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে । ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে বিদ্যুতের সরবরাহ রাতারাতি বাড়ানো সম্ভব নয়। ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, আগামী ৩ থেকে ৪ বছরের মধ্যে বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে একটি ভারসাম্য আনা সম্ভব হবে। স্থানীয়ভাবে গ্যাসের জোগান হয়ত তেমন একটা বাড়ানো সম্ভব নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে গ্যাস আমদানি করতে হতে পারে। আমি মনে করি, মূল্য কিছুটা বেশি হলেও আগামী ৪/৫ বছরের মধ্যে জ্বালানি সহজলভ্য হবে। তখন শিল্পের বিকাশ আরো দ্রুততর হবে।

প্রশ্ন: ২০৪১ সালের মধ্যে অর্থাৎ স্বাধীনতার ৭০ বছর পূর্তিতে আমরা বাংলাদেশকে একটি উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করতে রাষ্ট্রীয়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। বর্তমানে দেশের অর্থনীতি যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে এই অর্জন কি সম্ভব হবে?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: বাংলাদেশ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে চলেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থাও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করেছে। কাজেই বাংলাদেশ আগামীতে বিশ্ব দরবারে একটি শক্তিশালী অর্থনীতি হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে এতে কোনোই সন্দেহ নেই। আমি মনে করি, আমরা যদি আগামীতে বিদ্যুতের জোগান চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়াতে পারি, প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়াটা অবশ্যই সম্ভব বলে আমি মনে করি। এছাড়া পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের পর দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে কর্মচাঞ্চল্যের সূচনা হবে। এতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার আরো অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন: নতুন প্রজন্মের জন্য কোনো পরামর্শ আছে কী?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: আমরা ক্রমেই আমাদের ঐতিহ্যবোধ ও সুনীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছি বলে মনে হয়। পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। পাশাপাশি নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্যবোধ যেন হারিয়ে না যায় সে বিষয়ে নতুন প্রজন্মকে সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে।

প্রশ্ন: আপনি *সচিত্র বাংলাদেশ* পড়েন কি-না? *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর জন্য কোনো পরামর্শ আছে কী?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: নিয়মিত পড়া হয় না। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকাটি দিলে সরকারের প্রচারের জন্য ভালো হবে মনে করি।

[সচিত্র বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাবন্ধিক এম এ খালেক ও সচিত্র বাংলাদেশ-এর সম্পাদক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন। এসময় কবি জাকির হোসেন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।]

প্রতিবেদন: এম এ খালেক, উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিডিবিএল, মতিঝিল, ঢাকা।

নিবন্ধ

শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডে ৭ই মার্চ-এর ঐতিহাসিক ভাষণ ও আমাদের করণীয়

মালিক খসরু

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

যে কয়টি হাতে গোনা ভাষণ চিরস্থায়ী আসন অলংকৃত করে বিশ্ব সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে যুগ যুগ ধরে মানব জাতি, দেশ, সামাজ, রাজনীতিকে প্রভাবিত করার নিয়ামক হিসেবে আবির্ভূত হয়ে মানব মুক্তির পথ নির্দেশনা দিয়ে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে অবদান রেখে চলেছে তার মাঝে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চ ১৯৭১ ভাষণটি এক কথায় অনবদ্য, অসামান্য ও অনন্য।

ভাষণটি হয়ে উঠেছে একজন ক্ষণজন্মা নেতার সারা জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ ও সফল নেতৃত্বের শ্বেতপত্র। ভাষণটি বাঙালি জাতিকে একটি প্লাটফর্মে দাঁড় করিয়ে মোক্ষম সময়ে অত্যাচারী শাসকের সাম্রাজ্যবাদী বঞ্চনার বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে জীবন বাজি রেখে সশস্ত্র প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনন্ত প্রেরণা, অদম্য সাহস ও শক্তির উৎস হয়ে উঠেছে। সমগ্র বাঙালি জাতিকে জাগ্রত করতে এর নেই কোনো তুলনা।

ভাষণটি নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। লক্ষ করলে দেখা যায়, ভাষণটি হয়ে উঠেছে বাঙালি জাতির আবেগের সম্মোহনী আকর। আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত নিউজ উইক সাপ্তাহিক ৫ই এপ্রিল, ১৯৭১ সংখ্যার কভার স্টোরি করে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মূল্যায়নে তাঁকে অভিনন্দিত করে রাজনীতির কবি বা Poet of Politics অভিধায় ভূষিত করেছে। অনবদ্য, তীক্ষ্ণ, সুবিন্যস্ত ছন্দবদ্ধ শব্দচয়নের মাধুর্যে ভরা ৭ই মার্চের ১১০৮ টি শব্দের প্রায় ১৯ মিনিটের 'অলিখিত' অর্থাৎ এক্সটেম্পো ভাষণের বিশ্ববরেণ্য অমর রাজনৈতিক কবিকে আমরা কীভাবে দেখি? বলার অপেক্ষা রাখে না, ৭ই মার্চের ভাষণ জনগণের জেগে ওঠা এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র। ৫৬ হাজার বর্গমাইল চৌহদ্দির মাঝে তাঁকে আবদ্ধ করে ফেলা হবে নিঃসন্দেহে গুরুতর অন্যায়, অবিচার ও জাতীয় ব্যর্থতা। শিক্ষিত সমাজ ও রাজনীতির নেতা-কর্মীগণ সাধারণত ভাষণটির শেষ দুটি চরণ আউড়িয়ে ও রেকর্ড বাজিয়ে সংক্ষিপ্ত দায় সারেন! ভাষণটির প্রত্যেকটি উচ্চারিত শব্দের সুদূরপ্রসারী আবেদনের তাৎপর্য প্রজন্মের কাছে তুলে ধরে ২৩ বছরের পাকিস্তানি শাসকের অনাচার, অত্যাচার, নিপীড়ন, শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশদ্রোহী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হয়ে রাজনীতির কন্টকাকীর্ণ পাহাড় ডিঙিয়ে বঙ্গবন্ধু কীভাবে অনলবর্ষী ভাষণ প্রদান করে জাতিকে প্রস্তুত করে স্বাধীনতা সংগ্রামের বেদিমূলে নিবেদিত করেছেন সেই প্রলম্বিত ইতিহাস হউক ৭ই মার্চের ভাষণ চর্চা ও মূল্যায়নের সারমর্ম।

৭ই মার্চ ১৯৭১, রমনা রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দিচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সাড়ে সাত কোটি পরাধীন বাঙালি জাতিকে মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে একটি প্লাটফর্মে এনে দাঁড় করার ঐতিহাসিক দিন ৭ই মার্চ। এই ভাষণে মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতার রূপরেখা পেয়ে জাতি সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে চলে ২৬শে মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার পানে।

১৮৩৭ সালে বিখ্যাত আমেরিকান পণ্ডিত, কবি, বক্তা Ralph Waldo Emerson প্রদত্ত 'The American Scholar' বক্তব্য অবলম্বনে ৭ই মার্চের ভাষণটিকে 'Intellectual Declaration of Independence of Bangladesh' হিসেবে ঘোষণার দাবি রাখে। এমার্সনের– 'Speech is power; speech is to persuade, to convert, to compel'. কথার সাথে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মিল শতভাগ।

অন্যদিকে বিখ্যাত স্কটিশ দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, তুখোড় রম্য লেখক, Thomas Carlyle-এর কথা, 'the key role in history lies in the actions of the 'Great Man.' 'History is nothing but the biography of the Great Man.' বস্তুত বঙ্গবন্ধুর ঘটনাবহুল জীবন এবং ৭ই মার্চের ভাষণ তাঁকে করে তুলেছে ইতিহাসের চালিকাশক্তি, মহামানব। টমাস কার্লাইলের 'Every noble work is at first impossible.' কথার আলোকে আরো বলা যায়, বঙ্গবন্ধু সেই ক্ষণজন্মা পুরুষ যিনি অসম্ভবকে সম্ভব করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটিয়েছেন।

সারাবিশ্বে যুগান্তকারী স্মরণীয় ভাষণগুলোর মধ্যে যে কয়টি ভাষণ সর্বাধিক আলোচিত হয়ে মানবমুক্তির চালিকাশক্তির দিক নির্দেশক হয়ে উঠেছে তার মধ্যে সর্বাগ্রে যেটি আলোচনায় উঠে আসে তা হলো মার্ক এন্টোনির স্পিচ। ইংরেজি সাহিত্যের দিকপাল উইলিয়াম সেক্সপিয়ার আজ থেকে ৪১৮ বছর আগে ১৫৯৯ সালে বিখ্যাত বিয়োগান্ত *জুলিয়াস সিজার* নাটকে মার্ক এন্টোনির স্পিচকে চিরস্থায়ী আসনে বসিয়েছেন। মহাবীর জুলিয়াস সিজারের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে থাকা কুচক্রী, বিশ্বাসঘাতক, ক্ষমতা লিপ্সু খলনায়ক ব্রুটাসের ষড়যন্ত্র উদঘাটন করতে মার্ক এন্টোনি বিদ্যমান জটিল পরিস্থিতিতে যেভাবে এগিয়ে এসে, সিজারের নির্মম হত্যাকাণ্ডই শুধু নয়, বীর সিজারের মহান-চরিত্রের যে চিত্র ভাষণের মাধ্যমে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে অঙ্কন ও উপস্থাপন করে বিদ্যমান পরিস্থিতির মোড় সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, তা সর্বকালের জন্য শিক্ষনীয় দৃষ্টান্তে পরিগণিত হয়েছে। খল রাজনীতির ক্রুর রূপ কতটা ভয়ংকর হতে পারে তা বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচিত হয়েছে। আমরা রাজনীতিতে সিজার চাই। চাই মার্ক এন্টোনির প্রজ্ঞা।

লক্ষ করলে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারী হাতিয়ার ও শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু ভাষণের আবেদন দেশের সীমা অতিক্রম করে সকল যুগে, সকল দেশের, সকল জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার ম্যাগনাকার্টার রূপ পরিগ্রহ করে আবির্ভূত হয়নি, যদিও ভাষণটি বিশ্বের নিপীড়িত মানুষকে দিতে পারে মুক্তি ও স্বাধীনতার দিক নির্দেশনা ও প্রেরণা।

জুলিয়াস সিজারের নির্মম হত্যাকাণ্ডের সাথে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের মিল কাকতালীয়ভাবে হলেও এতটা যে, বলে শেষ করা যাবে না। ক্ষমতার মধ্যগগণে বিচরণ ও অবস্থানকালে রোমান ও বাঙালি জাতির দুই মহান নেতা বিশ্বাসঘাতকের উচ্চাশার বলী হয়েছেন! ব্রুটাস ছিলেন সিজারের বন্ধু। আর বঙ্গবন্ধুর হত্যার নীলনকশার নায়ক খন্দকার মুশতাক ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ অনুচর। সময় প্রমাণ করেছে মুশতাক অনুচর নয় ছিলেন 'চর'। আমাদের মানতেই হবে তোষামোদে পারদর্শী মুশতাক বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি এড়িয়ে আগাগোড়াই চরের 'অনু' হয়েই থেকেছেন।

সিজার মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেন, 'You too Brutus' অর্থাৎ 'ব্রুটাস তুমিও'। মুশতাক নেপথ্যে থেকে হত্যা ষড়যন্ত্রের কলকাঠি নেড়েছিলেন ব্রুটাসের মতো সরাসরি অস্ত্র হাতে নিয়ে নামেননি। যদি নামতেন তাহলে বঙ্গবন্ধুও তাকে বলতেন, মুশতাক, দুধ-কলা দিয়ে তোমাকে পুষেছি। তুমি বিষধর সাপ হয়ে আজ আমাকে মরণকামড় দিতে এসেছ? তবে যে ঘাতক দল ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের 'অরক্ষিত' বাড়িতে প্রবেশ করে বঙ্গবন্ধুর মুখোমুখি হয়েছিল তাদের শুনতে হয়েছে বঙ্গ-শার্দুল মুজিবের গর্জন, 'তোরা কী চাস'? তারপর গর্জে ওঠে হত্যাকারীর বুলেট। বিদীর্ণ হয় বঙ্গবন্ধুর বক্ষ। বিদীর্ণ হয় সবুজ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ-দেহ নিঃসৃত রক্তে সয়লাব হয় সারাদেশ। নিথর বাংলাদেশ-দেহ পড়ে রয় ভূতলে!

আমরা আজ বঙ্গবন্ধুর 'আদর্শের নির্ভেজাল অনুসারী' হয়ে যেমনি আলীবর্দী খাঁর উদ্দেশে বাংলার অধিপতি সিরাজউদ্দৌলা বলেছিলেন, 'তোমার উপদেশ আমি ভুলিনি, জনাব...' তেমনি অনেকে উচ্চ কণ্ঠে মুখে ফেনা তুলে বলেন, 'বঙ্গবন্ধু, আমরা তোমাকে ভুলিনি'! কিন্তু একজন এন্টোনি হয়ে কি কেউ ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে মার্ক এন্টোনির কথা 'ফ্রেন্ডস, রোমানস, কান্ট্রি মেন লেন্ড মি ইওর ইয়ারস। আই কাম ট্যু বারী সিজার নট ট্যু প্রেজ হিম' কথার অনুকরণে কেউই বুক ফুলিয়ে, ডাক দিয়ে বলতে পেরেছেন, 'দেশবাসী, ভাইয়েরা আমার', আসুন সকলে মিলে জাতির পিতার হত্যাকারীদের প্রতিহত ও পরাজিত করি। প্রতিশোধ নিই'। নেতৃত্ব শূন্যতায় ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ জাতি কুচক্রীদের হাতে পরাজিত হয়েছিল। এই পরাজয়ের গ্লানি চিরদিন বাঙালি জাতিকে পেছন থেকে তাড়া করে ফিরবে। এই ব্যর্থতার দায় আমরা কিছুতেই খণ্ডাতে পারি না।

পাশাপাশি আমরা এও দাবি করতে পারি না, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ কেউই করেননি। আমরা অন্তরে ঘৃণা জানিয়েছিলাম কিন্তু প্রকাশ্য অবস্থান নিতে পারিনি। কিছুটা বিলম্বে হলেও কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে অনেক তরুণ প্রতিবাদী হয়ে বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিশোধ নিতে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। যদিও তাঁদের প্রতিরোধ শেষ পর্যন্ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় তথা ভূ-রাজনীতির কারণে সফল হয়নি, তবুও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রবে আদর্শের পেছনে ছোটা প্রতিবাদী ত্যাগী মানুষদের কথা। তাঁদের ত্যাগ জাতিকে কিছুটা হলেও ভারমুক্ত করেছে। 'দায়মুক্তি' দিয়েছে বলা যাবে না কারণ 'দায়মুক্তি' বলতেই যেন বুঝায় বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের রক্ষাকবচ!

নবাব সিরাজের কথা ছোটো কলেবরে আলোচিত হয়েছে। ইংরেজের ষড়যন্ত্রে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার বলী হয়েছিলেন নবাব সিরাজ। কী পেয়েছিল মীরজাফর ও ঘাতক মুশতাক? কিছু যে পায়নি তা নয়। বিশ্বাসঘাতকতা আর মীরজাফর পরিণত হয়েছে পরস্পরের পরিপূরক! মীরজাফরের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হতে সময় নেয়নি। তেমনি মুশতাক মাত্র ৮৩ দিন পরে ক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়ে চিরদিনের মতো নিক্ষিপ্ত হন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। সংক্ষেপে বলা যায়, 'দ্যাট ওয়াজ দ্য অ্যান্ড অব সলোমান গ্রান্ডি'!

ফিরে আসা যাক বিশ্ব ভাষণ ভাণ্ডারে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের ভাষণ

নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, গবেষণার শেষ নেই। কোনো ভাষণের স্থায়িত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হয়ে থাকে বহুবিধ বিষয়ের আলোকে। ভাষণের মর্মার্থ নির্দিষ্ট শ্রেণিপেশার মানুষ, জাতি ও দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সময়, কাল, যুগের বাহন হয়ে মানব জাতির বৃহত্তর কল্যাণের নিয়ামক হয়ে উঠার চরিত্র অর্জন করে স্থায়িত্ব, শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করে থাকে।

এই বিচারিক মানদণ্ডে বঙ্গবন্ধুর দুর্জয় নেতৃত্ব ও ৭ই মার্চের ভাষণের আবেদন বিশ্বের দেশে দেশে নিপীড়িত, শোষিত, মুক্তিকামী মানুষের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। তিনি হয়ে উঠেছেন 'পোয়েট অব পলিটিক্স।' এই পরিচিতি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার অবকাশ নেই। এখন আমাদের সামনে সুযোগ এসেছে রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধুর কবিতাটির মর্মার্থ বিশ্বের প্রধান ভাষাভাষী এবং উন্নত বিশ্বের দেশে দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার। এজন্য দুটি উপমা কাজে লাগানো যেতে পারে।

এক. আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ এড্রেস

দুই. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' যেভাবে পরিচিতি দিয়ে বিশ্ব মাত করেছিল সেই পথ অনুসরণ করা।

২রা অক্টোবর ১৯৭৪: যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মারক সম্মাননা দেওয়া হয়

প্রথমে আসা যাক, ৭ই মার্চের ভাষণের সাথে গেটিসবার্গের তুলনা পর্বে। পশ্চিম বিশ্বের গণতন্ত্র চর্চায় ১৯শে নভেম্বর, ১৮৬৩ গেটিসবার্গ সমাধিক্ষেত্রের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের দুই মিনিট কয়েক সেকেন্ডের ভাষণের প্রবল প্রভাব অনস্বীকার্য। আমাদের দেশে গণতন্ত্র চর্চায় লিংকনের 'গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল, বায় দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল' মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে। স্কুলে ছাত্রাবস্থায় আমাদের পাঠ্য ছিল গেটিসবার্গ এড্রেস। এড্রেসটি মুখস্থ করা আমাদের জন্য ফরজ ছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণটিকে আমরা পাঠ্য হিসেবে অষ্টম শ্রেণি তদূর্ধ্ব ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে মুখস্থ করা বাধ্যতামূলক করতে নিশ্চয়ই পারি।

এখন গেটিসবার্গ এড্রেসের কিছু ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে অতঃপর এর আলোকে পাঠকই নির্ধারণ করবেন উভয়ের তুলনা কোন ক্ষেত্রে কতটা যুক্তিযুক্ত!

আগেই বলেছি বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। গেটিসবার্গ এড্রেস বিষয়ে গবেষক, লেখক ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টে দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ডের সদস্য দানিয়েল হান্নানের (Daniel Hannan) সাম্প্রতিক (৮ই মার্চ ২০১৫) আমেরিকা ও কানাডা থেকে যুগপথ প্রকাশিত '*How we Invented Freedom*' গ্রন্থটি নতুন তথ্যের জোগান দিয়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ ভাষণ সম্পর্কে লিখেছেন, '150 years ago today, Abraham Lincoln praised 'government of the people, by the people, for the people' – but the words were not his.....'

তিনি প্রবন্ধটি লন্ডনের বিখ্যাত *দি টেলিগ্রাফ* পত্রিকার ৮ই মার্চ ২০১৫ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। প্রবন্ধে তিনি লিখেন, 'They came from the prologue to what was probably the earliest translation of the Bible into the English language------ 'The bible shall be for the government of the people, for the people and by the people,' The author was the theologian John Wycliffe, sometimes called 'the Morning Star of the Reformation.' Astonishingly, they had first appeared in 1384.'

গেটিসবার্গ ভাষণ সম্পর্কে বাক্য দুটি চোখে পড়তেই আঁতকে ওঠে রীতিমতো ভিরমি খাওয়ার উপক্রম! এত দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠিত সত্য ও বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করে বাতিল করার শামিল! কি করে বিশ্বাস করি, গণতন্ত্রের সংজ্ঞা হিসেবে স্বীকৃত জগদ্‌বিখ্যাত কথাটি লিংকন ধার করেন জন ওয়াইক্লিফের লিখা থেকে। আর দশজনের মতো আমিও জেনে এসেছি লিংকনের মোক্ষম কথাটি গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। 'দ্বিতীয়' বা 'তৃতীয়' বিশ্বের কেউ যদি এমন 'বিস্ময়কর' কথা পাড়তেন তবে রি রি পড়ে যেত। সমস্বরে বলা শুরু হতো 'গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে গভীর এবং সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে'। আমাদের ভাগ্য ভালো, কারণ তথ্যটি *দি টেলিগ্রাফ* পত্রিকা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের আলোচনায় অবশ্যম্ভাবীভাবে উঠে আসে আমেরিকার ষোড়শ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ১৯শে নভেম্বর ১৮৬৩ পেনিসেলভোনিয়ার গেটিসবার্গে প্রদত্ত ভাষণ। উভয় ভাষণের তুলনা আমরা সচরাচর করে থাকি। একটির সাথে অপরটির তুলনা অসংগত। এটা হীনম্মন্যতার পরিচায়ক। দুটি ভিন্ন সময়ের ভিন্ন প্রেক্ষিতকে দেখার সুযোগ আদৌ আছে কি-না।

গেটিসবার্গের গৃহযুদ্ধে ইউনিয়ন আর্মির বিজয়ের সাড়ে চার মাস পরে ১৯শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার ১৮৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট লিংকন ভাষণটি দিয়েছিলেন। স্থানটি ছিল পেনসেলভেনিয়া রাজ্যের গেটিসবার্গের ১৭ একর ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত 'সোলজার্স ন্যাশানাল

সেমিট্রি।' গেটিসবার্গের লোক সমাগমের সাথে রেসকোর্সের তুলনা বাতুলতা মাত্র। গেটিসবার্গে আনুমানিক ১৫,০০০ লোক সমাগম হয়েছিল। ভাষণটির স্থায়িত্ব ছিল ২ মিনিটের সামান্য কিছু বেশি সময়ের। উচ্চারিত শব্দ সংখ্যা ছিল ২৭২টি।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিন দিনব্যাপী গেটিসবার্গ যুদ্ধে (১লা থেকে ৩রা জুলাই ১৮৬৩) নিহত সৈন্যদের স্মরণসভার প্রধান বক্তা ছিলেন সে সময়ের বিখ্যাত বাগ্মী, ম্যাসাচ্যুসেটসের সিনেটর, গভর্নর, হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্ট, তুখোড় প্রফেসর, আমেরিকার সেক্রেটারি অব স্টেট অ্যাডওয়ার্ড এভারেট। বেলা ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত একনাগাড়ে দুই ঘণ্টা স্থায়ী প্রধান বক্তার ভাষণের প্রেক্ষাপটে মাত্র ২ মিনিটের সামান্য বেশি সময়ের প্রেসিডেন্ট লিংকনের ভাষণের গুরুত্ব সে সময়ে সমবেত শ্রোতাদের অনেকেই ধর্তব্যের মধ্যে নেননি। অ্যাডওয়ার্ডের দীর্ঘ ভাষণের আলোকে ম্লান হয়ে সেটি আলোচনার বাইরে চলে যায়! তবে ভাষণের নিম্নের অংশটি উপস্থিত কিছু শ্রোতার মন ছুঁয়েছিল:

We here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation, under God shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth.

একনজরে দেখে নেওয়া যাক, গেটিসবার্গ ভাষণের পটভূমি। নিহত সৈন্যদের বিক্ষিপ্তভাবে সমাহিত না করে কেন্দ্রীয়ভাবে স্থাপিত সেমিট্রিতে সমাহিত করা হয়। সেমিট্রির উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লিংকন ১৮ই নভেম্বর ১৮৬৩ বিকাল ৫টায় গেটিসবার্গ পৌঁছে সেমিট্রি বোর্ডের চেয়ারম্যান এটর্নি ডেভিড উইলসের আতিথেয়তা গ্রহণ করে তাঁর বাসভবনে অবস্থান করেন। পরের দিন ১৯শে নভেম্বর সকালে প্রাতঃরাশ সেরে প্রাইভেট সেক্রেটারি জন নিকোলাইকে নিয়ে নিজ কক্ষে বসে ভাষণের খসড়া তৈরি করেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে মিছিলে অংশ নিয়ে গেটিসবার্গ সেমিট্রিতে হাজির হন। মঞ্চে তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম স্টুয়ার্ট ও প্রধান বক্তা অ্যাডওয়ার্ড এভারেট।

লিংকনের ভাষণটির গুরুত্ব ও স্থায়িত্ব সর্বপ্রথম তুলে ধরেন সিনেটর চার্লস সামনার (Charles Sumner)। তিনি ১লা জুন ১৮৬৫ সালে অর্থাৎ গেটিসবার্গ ভাষণের প্রায় আড়াই বছর পরে ভাষণটিকে 'monumental act.' আখ্যায়িত করে বলেন, 'The world noted at once what he said, and will never cease to remember it. The battle itself was less important than the speech.' এভাবে শুরু হয় লিংকনের ভাষণটির আলোচনা। লক্ষণীয় সিনেটর ভাষণটিকে গেটিসবার্গের যুদ্ধের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলতে দ্বিধা করেননি। পরবর্তী সময় বিষয়টি সেদিকেই গড়ায় এবং Edward Everett, লিংকনকে লিখেন 'I wish that I could flatter myself that I had come as near to the central idea of the occasion in two hours as you did in two minutes.'

গেটিসবার্গের ভাষণে ত্যাগী মৃত সৈন্যদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর প্রকৃষ্ট উপায় হিসেবে 'জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য' প্রতিষ্ঠা করে নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক ধারা বহমান রাখার দৃঢ়তা নিয়ে আব্রাহাম লিংকন উচ্চারিত, 'Four score and seven years ago' অর্থাৎ ৮৭ বছর আগে ১৭৭৬ সালে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষায় ত্যাগী ২৩ হাজার ইউনিয়ন-সেনাদের অমর আত্মত্যাগের কথা চিরস্মরণীয় করে গণতন্ত্র রক্ষার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। আব্রাহাম লিংকন ভাষণে বলেন, 'The world will little note, nor long, remember what we say here, but it can never forget what they did here.' গণতন্ত্র রক্ষা করে জয়যাত্রা অব্যাহত রাখতে সৈন্যদের অমিত বিক্রম ও আত্মত্যাগ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে রাখার অবদানের সুদূরপ্রসারী মহিমা-চিত্র সংক্ষিপ্ত ভাষণে লিংকন তুলে ধরেন। তিনিও সন্দিহান ছিলেন তাঁর ভাষণের স্থায়িত্ব নিয়ে! তবে তিনি নিহতদের স্মৃতি স্মরণের স্থায়িত্ব জাতির ইতিহাসে কামনা করেছিলেন।

লিংকনের অমর উক্তি 'I walk slowly but I never walk backward.' কথাটি যেন গেটিসবার্গ এড্রেসের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল পরে সত্যে পরিণত হয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়ে লিংকন-পলিসির জয় সুনিশ্চিত করে চলেছে।

অন্যদিকে, ৭ই মার্চের পটভূমির রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ বাঙালি জাতি মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহ, অস্ত্রাগার লুট, ব্রিটিশ রাজকর্মচারী হত্যা, আন্দোলন ও সম্মুখ সংগ্রাম। এমনকি বিদেশের মাটিতে নেতাজি সুভাষ বসু প্রবাসী সরকার গঠন করে ব্রিটিশ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু স্বাধীনতা সূর্য ছিনিয়ে আনার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এমন একটি পোড় খাওয়া, ঐতিহ্য সমৃদ্ধ মুক্তিপাগল বাঙালি জাতির নেতৃত্বের পুরোভাগে তখন চলে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যুগ যুগ ধরে ব্যর্থ হয়ে পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনতা নেতার সামনে দাঁড়িয়ে ৭ই মার্চ ১৯৭১ তারিখে শুনতে চায় স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ঘোষণা ও করণীয় নির্দেশনা। এমন দৃশ্য ৭ই মার্চের আগে বিশ্ব কভু কোথাও দেখেনি! শান্ত, ধীর, অচঞ্চল, প্রত্যয়-দীপ্ত বঙ্গবন্ধু জনগণের সামনে এসে দাঁড়ান। সকলের চোখেমুখে দারুণ উৎকণ্ঠা! হাজার বছরের আরাধ্য, অবিসংবাদিত নেতা জলদগম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। এ মুহূর্তের বর্ণনায় কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লার কথার প্রতিধ্বনি ও কিছুটা হেরফের করে বলা যায়, 'মুহূর্তে স্পর্ধিত মধ্যাহ্নের আলোকিত উন্মোচন ঘটল। শৃঙ্খলিত বৃক্ষে ঊর্ধ্বমুখী অহংকারে উচ্চারিত 'জয় বাংলা' স্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হলো। 'পর্বতের মতো অবিচল, ধ্রুবতারার মতো স্থির' হয়ে তিনি নীলিমাকে স্পর্শ করলেন। জাতি সেইদিন নীলিমাকে স্পর্শ করার স্বাদ আকণ্ঠ পান করেছিল। সব হতাশা কেটে গিয়েছিল। নতুন অভিযাত্রায় জাতি প্রস্তুত হলো। মুক্তির নেশায় মেতে উঠল। ধমণীতে প্রবাহিত হলো মুক্তিসংগ্রামের শোণিত ধারা।

৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছিল পরাধীন দেশ স্বাধীন করার চুলচেরা পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনায় ভরপুর। নন্দিত নেতা দেশবাসীকে দিয়েছিলেন মুক্তি-মন্ত্র। মুক্তিসংগ্রামে জয়ী হয়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার পথরেখা। অন্যদিকে দেখা যায়, গেটিসবার্গ যুদ্ধ আমেরিকার গণতন্ত্রের বিজয় নিশ্চিত করেছে। এই বিজয় গণতান্ত্রিক বিশ্বকে গণতন্ত্রের পথ দেখিয়ে চলেছে। এখানেই আব্রাহাম লিংকনের ছোট্ট ভাষণের সত্যিকার মহিমা ফুটে উঠেছে। অপরদিকে সমাধিস্থলের পরিবেশে অভিভূত লিংকন ছোট্ট বক্তব্যে যে আবেগের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন তা এখনো বিশ্বকে আবেগতাড়িত করে তোলে। ভাষণে লিংকন কনফেডারেট দলের আক্রমণ রুখে দিয়ে স্বাধীন দেশে গণতন্ত্র সুরক্ষিত করে চলমানতা বজায় রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণটির তুলনা যখন আমরা করি তখন দুটি সময়ের দূরত্বই শুধু নয়, সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন প্রেক্ষিতকে আমলে না নিলে দুটি

ভাষণের প্রতি অবিচারই করা হবে! গেটিসবার্গের ভাষণটিকে ছোটো বা খাটো বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এমন সাধ্য কারও নেই। দুটি ভাষণই যুগান্তকারী। এটিতে স্বল্প কথায় স্বাধীন দেশে হানাহানি দূর করে গণতন্ত্র রক্ষায় জনগণের সার্বভৌমত্বের অমোঘ অবস্থানের কথা আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। পরবর্তীকালে সারাবিশ্ব তা গ্রহণ করে রাষ্ট্রব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম করে নিয়েছে। আব্রাহাম লিংকনের ভাষণের আবেগ ও উচ্চারিত কথার গভীরতা বিশ্ববাসী অনেক পরে হৃদয়ঙ্গম করে ভাষণটিকে ইতিহাসের পাতায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে মূল্যায়িত করেছে। তাঁর ভাষণটি গণতন্ত্রের দরজায় তুমুল করাঘাত করে গণতন্ত্রের ভিত শক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করে অগণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি অনাস্থার বীজ বপন করেছে।

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

দুটি ভাষণের আলোচনায় বলা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় রচিত সংবিধানে বঙ্গবন্ধু জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিয়ে আব্রাহাম লিংকনের অমর বাণীর শাশ্বত রূপটি সমুন্নত করেছেন। তাছাড়া তিনি দুটি সময়ের দূরত্ব জয় করে পরস্পরকে এক বৃত্তে ও বৃন্তে বেঁধেছেন।

বাংলা ভাষায় প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ভাষণের আবেদন, গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে দিয়ে যথাযথ আসনে প্রতিষ্ঠা দিতে আমাদের যে কাজটি করা দরকার তা থেকে আমরা অনেকটাই পিছিয়ে আছি। অনেকের ধারণা ভাষান্তরিত করে ভাষণটিকে অধিক পরিচিত করে তোলা সম্ভব। ভাষান্তরিত করা আর অধিক পরিচিতি দেওয়া এক কথা নয়। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন এবং ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটিকে বৃহত্তর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ভাষণটি বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষায় অনুবাদ করা প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। একটি তুলনা দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করার প্রয়াস পাব।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা ভাষার রচিত *গীতাঞ্জলির* স্বীকৃত ইংরেজি অনুবাদ ইংল্যান্ডের বিদগ্ধজনের আনুকূল্যে আন্তর্জাতিক মহলে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এ বিষয়ে নীরোদচন্দ্র চৌধুরী লিখেন, 'প্রথমে ইংরেজী *গীতাঞ্জলি* প্রকাশের ফলে রবীন্দ্রনাথের কবিতাবৃত্তিতে পূর্ণতা এবং আনন্দই আসিল'।

উইলিয়াম রোদেনস্টাইন *গীতাঞ্জলির* কবিতাগুলো টাইপ করে প্রখ্যাত সমালোচক স্ট্যাফোর্ড ব্রুক, দার্শনিক ও সেক্সপিয়ার-সমালোচক এ সি ব্রাডলী ও কবি ইয়েটসের কাছে পাঠিয়েছিলেন। অনুবাদকৃত কবিতাগুলো পড়ে এ সি ব্রাডলী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে লেখেন, 'It looks as though we have at last a guest poet among us again.'

রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃত অনুবাদ ব্রিটেনের অন্যান্য বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের গোচরীভূত করতে রোদেনস্টাইন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তিনি ২৮শে জুন ১৯১২ নিজ বাড়িতে ইয়েটস, এজরা পাউন্ড, সিনক্লেয়ার, চার্লস ট্রেভেলিয়াল, স্টার্জ ম্যুর, স্যার অলিভার লজ, এইচ জি ওয়েলস, বার্ট্রান্ড রাসেল, ডাবলিউ এইচ হাডসন, সি এফ এন্ড্রুজ, নেভিলসন আরো অনেককে নিমন্ত্রণ করে কবিকে তাঁদের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেন। এই আসরে কবি ইয়েটস অনুবাদগুলো পড়ে উপস্থিত সকলকে শুনিয়েছিলেন। সেখানে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবি হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছে উন্নত বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবমূর্তি নির্মাণের প্রেক্ষিত। তাছাড়া ভারতের বাইরে প্রথম রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশ করে ব্রাজিল। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, রুমানিয়া ও রাশিয়া। আমাদের দেশের রবীন্দ্রপ্রেমিক ও সমালোচকবৃন্দ এই বিষয়গুলো বিলক্ষণ জানেন।

আমরা যদি সমন্বিতভাবে যথাযথ স্থানে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, চিন্তাধারা ও দর্শন এভাবে তুলে ধরার সফল ব্যবস্থা নিই তাহলে বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী ভাষণটি নিঃসন্দেহে হয়ে উঠতে পারে বিশ্ব রাজনীতি ও সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। আন্তর্জাতিক বোদ্ধা মহলে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সফল আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। যুগান্তকারী ৭ই মার্চের ভাষণের বহুমাত্রিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করে সারাবিশ্বের স্বীকৃতি প্রাপ্তির পথ খুলে যেতে পারে। তখন ভাষণটি বাংলাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে হয়ে উঠবে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রাজনৈতিক ভাষণ। গুরুত্বপূর্ণ এই কাজে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে সরকারের সঙ্গে দেশপ্রেমী সচেতন ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে এলে ভাষণটি জাতিপুঞ্জের স্বীকৃতি পেয়ে লাভ করবে আন্তর্জাতিক মর্যাদা। আর বিলম্ব না করে আমরা কি 'পোয়েট অব পলিটিক্স' বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী 'এড্রেস'টিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করে প্রতিষ্ঠা দিতে দ্রুত এগিয়ে আসব না?

লেখক: রম্য লেখক, গবেষক ও প্রাবন্ধিক এবং সাবেক এআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ।

ক্ষমার অযোগ্য

মনসুর জোয়ারদার

ইতিহাস ক্ষমা করে বহু অপরাধ,
ক্ষমা করে নেতাদের বহুরূপী চাল
রাজাদের হানাহানি প্রাসাদ নিপীড়ন,
ইতিহাস তবু ক্ষমা করতে পারে না
রাজনীতি নামে বরেণ্য নেতার হত্যা।

এ দেশে আছে যে সংগ্রামী ইতিহাস
সে ইতিহাসও তাই করবে না ক্ষমা,
পারবে না ভুলে যেতে সেই কাল রাত
যে রাতে পলকে ঘৃণ্য রাজনীতির নামে
স্বগৃহে সপরিবারে নিহত হলেন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সবুজ গাঁয়ের মধুমতী নদী পটে
টুঙ্গিপাড়ার সন্তান প্রখ্যাত হলেন
যে বাংলাদেশের চিরঞ্জীব নেতা রূপে
ছড়িয়ে পড়ল সে কাহিনি সারা বিশ্বে,
রাজনীতি নামে তাঁর নারকীয় হত্যা
ইতিহাসে গণ্য তাই ক্ষমার অযোগ্য।

বাঙালি জাতির শেখ মুজিব

খান চমন-ই-এলাহি

মানুষের স্পন্দনের মতো
অভিভূত একটি জাতির স্পন্দনে
যখন সে জাতি ও স্পন্দনের অনিবার্য নাম
বাঙালি ও শেখ মুজিবুর রহমান
তখন অবিচ্ছেদ্য অভিব্যক্তি চিরন্তন সূর্যের মতো
কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি জনতার মাথার উপর
ছাত্র-শিক্ষক-চাকুরে সৈনিকের মাথার উপর
ধর্ম-বর্ণ বিভিন্ন পেশাজীবীর মাথার উপর
রক্তে নির্মিত স্বাধীন স্বদেশ রক্ষার গান গায়
আলোর পথযাত্রীর মতো উজ্জীবিত
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-কর্ণফুলি-মধুমতি অববাহিকা
স্বর্ণালি শস্যে কবিতার পঙ্‌ক্তি সাজায়
আর কর্ষণ করে লাল-সবুজে উত্তীর্ণ ভূমি
মহাকালের অনাগত স্বপ্নমানব।
আমার স্বদেশ আমার মাতৃভূমি এই বাংলা
কত সহস্র বছর অপেক্ষার পর
অন্তত হাজার বছর রক্তগঙ্গা পেরিয়ে
পলাশীর আম্রকাননের পরাধীন আলপথ ভেঙে
বাহান্নের বাংলা ভাষার আহ্বানে
উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে
এবং একাত্তরের অনির্বাণ ঠিকানা জুড়ে
পৃথিবীর বিস্ময়
প্রিয় পিতার আঙুলের নির্দেশে
বিভেদের সব রেখা মুছে
জীবন সম্ভ্রম সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞানে
'জয় বাংলা বাংলার জয়' স্লোগানে
মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের সমমর্যাদায়
পতাকার উচ্চতায়
জাতীয় সংগীতের সুরে
বাংলাদেশের অস্তিত্ব জুড়ে
'জয় বঙ্গবন্ধু–শেখ মুজিবুর রহমান'।

একটি অসমাপ্ত মহাকাব্য

কনক চৌধুরী

এ কোনো মহাকাব্য নয়
হাজার পাতার কোনো কাব্যগ্রন্থও নয়
নয় কোনো মহর্ষি রাজা মহারাজা বা কোনো শাহজাদার স্তুতি-কীর্তন
কোনো শাহজাহান, সুলতান বা বাদশার বাদশাহী আমলের দিনলিপিও নয়।
শুধু দুখি মানুষের অধিকার আদায়ের আলোকবর্তিকা হাতে
একটি ছেলের দু'একটি কথা।

মা-বাবা ভালোবেসে নাম রাখে 'খোকা'।
সেই খোকার স্কুলে নাম হয় 'শেখ মুজিবুর রহমান'।
তারপর টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া ছড়িয়ে যায় নাম
মুজিব, শেখ মুজিব, শেখ মুজিবুর রহমান
আবার কখনো কখনো মুজিবুর, শেখ মুজিবুর,
কেউ সম্বোধন করে মুজিব ভাই, কেউ-বা আবার শেখ সাহেব।
কখনো কখনো বাবা বলে মুজিব ভাই, ছেলেও বলে মুজিব ভাই।
দাদু-দিদা, নানা-নানুর বয়সি মানুষেরা ভালোবাসা মিশিয়ে ডাকে
শেখের বেটা, শেখের পোলা।

এরপর একদিন নামের সাথে যুক্ত হয় এক উপহার
নামের অগ্রে সূচিত হয় 'বঙ্গবন্ধু'
সে হিসেবে নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ অপরাহ্নের রেসকোর্স ময়দান
লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা'র কাছে
প্রতিপক্ষ লে. জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী'র
আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে সে নাম বদলে যায় চিরতরে।
সেদিন থেকে নতুন নাম 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'।

টুঙ্গিপাড়া তীর্থ ভূমি

নিপু শাহাদাত

আমার বাহান্ন আমার
একুশে ফেব্রুয়ারি,
চুয়ান্ন-বাষট্টি আমি
ভুলতে কি পারি?

আমার ছিষট্টি উনসত্তর
আমার সত্তর-একাত্তর
কোনটা আমি ছাড়ি?
সাতই মার্চ কি ছাড়তে পারি,
সতেরো-পঁচিশ-ছাব্বিশ
কেমন করে ভুলব এসব
ভুলতে বলিস, রাবিশ।

দশই জানুয়ারি আমার
ষোলোই ডিসেম্বর
আমার বিজয় স্বাধীনতা
জয় বাংলার স্বর।

এসব কিছুই ম্লান করে দেয়
পনেরো আগস্ট শোক,
করুণ-কান্না-বেদনায়
ধূসর বিশ্বলোক,

সব কিছু আজ মূর্ত একই
লাল-সবুজে ঢেকে
আমার বাংলাদেশ এখানে
মহান ছবি এঁকে,

টুঙ্গিপাড়া তীর্থ ভূমি
মিশে আছে অন্তর
এইখানে সব জাগে, ঘুমোয়
বঙ্গবন্ধু মুজিবুর
ইতিহাসে ভাস্বর।

নিবন্ধ

একজন প্রকৃত ধার্মিকের নাম

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

নেছার আহমদ

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর বিয়াল্লিশ বছর পর তাঁকে নিয়ে এ ধরনের একটি লেখা লিখতে হবে কল্পনাই করিনি। বর্তমানে দেশে বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় রয়েছে। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবুও সময়কে সামনে রেখে আমাকে আজকে এ বিষয়ে লিখতে হচ্ছে। কিন্তু সময়ের চাহিদা এবং সামাজিক অবস্থার কারণে একজন ধার্মিক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লিখা এখন অপরিহার্য। বঙ্গবন্ধু যেমন ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক বাঙালি, তেমনি ছিলেন একজন প্রকৃত ঈমানদার মুসলমান। বঙ্গবন্ধুর সারাজীবনের কর্মপ্রয়াস ছিল বাংলার জনগণের শোষণ মুক্তির অন্বেষণ। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন ইসলামের উদার নৈতিক অসাম্প্রদায়িক সাম্য ও মৈত্রীর চিরন্তন ভিত্তিকে। স্বাধীন বাংলাদেশে ইসলামি অগ্রযাত্রায় বঙ্গবন্ধুর অবদান অবিস্মরণীয়। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে ইসলামের প্রচার-প্রসারে যে অবদান রেখেছেন তা সমকালীন ইতিহাসে বিরল।

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়ানি ভাষা হিসেবে আখ্যায়িত করার ষড়যন্ত্র হয়েছে। বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য একে পাকিস্তান ভাঙা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভারতের ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ভারতের চর এবং ইসলামের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন প্রকৃত মুসলমান হিসেবে ধর্মকে রাজনীতি থেকে দূরে রেখে অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৯৭০ এর নির্বাচনের বেতার ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন

> আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে, আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। এ কথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য– আমরা লেবাস সর্বস্ব ইসলামে বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রসুল করিম (সা.)-এর ইসলাম। যে ইসলাম জগদ্‌বাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বার বার যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে আমাদের সংগ্রাম সেই মুনাফেকদের বিরুদ্ধে। যে দেশের শতকরা ৯৫ জন মুসলমান, সেদেশে ইসলাম বিরোধী আইন পাসের ভাবনা ভাবতে পারে তারাই, ইসলামকে যারা ব্যবহার করেন দুনিয়াটাকে শায়েস্তা করার জন্য।

সে সময় বঙ্গবন্ধু তাঁর এ অমূল্য বক্তব্যে রসুল (সা.)-এর ইসলামের সুমহান শিক্ষা, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে ইসলামের আপোশহীন অবস্থান, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও মুনাফেকির বিরুদ্ধে ইসলামের শিক্ষার প্রতি তাঁর দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সব ধর্মের মানুষের কাছে ইসলামের মূল মর্মবাণী তুলে ধরে অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার রাজনৈতিক নতুন ধারা সৃষ্টি করেন এবং সফলতা লাভ করেন।

বঙ্গবন্ধুহীন বাংলায়, তাঁর হাতে গড়া স্বপ্নের এ সোনার বাংলায় সেসময়কার পাকিস্তানি জান্তাদের ন্যায়, বঙ্গবন্ধুর ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা-অপচেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর ইসলামি চেতনার বৈশিষ্ট্যসমূহকে ভুল ব্যাখ্যা করে তাঁকে খাটো করার হীন চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বাঙালি তাঁদের প্রাণপ্রিয় নেতার আদর্শ থেকে কোনো সময় বিচ্যুত হয়নি বলেই আজ বাংলাদেশ সম্পদে ও উন্নয়নে, শিক্ষা, শিল্পায়নে বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে আর পাকিস্তান জঙ্গিবাদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়ে বিশ্বে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। যেখানে আজ শুধু হত্যা, রক্ত আর কান্নায় বাতাস ভারী হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বংশ পরম্পরায় বাগদাদের দরবেশ বংশের লোক। তাঁর পিতামাতা সকলেই ধার্মিক ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল মানুষের স্ব স্ব ধর্মের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতার উৎসই ছিল রসুল (সা.)-এর মদিনা সনদের শিক্ষার অনুসরণ। ঐতিহাসিক মদিনা সনদের মধ্যে উল্লেখ ছিল:

'মদীনায় ইহুদী-নাসারা, পৌত্তলিক এবং মুসলমান সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে'। ইসলামই প্রথম নিরপেক্ষতার বাণী বিশ্বে প্রচার করেছে, 'তোমার ধর্ম তোমার জন্য, আমার ধর্ম আমার জন্য এবং ধর্মে কোন জুলুম বা অত্যাচার নেই।' এ কথা পবিত্র কোরান ছাড়া আর কোনো ধর্মগ্রন্থ প্রচার করেনি। ধর্মকে বঙ্গবন্ধু শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু ধর্মান্ধতাকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। এ কারণেই তিনি এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের গোড়া থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বীকৃতির মধ্যে তাই এদেশের জনগণের সুদীর্ঘ তিক্ত অভিজ্ঞতা ও বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের প্রতিফলন ঘটেছে, তা বাস্তবায়ন করে এ জাতি উন্নত জাতিতে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি বলেন,

> ধর্মান্ধতাকে আমি ভয় করি। বাংলাদেশের অবির্ভাবে বাধা দিয়েছেন অনেক ধর্মান্ধ ধর্ম দার্শনিক। তারা বাংলাদেশকে, বাঙালি জাতীয়তাবাদকে কতটুকু শ্রদ্ধা করতে পারবেন সে সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এদের সম্পর্কে অতীতে যেমন, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও তেমনি সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। ধর্মের বিকৃতি যদি সর্প হয়, তাহলে এরা সেই সর্পের বিষ-ফনা। [সূত্র: রফিকুল ইসলাম, বীরের রক্ত স্রোত মাত্রায় এ অশ্রুধারা, বাংলা একাডেমী]।

ইসলামের চর্চা ও গবেষণা করার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় বায়তুল মোকাররম মসজিদ নিয়ে ১৯৭৫-এর ২৮শে মার্চ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারি করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। মেশকাত শরিফের অনুবাদক হিসেবে সুপরিচিত মওলানা ফজলুল করিম সাহেবকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের (যিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ ছিলেন) প্রথম মহাপরিচালক নিযুক্ত করেন। বঙ্গবন্ধু মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে পুনর্গঠন করেন। জুয়া, হাউজি, মদ প্রভৃতি অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করেন এবং শাস্তির বিধানও করেন।

১৯৭২-এ পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত বাতাসে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,

> আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল, জীবন দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম, আমি বলেছিলাম তোমরা আমাকে মারতে চাও মেরে ফেল। আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। মুসলমান একবার মরে বার বার মরে না।

বঙ্গবন্ধুর ন্যায় মহান নেতা সারাজীবন বাঙালির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করলেও দেশ শাসনের সুযোগ বেশি দিন পাননি। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে তিনি বাংলাদেশে ইসলামের প্রসার ও কল্যাণে যা করেছেন তা বিশ্বের ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

ঈদের নামাজ শেষে জনসাধারণের সাথে কোলাকুলিরত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান –ফাইল ছবি

বঙ্গবন্ধু প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ও হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর চিরন্তন মানবিকতা, সাম্য নৈতিক ও শান্তির আদর্শকে নিজের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলেন বলেই বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংযুক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন,

> ধর্মনিরপেক্ষতা সামাজিক সংঘর্ষ এড়াবার উপায়ও বটে। শিক্ষা, জ্ঞান ও তথ্যের বহুল প্রসার এবং শিক্ষার মাধ্যমে অলস ও নিরপেক্ষ মুক্ত মননের চর্চাকে মানসিক অভ্যাসে রূপান্তরকরণ, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতিতে এই নিরপেক্ষতার বাস্তবায়ন-এর বহুল উচ্চারিত কর্তব্য ও সমাধান সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতির রূপান্তরের মধ্যে এই প্রবণতা পূর্ণতা পাবে। মানুষের যে আত্মপরিচয় এক সময় গোষ্ঠী বা ধর্মকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছিল তার ক্ষুদ্র বেড়া ভেঙে সংস্কৃতির বৃহত্তর আঙিনায় তার নতুন পরিচয় লাভ হবে। বাংলাদেশ এই প্রবণতাকেই সত্যতর ও ভবিষ্যমুখী বলে জোর দিয়েছে।
>
> ধর্মনিরপেক্ষতাও সামাজিক চাহিদা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। এটা একটা আন্তর্জাতিক সামাজিক সত্য। এর ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক প্রবণতার সঙ্গে গ্রথিত। সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় প্রশ্নের নিষ্পত্তি অতীতেও হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। ধর্মের নামে অন্ধবিশ্বাস বা সম্প্রদায়গত সংস্কারকে উসকে দিয়েও সমস্যার সমাধান হবে না। সব ধর্ম বিশ্বাসের ওপর শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে আমরা সমাজকে বদলাতে চাই। সমাজ আজ যেখানে আছে সেখানে ফেলে রাখতে চাইনা। ভীরুতা দিয়ে পরিবর্তন সাধন করা যায় না। ধর্মনিরপেক্ষতার জন্যও সাহসের প্রয়োজন [অধ্যাপক আলী আনোয়ার সম্পাদিত, ধর্মনিরপেক্ষতা, বাংলা একাডেমী-১৯৭৩]।

বঙ্গবন্ধুর এ সৎ সাহস ছিল বলেই তিনি একজন প্রকৃত ধার্মিকের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক মানুষকে তাঁর ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেননি। এখানেই একজন ধার্মিক ও সাহসী রাষ্ট্রনায়কের সার্থকতা।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় আজকে যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতির করেন, জঙ্গিবাদকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছেন তাদেরকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বঙ্গবন্ধু বলেছেন,

> বাংলাদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস। ধর্ম আলাদা হলেও আমাদের সবার আজ একটাই পরিচয় আমরা বাঙালি। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালগিষ্ঠ বলে কোন শ্রেণি বৈষম্য বিচার্য হতে পারে না। আমাদের ধর্ম বা বর্ণ আলাদা হতে পারে... কিন্তু বাঙালি হিসেবে এ স্বাধীন বাংলার সকল নাগরিকের বড় পরিচয়। যার যা ধর্ম তিনি তা স্বাধীনভাবে পালন করুন... কিন্তু একের সাথে অপরের যেন বিরোধ না ঘটে।

আজ আমরা বলতে চাই পরস্পর এ ভ্রাতৃত্বের ভাবের মাধ্যমেই বাঙালি হিসেবে আমাদের পরিচয়। সেই পরিচয়ের মাধ্যমেই আমরা সঠিক পথের ঠিকানা লাভ করতে পারি এবং উদার পরমতসহিষ্ণু একটি সমাজ গড়ে তুলতে পারি। যে সমাজব্যবস্থার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন কাজ করেছেন। আসুন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা গড়ে তুলতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি।

কোনো ধর্মীয় ভেদাভেদ নয়। ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্যই হচ্ছে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা। ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে বিকাশিত হয়েছিল বলেই তিনি বাংলার মানুষের নয়নের মণি।

তিনি আপোশ করেননি বলেই মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। শেষ পর্যন্ত নিজের রক্ত দিয়ে তিনি প্রমাণ করে গেছেন বঙ্গবন্ধু একজন খাঁটি ধার্মিক ও বাঙালি।

আজকের প্রজন্ম ও নবীন রাজনীতিকরা বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত আদর্শকে অনুসরণ করে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলে এদেশ অবশ্যই বঙ্গবন্ধুর 'স্বপ্নের সোনার বাংলা'য় পরিণত হবে। জঙ্গিবাদের ন্যায় ফ্রাঙ্কেস্টাইন এদেশে সৃষ্টি হবে না। অসাম্প্রদায়িক মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-নির্ভর এক স্বনির্ভর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা পাবে। শোষণমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে। বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই তা সম্ভব হবে। আসুন, বঙ্গবন্ধুর এ সোনার বাংলায় জঙ্গিবাদকে 'না' বলি এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী প্রকৃত ইসলামকে 'হ্যাঁ' বলি।

লেখক: কলামিষ্ট ও প্রাবন্ধিক

শেখ মুজিবের রক্ত

মনি হায়দার

কফিলুদ্দিন নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। সকাল হয়েছে। পুকুরপাড়ে গিয়েছিল সুলতানা। সেখান থেকে দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে ধাক্কা দেয় কফিলুদ্দিনকে, আর কতো ঘুবাইবেন। সব্বোনাশ অইয়া গেছে। তাড়াতাড়ি ওঠেন। কফিলুদ্দিনের ঘুম ভেঙে গেলেও ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকে। সকালের এই ঘুমটা সে খুব পছন্দ করে। গত কয়েকদিনে, শ্রাবণের বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে হালচাষ করেছে। আপাতত জমিতে কাজ নেই। রাতেই ঘুমানোর সময় বলেছে সুলতানাকে, সকালে আমাকে ডাক দিবা না। অথচ দেখ মহিলার কাণ্ড!

সুলতানা আবার ধাক্কা দেয়, আপনি কি কাল ঘুম ঘুমাইছেন? ওঠেন, ঢাকায় সব্বোনাশ হয়েছে। লোকেরা বলাবলি করতেছে। এক ঝটকায় উঠে বসে কফিলুদ্দিন, কী অইচে ঢাকায়?

– শেখ সাবরে নাহি...কফিলের মুখের দিকে তাকিয়ে আর কথা বলে না সুলতানা। ঘুম ছুটে গেছে কফিলুদ্দিনের

– শেখ সাবের কী অইচে বৌ?

– উনারে মিলিটারিরা মাইরা ফালাইচে।

– তোরে কেডায় কইলো ?

– পুকুরপাড়ে লোকেরা কইতেছে। রেডিওতে ঘোষণা দিতাছে।

– রেডিওতে ঘোষণা দিতাছে!

– রেডিওতে ঘোষণা দিতাছে! শেখ সাবরে মাইরা ফালাইচে? বিছানার ওপর রাখা গেঞ্জিটা হাতে নিয়ে শরীরে ঢোকাতে ঢোকাতে বের হয়ে যায় কফিলুদ্দিন। এক দৌড়ে পুকুরপাড়ে যায় কফিল। পুকুরপাড়ে অনেক মানুষের জটলা। কফিল জটলার পাশে দাঁড়াতেই দেখে, মধ্যমণি কালাম সিকদার। দাঁত মাজছে দাতন দিয়ে। মুখে জেল্লা ফুটে উঠেছে।

এহন কী হবে? কালাম সিকদারকে প্রশ্ন করে তার কামলা জামাল মিয়া।

দাঁত মাজতে মাজতে, থুতু ফেলতে ফেলতে জবাব দেয় সিকদার, কী আর হবে? যে দেশে শেখ মুজিব নাই সে দেশ কি চলে না? আল্লায় যা করে মানুষের ভালোর লাইগাই করে। যা ঘটছে তাঁর ইশারায় ঘটছে। বেশি কথা না কইয়া বাড়ি যাও। বলতে বলতে চোখ পড়ে কফিলুদ্দিনের দিকে, আমি কী আর বলবো? বলার লোক তো আইসা পড়ছে। কালাম সিকদারের দৃষ্টি অনুসরণ করে সবাই তাকায় কফিলুদ্দিনের দিকে। কফিলুদ্দিন এবং উপস্থিত সবাই জানে, কালাম সিকদারের জানের শত্রু কফিলুদ্দিন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কফিলুদ্দিন নিজের হাতে হত্যা করেছে কালাম সিকদারের আপন চাচা নওয়াব আলি সিকদারকে। ঘটনাটা এলাকার সবাই জানে। কিন্তু কফিলুদ্দিনকে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। কারণ কফিলুদ্দিন এলাকার মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে খুবই পরিচিত। যুদ্ধের শেষে, দেশে ফিরে শেখ মুজিব যখন অস্ত্র জমা দিতে বললেন, তখন অনেকের সঙ্গে নেত্রকোনা থেকে ঢাকায় এসে তাঁর হাতে অস্ত্র জমা দিয়েছে। শেখ মুজিবের হাতে অস্ত্র জমা দেওয়ার ছবি পত্রিকায় উঠেছে। কথায় কথায় গর্বের সঙ্গে বলে কফিলুদ্দিন, আমি যহন আমার স্টেন শেখের হাতে দিলাম, উনি আমারে জিগাইলো কয়ডা পাকিস্তানি সৈন্য মারছো? আমি কইলাম, এগারোটা মারছি। আমার পিঠে থাপ্পড় দিয়া কইলো, শাব্বাশ বাঙালি। বলতে বলতে শরীর বাঁকা করে দেখায় কফিলুদ্দিন, আমার এই পিঠে শেখ সাব হাত দিছে। বলেছে, যুদ্ধ কইরা দ্যাশ স্বাধীন করছো। এখন দেশ গড়ো।

গোটা এলাকায় শত শত মানুষের কাছে কফিলুদ্দিন এই ঘটনা বলেছে অনেকবার, অসংখ্যবার। আমার এই পিঠে শেখ সাব হাত দিছে– বলতে কখনো ক্লান্ত হয় না। ঘরের মধ্যে শেখ মুজিবের ছবি টাঙানো। কফিলুদ্দিনকে কী বলবে কালাম সিকদার? কতদিন গ্রামের হাটে দেখা হয়েছে, মন্টু ঘোষের চা দোকানে মুখোমুখি বসে চা খেয়েছে কালাম সিকদার আর কফিলুদ্দিন। কিন্তু কখনো কথা হয়নি। কেউ আগ বাড়িয়ে কথা বলতেও যায়নি। গোটা এলাকায় সিকদার বাড়ি রাজাকারদের বাড়ি হিসেবে পরিচিত। ধারে কাছে বসে না বললেও দূরে গেলেই লোকজন বলে, ওই দ্যাখ হালার রাজাকার যায়।

ছেলেমেয়েরা স্কুলে গেলেও ওই একই পরিচিতি, ও তোমরা রাজাকার বাড়ির পোলা?

ছেলেমেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি আসে। রাগে-ক্ষোভে-বেদনায় কালাম সিকদারের মগজ ফুটতে থাকে কিন্তু কিচ্ছু করার থাকে না। হ্যাঁ, তার চাচা নওয়াব আলি সিকদার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিল। ছোটোবেলায় বাবা মারা গেলে এই ছোটো চাচা নওয়াব আলিই আদর দিয়ে, স্নেহ দিয়ে মানুষ করেছে। লেখাপড়া শিখিয়েছে। পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল নওয়াব আলি সিকদার। মিছিল করেছে, জেলও খেটেছে। পাকিস্তান হওয়ার পর নওয়াব আলি মুসলিম লীগের সমর্থক হিসেবে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিল।

শেখ মুজিব ছয় দফা ঘোষণা করেই পাকিস্তানের বারোটা বাজিয়ে দিল– মনে আছে কালাম সিকদারের, কথাটা বলেছিল চাচা নওয়াব আলি সিকদার বৈঠকখানায় বসে।

ছয় দফায় কী আছে ভাই? জিজ্ঞেস করেছিল ইরফান গাজী।

ছয় দফার পাঁচ দফাই বাদ দাও, হুঁকায় টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জবাব দেয় নওয়াব– একটা দেশের কি দুই রকম টাকা হয়? শুনছো তোমরা? শেখ মুজিব পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আলাদা আলাদা টাকা চালু করার কথা বলেছে ছয় দফার এক দফার মধ্যে। এই প্রস্তাব কি মানা যায়? মানলে দেশ থাকে? আসলে সবই হচ্ছে ইন্ডিয়ার চাল। তারা আমাদের দুই ডানা ভাঙতে চায়। ইসলাম খতম করতে চায়। কিন্তু যত ষড়যন্ত্রই করুক, কিচ্ছু করতে পারবে না, কিচ্ছু করতে পারবে না– নিজের মনে উপসংহার টেনে আবার হুঁকায় টান দেয় নওয়াব।

বড়ো সাহস নিয়ে প্রশ্ন করে পাশের বাড়ির হুকুম আলি, ক্যান কিছু করতে পারবে না মিয়া ভাই?

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী দুনিয়ার সেরা বাহিনী। ইন্ডিয়ার পাঁচজন সৈন্যের সমান একজন পাকিস্তানি সৈন্য, বুঝলা। একবার যদি ইন্ডিয়া আক্রমণ করে পাকিস্তান মজা হাড়ে হাড়ে বুঝাইয়া দেবে।

ছয় দফা, আগরতলার মামলা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন পার হয়ে এল একাত্তর। মার্চের এক রাতে নেমে এল আগুনমাখা কেয়ামত বাংলায়। কেয়ামতের আগে শেখ মুজিব নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমি যদি হুকুম দিতে নাও পারি, তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

সেই যুদ্ধের এক যোদ্ধা নেত্রকোনার কফিলুদ্দিন।

ঘটনা কী? কফিলুদ্দিনের বাড়িতে রেডিও নেই। দৌড়ায় বাজারে। মন্টু ঘোষের দোকান বন্ধ। অবাক কফিলুদ্দিন। মন্টু ঘোষের দোকান তো বন্ধ থাকে না। কালা মিয়ার দোকানে অনেক মানুষ জমেছে। রেডিওর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। দ্রুত যায় কফিলুদ্দিন। বসার জায়গা না পেয়ে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। কান খাড়া প্রত্যেকের। সূরা পাঠ করা হচ্ছে। হঠাৎ ভেসে এল একটি কণ্ঠ, আমি মেজর ডালিম বলছি। শেখ মুজিবের সরকারকে উৎখাত করেছি। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। জয়

বাংলার জায়গায় জিন্দাবাদ– কফিলুদ্দিনের কানে আগুন লাগে।

সবার চোখেমুখে চাপা উত্তেজনা। কী হচ্ছে, ঘটনা কি সত্যি? রেডিও থেকে যখন বলা হচ্ছে তখন বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কিন্তু কেউ কোনো প্রতিবাদ করছে না কেন? কফিলুদ্দিন বাজার থেকে বের হয়ে যায় চেয়ারম্যান হামেজ মিয়ার বাড়ি। বাড়িতে কেউ নেই। দীর্ঘদিনের পরিচিত বাড়ি কফিলের। পেছনে ঢুকে ডাকে– ও হামেজ চাচা? হামেজ চাচা বাড়িতে আছেন?

পেছনের ঘর থেকে বের হয়ে আসে হামেজ বিমর্ষ মুখে। দুজনে দেখছে দুজনকে। হামেজ যুদ্ধের সময়ে অনেক সাহায্য করেছে। টাকা দিয়েছে, চাল দিয়েছে, থাকার জায়গা দিয়েছে। সরাসরি যুদ্ধে না গেলেও এলাকায় থেকে শত্রুদের সঙ্গে মিশে অনেক তথ্য এনে দিয়েছে। স্বাধীনতার পর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে।

– খবর কি সত্য? প্রশ্ন করে কফিলুদ্দিন।

চোখের পানি ছেড়ে দেয় হামেজ। হাত ধরে কফিলের, কফিলরে ঘটনা সত্য।

– আপনার বাড়ির সামনের দিকটা বন্ধ কেন?

– কী করব? কোনো দিশা পাইতেছি না। আমাদের বিপক্ষের শত্রু তো কম না। তারা যদি... থেমে যায় হামেজ মিয়া। আমার বাড়িতে ছেলের বৌ, নাতি-নাতনি আছে। তোমার চাচি অসুস্থ। আমি কী করতে পারি?

– তাই বইলা কোনো প্রতিবাদ হবে না?

–কে করবে? দেশের অবস্থা ভালো না। মানুষের পেটে অভাব। কে নামবো প্রতিবাদ করতে?

– একাত্তরে এর চেয়ে বেশি অভাবের মধ্যে আমরা যুদ্ধ করছি না চাচা?

– একাত্তরের যুদ্ধ আর আজকের মধ্যে অনেক ফারাক কফিলুদ্দিন। ফারাক! ফারাক আপনি দেখতে পারেন কিন্তু আমি কোনো ফারাক দেখি না। আমার কাছে একাত্তরের চেয়ে আজকের অবস্থা আরও জটিল মনে হয়। আমি যাই।

হামেজের বাড়ি থেকে দ্রুত বের হয়ে আসে কফিলুদ্দিন। মাথাটা একদম খালি লাগছে। হায়, হায় এটা কী হলো? যে দেশের জন্য মানুষটা এত লড়াই করল, জেল খাটল বছরের পর বছর, এনে দিলো স্বাধীনতা, সেই মানুষটাকে মেরে ফেলল নিজের দেশের মানুষেরা? পাকিস্তানিরা বন্দি করে রেখেছে কিন্তু হত্যা করতে সাহস করে নাই, সেই মানুষটাকে শেষে...। মাথাটা ঝিমঝিম করছে কফিলের। মাঠঘাট পার হয়ে দৌড়াতে থাকে সিরাজের বাড়ির দিকে। সিরাজ গৌরিপুর থানার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। খুব সাহসী মানুষ। যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে। কোনো আক্রমণে পেছনে থাকেনি। ডিসেম্বরের প্রথমদিকে শত্রুর একটা গুলি লেগেছিল ডান কাঁধে। ফিল্ড হাসপাতালে যেদিন অপারেশন করে গুলি বের করেছে, তার পরের রাতে পালিয়ে এসে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। সরকার তাকে বীরপ্রতীক উপাধি দিয়েছে।

কফিলুদ্দিনের বাড়ি থেকে প্রায় দুই আড়াই মাইল দূরে সিরাজ বীরপ্রতীকের বাড়ি। শ্রাবণের মেঘের আকাশ যদিও, কিন্তু বাতাস নেই। চারদিকে গুমোট পরিস্থিতি। ঘেমে গেছে কফিল। সিরাজের বাড়ির সামনে আরও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দেখে সাহস বাড়ে কফিলের। দৌড় শুরু করে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায় ওদের। সিরাজ বীরপ্রতীক মলিন মুখে হাত ধরে কফিলের, বাড়ি থেকে এসেছ?

– হ্যাঁ।

– পথের অবস্থা কী?

– পথের অবস্থা তো দেখলাম স্বাভাবিক। কয়েকজন কৃষক হালচাষ করতেছে। তাদের কাছে ঘটনা জানতে চাইলাম, উৎসাহ দেখলাম না। কিন্তু আমরা কী করব? বসে বসে সব মেনে নেব?

– আমাদের কী করার আছে? পালটা প্রশ্ন করে সিরাজ বীরপ্রতীক।

কাশি দিয়ে কথা বলতে শুরু করে সিনিয়র মুক্তিযোদ্ধা আমীর হোসেন, আমি বাহাত্তর সালেই বলেছিলাম মুক্তিযোদ্ধাদের হাতের অস্ত্র হাতেই থাক। এই রকম পরিস্থিতি হলে যেন আমরা মোকাবিলা করতে পারি। আজ আমার কথা তো সত্য হলো।

– আমীর ভাই, এইটা কোনো কথা হলো? অস্ত্র জমা দিয়েছি বঙ্গবন্ধুর ডাকে, বলতে থাকে কফিলুদ্দিন। যুদ্ধ শেষ, দেশ স্বাধীন করেছি। আমাদের তিনি দেশ গড়তে বলেছেন। মানুষ হত্যা করতে তো বলেন নাই।

– তুমি কী বলতে চাও?

– আমি কী বলব? আমি মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার? কমান্ডার তো আপনি। যা বলার আপনি বলবেন। সেজন্যই তো এতদূর দৌড়াইয়া আসলাম– জবাব দেয় কফিলুদ্দিন।

– অস্ত্রশস্ত্র থাকলে একটা কিছু করা যাইতো– জিহ্বা কামড়ায় সিরাজ বীরপ্রতীক।

ঘাড় সোজা করে উত্তর দেয় কফিলুদ্দিন, অস্ত্র না হয় জমা দিয়েছি কিন্তু ট্রেনিং তো জমা দিই নাই। চলেন, নামেন। অস্ত্রের অভাব হবে না।

কফিল, কাঁধে হাত রাখে সিরাজ বীরপ্রতীক, পুরো একটা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা কী করতে পারি? সেনাবাহিনীর মধ্যে আমাদের লোক আছে। ঘটনা তো ঘটে গেছে। এখন পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি জানতাম বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করা হয়েছে, আমরা লাখ লাখ মুক্তিযোদ্ধা ছুটে যেতাম। তাঁকে মুক্ত করে আনতাম। কিন্তু এখন এই পরিস্থিতিতে যা কিছু করব ভেবেচিন্তে করতে হবে। বাড়ি যাও, দু-একটা দিন যেতে দাও। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেব। তাছাড়া... থেমে যায় সিরাজ বীরপ্রতীক।

– তাছাড়া কী?

– ইন্ডিয়া কী চায়, সেটাও আমাদের ভাবতে হবে।

ক্ষেপে ওঠে কফিল, আপনি কী যে বলেন, বুঝি না। আমাদের নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। প্রতিশোধ নেব আমরা, এখানে ইন্ডিয়ার কী করার আছে?

তুমি বিশ্ব রাজনীতি বোঝো না কফিল, সান্ত্বনার স্বরে বলে সিরাজ, বিশ্ব রাজনীতি বড়ো কঠিন। তুমি কী মনে কর বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে কেবল আমাদের সেনাবাহিনী জড়িত? আমি মনে করি না। আমার মনে হয়, পেছনে অনেক বড়ো শক্তি আছে। যারা...

– থাকেন আপনি আপনার বিশ্ব রাজনীতি লইয়া। আমি গেলাম– কফিলুদ্দিন ঝড়ের মতো ছোটে।

পাগল একটা, পেছনে থেকে বিদ্রুপের স্বরে বলে সিরাজ বীরপ্রতীক। মাথা ভরা আবেগ। বাস্তবতা বুঝতে চায় না। আরে তোর চেয়ে শেখ মুজিবকে আমি কম ভালোবাসি?

ছুটতে ছুটতে দুপুরের আগে বাড়ি আসে কফিলুদ্দিন। বসে পড়ে বারান্দায়। ক্রোধে-আক্রোশে চোখ রক্তবর্ণ। হায়, যে মানুষটার ছবি বুকে নিয়ে যুদ্ধ করেছি, যাঁর নামে সাড়ে সাত কোটি মানুষ এক কাতারে দাঁড়িয়েছিল, সেই মানুষটির নির্মম মৃত্যুতে কেন প্রতিবাদ হবে না? বাঙালি এতটা নেমকহারাম? আমরা এতটা প্রতারক? কফিলের ভাবনার মধ্যে ভাতের থালা নিয়ে সামনে দাঁড়ায় সুলতানা।

– কোথায় ছিলেন? নেন, ভাত খান। বাড়িয়ে ধরে ভাতের থালা। এক

ঝটকায় ভাতের থালা ফেলে দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কফিলুদ্দিন হাউমাউ শব্দে কাঁদতে শুরু করে। হঠাৎ বাবার কান্না শুনে এগারো বছরের মেয়ে পুষ্প দৌড়ে আসে বারান্দায়। তাকায় মায়ের দিকে।

– বাবা কাঁদছে কেন?

ধরা গলায় জবাব দেয় সুলতানা, বঙ্গবন্ধুর জন্য কাঁন্দে।

পুষ্প বসে বাবার পাশে। হাত রাখে কফিলের বুকের ওপর, বাবা আমারও কান্না আসছে।

মেয়েকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে আরো বেদনায় কাঁদতে থাকে কফিলুদ্দিন, মারে আমার বুকটা ভাইঙ্গা যাইতেছে। এমন সোনার মানুষটারে মারলো কোন নমরুদে? মারে...।

তিন দিন তিন রাত কফিলুদ্দিন ঘরের ভেতর। কোথাও যায় না। পাশের ছোটো ভগ্নিপতির বাড়ি থেকে রেডিও সেট এনেছে। শুনছে আকাশবাণী, বিবিসি আর ভয়েজ অব আমেরিকা-এর খবর। যত শোনে তত বেদনায়, হতাশায় নিজের ভেতরে ভেঙে পড়ে। সুলতানা, পুষ্প বসে থাকে পাশে। খাওয়া দাওয়া বন্ধ। সুলতানা অনেক অনুরোধ করেছে। কফিলুদ্দিন বলেছে, নেতার হত্যার প্রতিবাদ না করে আমি কেমনে মুখে দানা দিই?

– আপনে একলা কী করবেন?

– কেউ না করলে আমি করমু।

– আপনেরে ওরা আস্ত রাখবে? সিকদার বাড়ির কালাম সিকদার দুইটা গরু কিনেছে। কাল এলাকার লোকদের খাওয়াবে নওয়াব আলির নামে।

একাত্তরে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান নওয়াব আলি এলাকার যে যে ঘর থেকে মুক্তিযুদ্ধে গেছে, পাকিস্তানি মিলিটারি ডেকে এনে প্রত্যেকের ঘরে আগুন দিয়েছে। বিশেষ করে আজগর হোসেনের বাবা-মার ঘরে আগুন দেওয়ার আগে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে পুড়িয়ে মেরেছে। কারণ পারিবারিক বিরোধ ছিল আজগরদের সঙ্গে। আরো অপরাধ, আজগর মুক্তিযোদ্ধা। পাশাপাশি বাড়ি।

অনেক মেয়েকে নিজে উপস্থিত থেকে তুলে দিয়েছে পাকিস্তানি আর্মির গাড়িতে। মেয়ে, বধূদের চিৎকার নেত্রকোনার আকাশ-বাতাস মাতম করেছে। ক্যাম্পে বসে সব খবরই পায় কফিলুদ্দিন। অক্টোবরের শেষ দিকে অপারেশন করতে এসে প্রথম সুযোগেই ধরে ফেলে নওয়াব আলিকে। কিন্তু নওয়াব আলি নির্বিকার।

গুলি করার জন্য তাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল কফিল, কেন সে নিজের দেশের বিরুদ্ধে কাজ করেছে?

নির্বিকার লোকটি বলেছিল, আমি পাকিস্তানের মৃত্যু চাই না। পাকিস্তান না থাকলে দুনিয়ায় ইসলাম থাকবে না।

ঠাস করে থাপ্পড় মারে কমান্ডার, এই ব্যাটা পাকিস্তানের বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। অথচ দুনিয়ায় ইসলাম আছে শত শত বছর ধরে। ইসলামের সঙ্গে পাকিস্তানের কী সম্পর্ক? পাকিস্তানিরা যে আমাদের হত্যা করছে, ভাষা কেড়ে নিতে চাইছে তার কোনো মূল্য নেই তোর কাছে? না, তোকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। ফায়ার! সঙ্গে সঙ্গে কফিলুদ্দিনের রাইফেল গর্জে ওঠে। নওয়াবের বুকে একটা ধাক্কা লাগে। লুটিয়ে পড়ে মাটির ওপর। লাশটা ফেলে রেখেছিল ছাড়াবাড়ির শকুনের ভাগাড়ের কাছে। যাতে শকুনেরা সকল অস্থিমজ্জা খেয়ে ওকে বাংলার মাটি থেকে চিরকালের জন্য উৎখাত করে। আজ সেই নওয়াব আলির জন্য দু-দুটো গরু জবাই হচ্ছে! অনেকেই যাবে সেই মাংস খেতে। বাঙালি না যেয়ে পারে না। এরাই তো নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে গিয়ে ইংরেজ বেনিয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। বাঙালি যাবেই...।

– বৌ? ডাকে কফিলুদ্দিন।

দৌড়ে আসে সুলতানা, ভাত দিব?

– না, ট্রাংক থেকে পতাকাটা দাও।

সুলতানা বুঝতে পারে না, এখন পতাকা দিয়ে কী করবে কফিল। প্রত্যেক বছরের ছাব্বিশে মার্চ আর ষোলোই ডিসেম্বর নিজের হাতে বাড়ির সামনে পতাকা ওড়ায় কফিল। সঙ্গে থাকে পুষ্প, আশপাশের লোকজন। আজকে কি শেখ মুজিবের জন্য পতাকা ওড়াবে? পতাকা ওড়াতে গেলে কালাম সিকদারেরা কি আস্ত রাখবে? কানাঘুষায় জেনে গেছে সুলতানা– কালাম সিকদারেরা এক জোট হচ্ছে।

– দাঁড়াইয়া আছো কেন? তাড়াতাড়ি দাও। হাতে টাইম নাই।

সুলতানা ট্রাংক থেকে পতাকা এনে হাতে দেয়। পাশে বসা পুষ্পর হাত ধরে কফিল, চলো মা।

– চলো।

দুজনে বের হয়ে যায়। হতবাক সুলতানা কিছুই বুঝতে পারে না, বাবা আর মেয়ে কোথায় যাচ্ছে? যাবার সময়ে টানানো শেখ মুজিবের ছবিটা নেয় কফিল। মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে সুলতানার।

বাড়ির পাশে, বড়ো রাস্তার কাছেই বাজার। পুষ্পর হাত ধরে কফিলুদ্দিন বাজারে একটা চক্কর দেয়। সব স্বাভাবিক। কেউ মরিচ বিক্রি করছে। কেউ মাছ কিনছে। কেউ ডাল কিনছে। কেউ মাছের দরদাম করছে। মন্টু ঘোষের দোকান আজও বন্ধ। বেশ কয়েকজন কফিলের দিকে অন্যচোখে তাকায়। কফিল পরোয়া করে না।

দাঁড়ায় বাজারের মাঝখানে। পুষ্পকে ইশারা করলে, পুষ্প পতাকা বের করে দুহাতে মাথার উপর মেলে ধরে। বুকের সঙ্গে উলটো করে রাখা শেখ মুজিবের ছবিটা সোজা করে বুকের সঙ্গে চেপে কফিল আকাশ–বাতাস মথিত করে স্লোগান দেয়, 'জয় বাংলা'।

মনে হলো বাজারের মানুষের মধ্যে একটা নিঃশব্দ বোমা ফাটল। হতভম্ব, হতচকিত। কেউ কেউ ভয়ার্ত চোখে তাকায় এদিক-ওদিক। বোঝার চেষ্টা করছে, ঘটনা ঘটছে কী?

আবার স্লোগান, জয় বাংলা। প্রতি উত্তরে পুষ্পর নরম গলা, জয় বাংলা।

কফিলুদ্দিন বাজারে হাঁটতে শুরু করে, সঙ্গে পুষ্প। মুখে স্লোগান– শেখ মুজিবের রক্ত, পুষ্প জবাব দেয়, বৃথা যেতে দেব না। মাছ বিক্রেতা কেরামত উঠে দাঁড়ায়, হাত তোলে। কণ্ঠ মিলায় কফিলের সঙ্গে– জয় বাংলা। কেরামতের দেখাদেখি সবজি বিক্রেতা মোমিন এসে হাত ধরে পুষ্পর, মুখে স্লোগান ধরে, বৃথা যেতে দেব না। উঠে আসে জলিল ঘরামি, শেখ মুজিবের রক্ত। মুদি দোকানের ঝাপ ফেলে যুক্ত হয় সালাম সিকদার, কালাম সিকদারের চাচাতো ভাই। স্লোগানের অগ্নিবাণে জমাট বাঁধা মানুষগুলোর ভেতরের বরফ উত্তপ্ত হতে শুরু করে। ধসে পড়া দেয়ালের মতো এক একটি ইট খসে পড়তে থাকে। ফলে মিনিট খানেকের মধ্যে বিশ-পঁচিশ জনের একটি দল জন্ম নেয়। সবাই মিলিত প্রবাহে স্লোগান ধরে– জয় বাংলা : জয় বাংলা। শেখ মুজিবের রক্ত : বৃথা যেতে দেব না। বাজার ঘুরে বড়ো রাস্তায় উঠতে উঠতে শ দুয়েক মানুষের মিছিলে রূপান্তরিত হয় কফিলুদ্দিন আর পুষ্পের শুরু করা মিছিল। যত সামনে এগুচ্ছে স্লোগানের শব্দ শুনছে, তত মানুষ যুক্ত হচ্ছে। বড়ো রাস্তা ধরে মিছিল যত সামনে এগুচ্ছে মিছিলের আয়তন তত বাড়ছে বন্যার মতো, ভূমিকম্পের মতো, বজ্রকণ্ঠের মতো, বিশাল বঙ্গোপসাগরের মতো। মিছিল বাড়ছেই...। তাদের মিলিত স্লোগান, শেখ মুজিবের রক্ত : বৃথা যেতে দেব না। বৃথা যেতে দেব না।

লেখক: কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার; কৃতজ্ঞতা: মাসিক 'পরিবার'

প্রবন্ধ

জনকের কারাবাস

সাঈদ তপু

বঙ্গবন্ধু ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহসী, আপোশহীন, মুক্তিকামী নেতা। ভাগ্যগুণে বাঙালি তাঁর মতো একজন হিমালয়তুল্য মহামানব পেয়েছিল। দেশের মাটি ও মানুষের পাশে থেকে তিনি আজীবন উপনিবেশ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। এই সংগ্রামী জীবনে তিনি অসংখ্যবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। সংক্ষেপে তাঁর কারাবাস যাপন তুলে ধরা হলো:

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবনের প্রথম কারাবরণের কথা লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে। সেখানে তিনি তাঁর জেল-জুলুমের বিবরণ দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর লেখা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'র বর্ণনা মতে- 'হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটু আড়াআড়ি চলছিল। গোপালগঞ্জ শহরের আশপাশেও হিন্দু গ্রাম ছিল। দু'একজন মুসলমানের ওপর অত্যাচারও হলো। আব্দুল মালেক নামে আমার এক সহপাঠী ছিল। সে খন্দকার শামসুদ্দীন সাহেবের আত্মীয় হতো। একদিন সন্ধ্যায়, আমার মনে হয় মার্চ বা এপ্রিল মাস হবে, আমি ফুটবল মাঠ থেকে খেলে বাড়িতে এসেছি, আমাকে খন্দকার শামসুল হক ওরফে বাসুমিয়া মোক্তার সাহেব (পরে মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন) ডেকে বললেন, 'মালেককে হিন্দুসভার সভাপতি সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে ধরে নিয়ে মারপিট করছে। যদি পারো একবার যাও। তোমার সাথে ওর বন্ধুত্ব আছে বলে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসো।' আমি আর দেরি না করে কয়েকজন ছাত্র ডেকে নিয়ে ওদের ওখানে যাই এবং অনুরোধ করি ওকে ছেড়ে দিতে। রমাপদ দত্ত নামে এক ভদ্রলোক আমাকে দেখেই গাল দিয়ে বসল। আমিও তার প্রতিবাদ করলাম এবং আমার দলের ছেলেদের খবর দিতে বললাম। এরমধ্যে রমাপদ থানায় খবর দিয়েছে। তিনজন পুলিশ এসে হাজির হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম 'ওকে ছেড়ে দিতে হবে, নাহলে কেড়ে নেব।' আমার মামা শেখ সিরাজুল হক তখন হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করতেন। তিনি আমার মা ও বাবার চাচাতো ভাই। নারায়ণগঞ্জে আমার এক মামা ব্যবসা করতেন, তার নাম জাফর সাদেক। আমি খবর দিয়েছি শুনে দলবল নিয়ে ছুটে এসেছেন। এর মধ্যেই আমাদের সাথে মারপিট শুরু হয়ে গেছে। দুই পক্ষে ভীষণ মারপিট হয়। আমরা দরজা ভেঙে মালেককে কেড়ে নিয়ে চলে আসি।

শহরে খুব উত্তেজনা। আমারে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। সেদিন রবিবার। আব্বা বাড়ি গিয়েছিলেন। পরদিন ভোরবেলা আব্বা আসবেন। বাড়ি গোপালগঞ্জ থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে। আব্বা শনিবার বাড়ি যেতেন আর সোমবার ফিরে আসতেন। নিজেরই নৌকা ছিল। হিন্দু নেতারা রাতে বসে অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা মামলা দায়ের করল। হিন্দু নেতারা থানায় বসে একটা এজাহার ঠিক করে দিলেন। তাতে খন্দকার শামসুল মোক্তার সাহেব হুকুমের আসামি। আমি খুন করার চেষ্টা করেছি। লুটপাট, দাঙ্গাহাঙ্গামা লাগিয়ে দিয়েছি। ভোরবেলায় আমার মামা, মোক্তার সাহেব, খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদ এমএলএ সাহেবের মুহুরি জহুর শেখ, আমার বাড়ির কাছের বিশেষ বন্ধু শেখ নুরুল হক ওরফে মানিক মিয়া, সৈয়দ আলী খন্দকার, আমার সহপাঠী আবদুল মালেক ও অনেক ছাত্রের নামে এজাহার দেওয়া হয়েছিল। কোনো গণ্যমান্য লোকের ছেলেদের বাকি রাখে নাই। সকাল ন'টায় খবর পেলাম আমার মামা ও আরো অনেককে গ্রেফতার করে ফেলেছে। আমাদের বাড়িতে কী করে আসবে– থানার দারোগা সাহেবদের একটু লজ্জা করছিল। প্রায় দশটার সময় টাউন হলের মাঠের ভিতরে দাঁড়িয়ে দারোগা আলাপ করছে, তার উদ্দেশ্য হলো আমি যেন সরে যাই। টাউন হলের মাঠের পাশেই আমার বাড়ি।... আমার ফুফাতো ভাই আমাকে বলে, 'মিয়াভাই পাশের বাসায় একটু সরে যাও না।' বললাম 'যাব না। আমি পালাবো না। লোকে বলবে, আমি ভয় পেয়েছি।'

এই সময় আব্বা বাড়ি ফিরে এসেছেন। দারোগা সাহেবও তাঁর পিছে পিছে বাড়িতে ঢুকে পড়েছেন। আব্বার কাছে বসে আস্তে আস্তে সকল কথা বললেন। আমার গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখালেন। আব্বা বললেন, 'নিয়ে যান।' দারোগা বাবু বললেন, 'ও খেয়ে-দেয়ে আসুক, আমি একজন সিপাহি রেখে যেতেছি, এগারোটার মধ্যে যেন থানায় পৌঁছে যায়। কারণ, দেরি হলে জামিন পেতে অসুবিধা হবে।' আব্বা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মারামারি করেছ?' আমি চুপ করে থাকলাম, যার অর্থ 'করেছি'।

আমি খাওয়া -দাওয়া করে থানায় চলে এলাম। দেখি আমার মামা, মানিক, সৈয়দ আরো সাত-আটজন হবে, তাদেরকে পূর্বেই গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে এসেছে। আমার পৌঁছার সাথে সাথে কোর্টে পাঠিয়ে দিল। হাতকড়া দেয় নাই, তবে সামনেও পুলিশ, পেছনেও পুলিশ। কোর্টে দারোগা হিন্দু ছিলেন। কোর্টে পৌঁছার সাথে সাথে আমাদের কোর্ট হাজতের ছোটো কামরার মধ্যে বন্ধ করে রাখলেন। কোর্টে দারোগার রুমের পাশেই কোর্ট

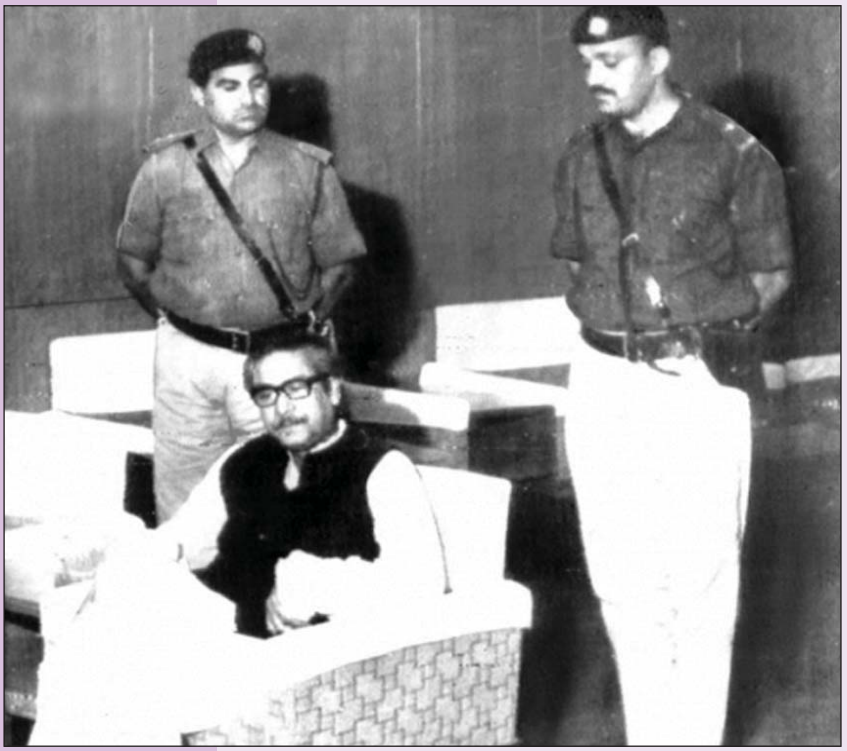

পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগারের জেলারের বাসায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

হাজত। আমাকে দেখে বলেন, 'মুজিবর ভয়ানক ছেলে। ছোরা মেরেছিল রমাপদকে। কিছুতেই জামিন দেওয়া যেতে পারে না। 'আমি বললাম, বাজে কথা বলবেন না, ভালো হবে না।' যারা দারোগার সামনে বসেছিলেন, তাদের বললেন, 'দেখ ছেলের সাহস।' আমাকে অন্য সকলে কথা বলতে নিষেধ করল। পরে শুনলাম, আমার নামে এজাহার দিয়েছে এই কথা বলে যে, আমি ছোরা দিয়ে রমাপদকে হত্যা করার জন্য আঘাত করেছি। তার অবস্থা ভয়ানক খারাপ। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে রমাপদের সাথে আমার মারামারি হয় একটা লাঠি দিয়ে, ও আমাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করলে আমিও লাঠি দিয়ে প্রত্যাঘাত করি। যার জন্য ওর মাথা ফেটে যায়। মুসলমান উকিল মোক্তার সাহেবরা কোর্টে আমাদের জামিনের আবেদন পেশ করল। একমাত্র মোক্তার সাহেবকে টাউন জামিন দেওয়া হলো আর আমাদের জেল হাজতে পাঠানোর হুকুম হলো। এসডিও হিন্দু ছিল, জামিন দিল না। কোর্টে দারোগা আমাদের হাতকড়া পরাতে হুকুম দিল। আমি রুখে দাঁড়ালাম, সকলে আমাকে বাধা দিল, জেলে এলাম। সাবজেল, একটা মাত্র ঘর। একপাশে মেয়েদের থাকার জায়গা, কোনো মেয়ে আসামি না থাকার জন্য মেয়েদের ওয়ার্ডে রাখল। বাড়ি থেকে বিছানা, কাপড় এবং খাবার দেবার অনুমতি দেওয়া হলো। শেষ পর্যন্ত সাতদিন পরে আমি প্রথম জামিন পেলাম। দশ দিনের মধ্যে আর সকলেই জামিন পেয়ে গেল।

হক সাহেব ও সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে টেলিগ্রাম করা হলো। লোকও চলে গেল কলকাতায়। গোপালগঞ্জে ভীষণ উত্তেজনা চলছিল। হিন্দু উকিলদের সাথে আব্বার বন্ধুত্ব ছিল। সকলেই আমার আব্বাকে সম্মান করতেন। দুই পক্ষের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়ে ঠিক হলো মামলা তারা চালাবে না। আমাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ১৫০০ টাকা। সকলে মিলে সেই টাকা দিয়ে দেওয়া হলো। আমার আব্বাকেই বেশি দিতে হয়েছিল। এই আমার জীবনে প্রথম জেল।'

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ কারারুদ্ধ হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে ঢাকায় সেক্রেটারিয়েট ভবনের সামনে পিকেটিং করতে গিয়েই তিনি গ্রেফতার হয়েছিলেন। পাকিস্তানি শাসনের ২৪ বছরের মধ্যে ১২ বছরই বঙ্গবন্ধুকে কারাজীবন বরণ করতে হয়েছিল। কখনো বছরে তিনবার, কখনো এক সাথে তিন বছর (১৯৬৬-১৯৬৯) কারাভোগ করেছেন। আবার কখনো ১৭-১৮ মাস বন্দি থাকার পর মুক্তি পেয়ে জেলগেটে পুনরায় গ্রেফতার হন। ১৯৪৮-১৯৫৪ সালের মধ্যে তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেন এবং একনাগাড়ে ২৭ মাস পর্যন্ত কারাভোগ করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট বাতিলের পর তিনিই ঐ মন্ত্রিসভার একমাত্র সদস্য ছিলেন যাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসন জারি করে সকল প্রকার রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯৫৮ সালের ১১ই অক্টোবর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় এবং একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হয়। প্রায় চৌদ্দ মাস জেলখানায় থাকার পর তাঁকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেটে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬০ সালের ৭ই ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট আবেদন করে তিনি মুক্তি লাভ করেন। আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধু গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। সে কারণে ১৯৬২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬২ সালের ১৮ই জুন মুক্তি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের জন্য বঙ্গবন্ধুকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৫ সালে তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। ঐ মামলায় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে। পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ১৯৬৬ সালের ১লা মার্চ তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ঐতিহাসিক ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে তিনি গণসংযোগ শুরু করেন। এ সময় সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বার বার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

ঐ বছর প্রথম তিন মাসে তিনি ৮ বার গ্রেফতার হন। ৮ই মে নারায়ণগঞ্জ পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা শেষে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৮ সালের ৩রা জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ১৭ই জানুয়ারি তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেট থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয়।

১৯৬৯ সালের ৫ই জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করে। জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে ২২শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য আসামিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এভাবে পশ্চিমা শাসকদের শোষণ ও অত্যাচারে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন আরো দানা বাঁধতে থাকে। আসে ৭০-এর জাতীয় নির্বাচন। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। বরং ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাত্রিতে নিরীহ, নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত ১২টা ২০ মিনিটে (২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইংরেজিতে প্রচারিত সে ঘোষণার অনুবাদ–'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন, বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।' এই ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়্যারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান এক ভাষণে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেন। এর বিপরীতে ওই তারিখেই অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন।

বাঙালিদের মুক্তি সংগ্রাম শুরু হওয়ার চূড়ান্ত মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুকে বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে বলা সত্ত্বেও তাঁর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবন ছেড়ে যাননি। অতঃপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রাত ১টা ১০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায়। পরদিন ২৬শে মার্চ তাঁকে বিমানে করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে নয় মাস চৌদ্দ দিন বন্দি রাখা হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে। বিজয়ের অল্প কিছু দিন পর ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্ত হয়ে তাঁর কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

জীবনভর বঙ্গবন্ধু জেল-জুলুম, ভয়-ভীতি তথা মৃত্যুর পরোয়া না করে দেশের সাধারণ, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের অধিকার আদায়ের জন্য। এনে দিয়েছেন স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বাংলাদেশ। বিশ্ব মানচিত্রে এঁকে দিয়েছেন লাল-সবুজ পতাকা।

লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক

প্রবন্ধ

১৫ই আগস্ট বাঙালি জাতির বেদনার দিন

অপু বড়ুয়া

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদের আঁকা বিখ্যাত চিত্রকর্ম

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রাম। সেই গ্রামের নামকরা শেখ বাড়ি। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ এই বাড়ির শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের ঘর আলোকিত করে এক ফুটফুটে ছেলের জন্ম হয়। প্রথম ছেলে তাই সবাই আদর করে নাম রাখলেন খোকা। ভালো নাম রাখা হলো শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিব মানে হলো ত্রাণকর্তা। আর এই খোকাই একদিন বড়ো হয়ে হলো গোটা জাতির ত্রাণকর্তা।

পরিবার-পরিজনের নিবিড় পরিচর্যায় বড়ো হতে থাকে প্রাণের মানিক খোকা। হাঁটিহাঁটি পা পা করে সাত বছরে পা দিল আদরের খোকা। ১৯২৭ সালে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হলো শিশু মুজিবকে। স্কুলে যাওয়া–আসার পথে গ্রামের পরিবেশে গরিব ছন্নছাড়া মানুষের অবয়ব তাঁকে ভাবিয়ে তুলতো–মানুষ কেন গরিব হয়? ঠিক ভাবে খেতে পারে না, সময় মতো চিকিৎসা সেবা পায় না ইত্যাদি। শৈশবকাল থেকে এসব দেখে দেখে ভেবে ভেবে বড়ো হতে থাকেন মুজিব। আর তিনি মানুষের, সমাজের ভাগ্য বদলের উপায় খোঁজার চেষ্টা করেন মনেপ্রাণে। উদার আর মমতায় আচ্ছন্ন মুজিব এর গরিব দেখলেই মনপ্রাণ কেঁদে উঠত। স্কুলে আসতে–যেতে পথে কাউকে ভিজতে দেখলে নিজের ব্যবহারের ছাতা দিয়ে দিতেন। কিংবা শীত মৌসুমে কেউ শীতে কষ্ট পেলে গায়ের সোয়েটার খুলে দিতেন আবার বড়োজন হলে পরিহিত চাদর দিয়ে দিতেন অনায়াসে। বাড়ি ফিরে বাবা-মার প্রশ্নের আগেই তিনি বলতেন, আমার ব্যবহার্য জিনিস দিয়ে আমি দুঃখী মানুষকে, শীতার্তদের হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেছি। বাবা শেখ লুৎফর রহমান আর মা শেখ সায়েরা খাতুন ছেলেকে দুই চোখ ভরে দেখে আনন্দ অশ্রুতে বুকে টেনে নিলেন। বাবা-মা বুঝতে পারলেন ছেলেটি সবার মতো নয়। খোকা অন্যরকম, তাঁকে জড়িয়ে ধরে প্রাণ ভরে দোয়া করলেন।

মা–বাবার দোয়া বলে কথা। সত্যি সত্যি তা-ই হলো। বিপণ্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোই তাঁর চাওয়া–পাওয়া। তিনি স্বপ্ন দেখেন স্বাধীনতার, তিনি স্বপ্ন দেখেন মাতৃভাষা বাংলার, আরো কত কী! লেখাপড়ার ফাঁকতালে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন, নির্বিচারে জেল খেটেছেন। সোনা পুড়লে যেমন খাঁটি হয় তেমনি তিনি প্রিয় হয়ে উঠলেন গণমানুষের। সর্বোপরি তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের পুরো ৯ মাস কারারুদ্ধ প্রিয় মানুষটির সাহসিকতার কথা শুনলে গা শিউরে উঠে। সুদীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর হাতে অকাতরে প্রাণ দিতে হলো এদেশের কবি, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সৈনিক, কৃষক, ছাত্রছাত্রীসহ জনসাধারণকে। বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজের বাংলাদেশ। মাতৃভাষা বাংলা। দেশের মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা নির্ভীক মানব শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করল। ১৯৭২ সালে প্রিয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত করা হলো। গণমানুষের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান জাতির পিতায় আখ্যায়িত হলেন। তিনি বঙ্গবন্ধু, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তিনি ভাবতেন দেশ-জাতি-সমাজ নিয়ে। পরোপকারী মানুষ, তাঁর কোনো শত্রু থাকতে পারে না। কেনই বা থাকবে? যাঁর কণ্ঠে সাড়া দিয়ে লাখো কোটি মানুষ হানাদার পাক-বাহিনীকে পরাজিত করে ৩০ লাখ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, স্বাধীন দেশে তাঁর আবার শত্রু কিসের? কিন্তু না। দেশের শত্রু বিভীষণ। কিছু বিপথ গামী সেনাসদস্য ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোর রাতে এই মহান পুরুষকে সপরিবারে ধানমন্ডির ৩২ নাম্বার রোডের বাড়িতে বুলেটের আঘাতে হত্যা করে। হত্যা করে হাজারো স্বপ্নের মহান স্রষ্টাকে। এই বঙ্গের বঙ্গবন্ধুকে। যে জাতি পিতাকে হত্যা করে সে জাতি চির কলঙ্কিত। ইতিহাসের পাতায় আর মনের কোঠায় কলঙ্কের এই দাগ মুছতে বাঙালি জাতি আরো হাজার বছরে পারবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। আজ জাতির বেদনার শোকের দিনে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই, কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। বঙ্গবন্ধুর রচিত বাংলাদেশের মাটিতে আমরা আছি, আমরা থাকব।

লেখক: গীতিকার, বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন

বাঙালি হৃদয়ে তুমি অমর প্রতিকৃতি

দেলওয়ার বিন রশিদ

এইখানে সর্বত্র তুমি, তোমার নামে প্রত্যহ
নতুন প্রেরণা
তুমি সমৃদ্ধ বাংলা, উর্বরা পলি
সবুজে-লাল পতাকা
তুমি আকাঙ্ক্ষা, জাগরণ, তুমি গণতন্ত্র, তুমি সার্বভৌমত্ব
বাগানে বাগানে সুশোভিত কুসুমরাজি তোমার নামে
সৌরভ ছড়ায়
প্রতি মুহূর্তে, প্রতিক্ষণ।
বাঙালি হৃদয়ে তুমি অমর প্রতিকৃতি
তুমি বাঙালির স্বপ্নবৈভব
চিরকালের রাজপুত্তুর,
মায়ের মুখে তোমারই গল্পগাথা শিশু কান পেতে শোনে
তুমি স্বপ্নের পৃথিবী।
তুমি পদ্মা- মেঘনা-যমুনার উত্তাল ঢেউ
ঝড়-ঝঞ্ঝায় মাঝির শক্তি সাহস বল
তুমি বাংলার সবুজ স্নিগ্ধতা, আনন্দ কুসুম
তুমি একুশে ফেব্রুয়ারি, তুমি জয় বাংলা
তুমি স্বাধীনতা, তুমি বিজয়ের গান
তুমি বাঙালির আলোকিত ভোর
তুমি ছাড়া বাংলাদেশ অনুর্বর, অন্তঃসারশূন্য
অচেনা দ্বীপ।
তুমি সর্বত্রই এই বাংলার সর্বত্রই তোমার পদচ্ছাপ
বাংলার সবুজে সবুজ ঘাসে তৃণলতায়
তোমার স্পর্শ যে ছড়িয়ে আছে,
সবখানে তুমি দীপ্যমান।
শোকে বিহ্বল বাঙালির দৃষ্টি তোমার ছবিতে স্থির হয়ে থাকে
তুমি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
হৃদয়ে তোমার অজেয় অমর নাম
তুমি বাঙালির নতুন দিন, স্বপ্ন সম্ভার, সম্পূর্ণ বাংলাদেশ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

জিয়াউল হক জুয়েল

আমার দেশের নয়নমণি শেখ মুজিবুর রহমান ,
জন্ম দিয়ে ধন্য পিতা শেখ লুৎফর রহমান।
গর্বিত মা সায়রা খাতুন, শেখ মুজিবের জননী,
বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা, শেখ মুজিবের ঘরনি।
বঙ্গমাতার কোলে এল গর্বিত সেই কন্যা,
তিনি তো সবার প্রিয় জননেত্রী শেখ হাসিনা।
জন্ম নিয়ে শেখ মুজিবুর, দেশের জন্য করল পণ,
তাইতো হলো বাঙালিরা বঙ্গবন্ধুর আপনজন।
উচ্চকণ্ঠে ভাষণ দিলেন, রেসকোর্স ময়দান,
কোটি জনতা তাঁর ডাকে যুদ্ধে করে যোগদান।
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে কেঁপে উঠে শহর-গ্রাম,
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম
শেখ মুজিবকে বিশ্ববাসী করল নেতা গণ্য,
ধন্য হলো বাঙালিরা, বঙ্গবন্ধুর জন্য।
হায়েনারূপী মানুষগুলো হরণ করল তাঁর জীবন,
সেই ঘটনার ইতিহাস পড়ে মনে লাগে আজও শিহরণ।
ফুলের মতো শেখ রাসেলের জীবনটাও তো গ্রাস করে,
সেই নিষ্ঠুর কাণ্ড শুনে বুকটা কাঁপে থর থর।
এই বাংলার হতো না জন্ম বঙ্গবন্ধুর হাত ছাড়া,
আজও তুমি ঘুমিয়ে আছ, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া।
লাল-সবুজের পতাকা তুমি উঠালে মুজিব নগরে,
বঙ্গবন্ধু মরনি আজও আছ বাংলার ঘরে ঘরে।

বঙ্গবন্ধু

আবুল হোসেন আজাদ

বিষণ্ন ভোর সাঁতরে এ কোন সকাল
সূর্যালোকের রশ্মি অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার
আপামর জনতা বাকরুদ্ধ হতবিহ্বল যন্ত্রণায় অস্থির
চোখ অশ্রু সজল বেদনার্ত কালিমালিপ্ত মুখচ্ছবি
বঙ্গবন্ধু নেই; অবিশ্বাস বাতাসের ইথারে এল খবর।

শোকার্ত ফুলকলিরা পাঁপড়ি মেলল না
ছড়ালো না সৌরভ; পাখিরা সুর মুর্চ্ছনায় ভাঙালো না
ভোরের সৌম্য নিস্তব্ধতার ঘুম
প্রজাপতি ডানা ভাসালো না ফুলে ফুলে
মানুষরূপী হিংস্র হায়নার ক্রুর আঘাতে।

বঙ্গবন্ধুর- 'কি চাস তোরা' দৃঢ়দৃপ্ত বজ্রকণ্ঠ
থেমে গেল ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়ির সিঁড়িতে রক্তে রক্তে
বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা
শহিদ হলেন পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট ভোর রাতে
গোটা জাতি শোকে মুহ্যমান প্রিয় হারায়।

ওরা চেয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করে
বাংলার জমিন থেকে চিরতরে বনবাসে পাঠাতে,
সে কি সম্ভব? কৃতজ্ঞ জাতি ভুলিনি–
ভুলিনি তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস
তিনি আছেন বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে
ফুল-পাখি-নদী-ঝর্ণা-সাগরে-পাহাড়ে
আকাশে-বাতাসে এদেশের প্রতিটি ধূলিকণায়।

লাল-সবুজের নিশান ওড়ে

এমরান চৌধুরী

একটি জমিন সবুজ জমিন মাঝখানে তার
ঠিক গোলাকার একটি মোহন বৃত্ত।
বৃত্ত তো নয় এই তো সবার
বুকের ভেতর রক্তজবার চিত্ত।
টুকটুকে লাল চিত্তখানার নাম রেখেছি নিশান
সেই নিশানের কী শান।
দেশ চেনা যায় মাঠ চেনা যায় ঘাট চেনা যায়
আর চেনা যায় পথ
লাল-সবুজের নিশান ওড়ে
পতপত পতপত।

একটি গানে জোয়ার আনে আমার প্রাণে
তোমার প্রাণে বাজায় বাঁশি
বাঁশির সুরে অনেক দূরে মন চলে যায়
মন চলে যায় হাতছানি দেয় মজুর চাষি।
এ গানে হয় সকাল-বিকেল
এ গানে হয় রাত
এ গানে হয় সোনার বাংলা
সোনালি প্রভাত।
এই যে নিশান, মায়াবী গান
এবং একটি দেশ
তিনের সাথে একটি মানুষ
প্রথম থেকে শেষ।
আছেন মিশে প্রাণের সুরে
আছেন অবিরাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাই
স্বাধীনতার নাম।

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

১৩ই জুলাই ২০১৭ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জাতীয় কাউন্সিলের ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পুরস্কারপ্রাপ্তদের মাঝে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ –পিআইডি

প্রগতিশীল ও সৃজনশীল জাতি গড়তে স্কাউটিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য একটি আধুনিক, প্রগতিশীল ও সৃজনশীল জাতি হিসেবে নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নিতে স্কাউটিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১৩ই জুলাই ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর ন্যাশনাল কাউন্সিলের ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ভাষণকালে রাষ্ট্রপতি উপরিউক্ত কথাগুলো বলেন।

তিনি বলেন, স্কাউট আন্দোলনের মাধ্যমে শিশু, তরুণ ও যুবকদের আত্মনির্ভরশীল, দেশপ্রেমিক, আত্মবিশ্বাসী ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুললে তারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলার জন্য ভূমিকা রাখতে পারবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, শিশু, তরুণ ও যুবকদের আদর্শ ও মূল্যবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে তৃণমূল পর্যায়ে স্কাউট আন্দোলন কর্মসূচি সম্প্রসারণ করতে এবং একই সঙ্গে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে তরুণ সমাজকে দূরে রাখতে এবং তাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতেও সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি আরো বলেন, স্কাউট আন্দোলনে অসামান্য অবদানের জন্য ৩৫৩ জন পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করি, আগামী দিনে আরো অনেক শিশু-তরুণ ও যুবক স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সামনের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

রাষ্ট্রপতি বর্তমান ১৬ লাখ থেকে ২১ লাখ পর্যন্ত স্কাউট সদস্য বাড়াতে বাংলাদেশ স্কাউট ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ২০২১-এর নেওয়া উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে স্কাউটরা কাজ করতে পারে।

উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করার আহ্বান

১৭ জুলাই বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) উপাচার্য বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করুন, যাতে ছাত্রছাত্রীরা বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সুযোগ নিতে পারে।

তিনি বলেন, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যাতে অনুসরণ করে সে ধরনের গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কাজ করার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই জুলাই তাঁর কার্যালয়ে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী সেবামূলক মনোভাব নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজ করার নির্দেশ দেন।

আর্মি সিলেকশন বোর্ড ২০১৭-এর বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই জুলাই ঢাকা সেনানিবাসের সেনা সদর দফতরে 'আর্মি সিলেকশন বোর্ড ২০১৭'-এর বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী একটি গণতান্ত্রিক দেশে সেনাবাহিনীর খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সেনাবাহিনীতে তাদের কাছেই নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত– যারা সুশিক্ষায় শিক্ষিত, প্রতিযোগিতায় দক্ষ, মেধাবী এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রের প্রতি পুরোপুরি শ্রদ্ধাশীল। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে ৪টি বিশেষ গুণ থাকতে হবে। একজন কমান্ডার, কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষক হওয়ার জন্য প্রথমত সেনা কর্মকর্তাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত তাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। এছাড়া দেশ ও

সমাজের সেবার মানসিকতা এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। তাদের অবশ্যই নেতৃত্বের যোগ্যতা, পেশাগত এক্সিলেন্স, নিয়মানুবর্তিতা, সততা এবং নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রী কর্মকর্তাদের পদোন্নতির জন্য সিলেকশন বোর্ডকেও যোগ্যতার এই মাপকাঠি বিবেচনায় আনার আহ্বান জানান।

একাত্তর নিয়ে স্মারক ডাকটিকেট সংবলিত খাম অবমুক্ত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই জুলাই সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের ওপর আলোকচিত্র সমন্বয়ে ৭১টি স্মারক ডাকটিকেট সংবলিত খাম অবমুক্ত এবং 'গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ' শিরোনামে বিশেষ স্মারক ডাকটিকেট অ্যালবামের মোড়ক উন্মোচন করেন। উন্মোচনের পর থেকে সেগুলো ঢাকা জিপিও'র ফিলাটেলিক ব্যুরো থেকে বিক্রি শুরু হয়েছে।

সরকারের অর্জন প্রচারে মন্ত্রণালয়সমূহকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই জুলাই মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে সরকারের সাফল্য ব্যাপকভাবে প্রচারে আনার জন্য মন্ত্রীদের নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে কী কী কাজ হয়েছে, সরকার কী কী কাজ করছে তা জনগণের সামনে ভালোভাবে তুলে ধরতে হবে। তিনি প্রতিটি মন্ত্রণালয় কী কী কাজ করছে, মন্ত্রণালয়ভিত্তিক অর্জনগুলোকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে, ব্যাপক প্রচারে আনতে হবে বলে উল্লেখ করেন এবং তার তালিকা তৈরি করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন।

নিরাপত্তার নামে জনবিচ্ছিন্ন না করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই জুলাই স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ)-এর ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দরবারে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী জনগণকেই তার মূল শক্তি এবং অনুপ্রেরণার উৎস উল্লেখ করে নিরাপত্তার নামে কাউকে যেন জনবিচ্ছিন্ন করা না হয়, সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকার জন্য এসএসএফ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি এসএসএফ-এর সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, আমাদের মানুষ নিয়েই কাজ। সেই মানুষ থেকে আমরা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাই।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ এবং ১৪২২ প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই জুলাই ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ এবং ১৪২২' প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী ধান কাটা বা ধান লাগানোর মৌসুমে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের গ্রামে সেই ধানক্ষেতের পাশে নিয়ে যাওয়া উচিত বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দেশের মানুষ যাতে কোনোমতে খাদ্যে কষ্ট না পায় সেজন্য অতিরিক্ত খাদ্য আমদানি করে মজুত রাখা হয়েছে। পরে প্রধানমন্ত্রী ১০টি শ্রেণিতে ৫টি সোনা, ৯টি রৌপ্য এবং ১৮টি ব্রোঞ্জপদক প্রদান করেন।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯শে জুলাই কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ'র উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিছু কিছু মানুষের একটু ভেজাল দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এই ভেজাল দিয়ে বেশি মুনাফা করতে গিয়ে একেবারে নিজের ব্যবসারও সর্বনাশ, দেশেরও সর্বনাশ করে। তাই প্রধানমন্ত্রী সামান্য মুনাফার লোভে নিজের ব্যবসা ও দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষতি না করার আহ্বান জানান মৎস্য চাষ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের। তিনি বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশ বিস্তারের জন্য মুক্ত জলাশয়ে অভয়াশ্রম স্থাপন ও এর সংরক্ষণে দেশের মৎস্য খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের আরো তৎপর হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

হজ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে জুলাই আশকোনায় হজ ক্যাম্পে 'হজ কার্যক্রম'-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী হজযাত্রীদের খোঁজখবর নেন এবং দেশের সব ধর্মের মানুষ যাতে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে জুলাই ২০১৭ হজক্যাম্পে 'হজ কার্যক্রম ২০১৭'-এর উদ্‌বোধন শেষে সম্মানিত হজযাত্রীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন – পিআইডি

শান্তিতে বসবাস করতে পারে সেজন্য হজযাত্রীদের দোয়া করার আহ্বান জানান।

সরকারি চাকরিজীবীদের জনকল্যাণে নিবেদিত হওয়ার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে জুলাই ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উদ্‌যাপন ও জনপ্রশাসন পদক ২০১৭' প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী রুটিন ওয়ার্ক নয়, উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে সরকারি চাকরিজীবীদের জনকল্যাণে নিবেদিত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সরকারি চাকরি যে কতটা রুটিন চাকরি, আসলাম, বেতন নিলাম, চলে গেলাম সেটা নয়, নিজের ভেতরে উদ্ভাবনী শক্তি কী আছে সেটাও কাজে লাগাতে হবে। নিজেই নিজেকে আবিষ্কার করতে হবে। খুলনার জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে সেখানকার সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং পুলিশ প্রশাসনের একদিনের বেতন দিয়ে একটি ফান্ড তৈরি করা হয় ভিক্ষুকমুক্ত করার জন্য। এই ভিক্ষুকের হিসাব নিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করা হয়। এ বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর খুবই ভালো লেগেছে। তিনি সিদ্ধান্ত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে জুলাই ২০১৭ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় পর্যায়ে 'জনপ্রশাসন পদক ২০১৭' প্রদান করেন – পিআইডি

নিয়েছেন, যারাই এ ধরনের ফান্ড তৈরি করবেন সেখানেই তিনি প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে কিছু অনুদান দেবেন। যাতে করে তারা এই কর্মসূচি সফলভাবে করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'সমস্ত কর্মচারীকে আমি অনুরোধ করি যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন। যাদের অর্থে আজকে আমরা চলছি তাদের যেন কষ্ট না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। যারা অন্যায় করবে তাদের কঠোর হস্তে দমন করুন। কিন্তু সাবধান, একটা নিরপরাধ লোকের ওপর যেন অত্যাচার না হয়। অর্থাৎ যে মানুষগুলোর অর্থ দিয়েই সবকিছু চলছে তাদের কল্যাণ করে যেতে হবে'। তাঁর প্রতিটি কথাই দেশের কল্যাণের জন্য একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী সরকারি চাকরিজীবীদের কল্যাণে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত ও দলগত ২টি ক্যাটাগরিতে ১৪ জনকে পদক দেওয়া হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী ইসমত আরা সাদেক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোজাম্মেল হক খানও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

অনলাইন গণমাধ্যমকে সুরক্ষা দেবে সরকার

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৬ই জুলাই সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ অনলাইন মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (বিওএমএ)-এর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময়কালে বলেন, সরকার অনলাইন গণমাধ্যমকে সুরক্ষা দেবে।

তিনি বলেন, দেশের অনলাইন গণমাধ্যমগুলো অবাধ তথ্যপ্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং সরকার অনলাইন সংবাদ পোর্টালগুলোকে সুরক্ষা দেবে। সদ্য প্রণীত নীতিমালা এক্ষেত্রে দিক নির্দেশনার কাজ করবে।

গণমাধ্যমের পবিত্রতা রক্ষার ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে মন্ত্রী বলেন, অনলাইন সংবাদ পোর্টালগুলোকে যেমন গণমাধ্যমের পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে, তেমনি সাংবাদিকতার নামে মিথ্যাচার, চরিত্র হনন, গুজব ও উস্কানি ছড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে।

দূরে নয়, কাছে থাকুন, উন্নয়নে অংশীদার হোন

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৫ই জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর হোটেলে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের প্রতি আহ্বান, আপনারা দূরে নয়, কাছে আসুন, কাছে থাকুন, উন্নয়নে অংশীদার হোন।

মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার সরকার ১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তি ও ১৯৯৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের সকল নৃগোষ্ঠীকে উন্নয়নের ধারায় নিয়ে এসেছে। এই যুগান্তকারী পদক্ষেপের ফলে সকলের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, তা পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে হবে।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর সঙ্গে ১৬ই জুলাই ২০১৭ তাঁর মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষে বাংলাদেশ অনলাইন মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন –পিআইডি

সামাজিক দায়বদ্ধতা রক্ষায় বেসরকারি টিভি'র উদ্যোগ প্রশংসনীয়

মন্ত্রী ১৮ই জুলাই রাজধানীর এক হোটেলে ইউনিসেফ বাংলাদেশ-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সারা বর্ডাস এডি (Sara Bordas Eddy) -এর সভাপতিত্বে ইউনিসেফের সাথে পাঁচটি বেসরকারি টেলিভিশনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলো ব্যবসার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা রক্ষা, বিশেষ করে শিশু কল্যাণে এগিয়ে আসছে, এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও আশাব্যঞ্জক।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

১লা জুলাই : সৌরভে-গৌরবে প্রতিষ্ঠার ৯৬ বছর পার করল প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ক্যাম্পাস জুড়ে নানা আয়োজনে উৎসবমুখর পরিবেশে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়।

সচিব সভায় প্রধানমন্ত্রী

২রা জুলাই : সচিবালয়ে সচিব সভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলতি অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়নে সচিবদের আরো আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানান।

বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করে 'বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস'।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিসিএসসি অনুমোদন

৩রা জুলাই : সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেশের প্রথম বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি (বিসিএসসি) লিমিটেড' গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এছাড়া শাস্তির বিধান রেখে 'বীজ আইন ২০১৭'-এর খসড়া মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন পায়।

পিজিআর-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী

৫ই জুলাই : ঢাকা সেনানিবাসে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট (পিজিআর)-এর সদর দপ্তরে বাহিনীর ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা দায়িত্ব ও রাষ্ট্রাচার অনুষ্ঠানে আপনাদের ভূমিকা আজ সর্বজনস্বীকৃত ও প্রশংসিত। রোদ-বৃষ্টি-ঝড়-তুফান–সবকিছু উপেক্ষা করেও আপনারা দায়িত্ব পালনে অটল থাকেন। এই একনিষ্ঠ কর্তব্য পালন আমাকে মুগ্ধ করে, গর্বিত করে।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

১০ই জুলাই : সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের দোসরদের গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের আলোকচিত্র নিয়ে ৭১টি স্মারক ডাকটিকেট সংবলিত উদ্‌বোধনী খাম অবমুক্ত করেন। এছাড়া বৈঠকে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে কূটনৈতিক ও দাপ্তরিক পাসপোর্টধারীদের ভিসা ছাড়া ভ্রমণের অনুমতি সংক্রান্ত চুক্তির খসড়া অনুমোদন দেয়।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'পরিবার পরিকল্পনা, জনগণের ক্ষমতায়ন, জাতির উন্নয়ন'।

স্কাউটস-এর কাউন্সিলে রাষ্ট্রপতি

১৩ই জুলাই : ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জাতীয় কাউন্সিলের ৪৬তম বার্ষিক (ত্রৈবার্ষিক) সাধারণ সভায় চিফ স্কাউট রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম থেকে তরুণ সমাজকে দূরে রাখতে এবং তাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা-সিরিসেনার দ্বিপক্ষীয় বৈঠক

১৪ই জুলাই : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চামেলী হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মৈত্রিপালা সিরিসেনার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে একটি চুক্তি ও ১৩টি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই জুলাই ২০১৭ তাঁর কার্যালয়ে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মৈত্রিপালা সিরিসেনাকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানান–পিআইডি

এসএসএফ-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী

১৫ই জুলাই : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে এসএসএফ-এর ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত দরবারে প্রধান অতিথির ভাষণে নিরাপত্তা দিতে গিয়ে তাকে যেন জনবিচ্ছিন্ন করা না হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকার জন্য স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ

১৯শে জুলাই : প্রতি বছরের মতো এবারো সারাদেশে উদ্‌যাপিত হয় 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৭'। এ বছর মৎস্য সপ্তাহের প্রতিপাদ্য ছিল 'মাছ চাষে গড়ব দেশ, বদলে দেব বাংলাদেশ'।

শিল্পকলা পদক প্রদানকালে রাষ্ট্রপতি

২০শে জুলাই : শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে 'শিল্পকলা পদক–২০১৬' বিতরণ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) যুগে আকাশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুলাই ২০১৭ তাঁর কার্যালয়ে জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৭-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন –পিআইডি

সংস্কৃতি এখন বাস্তবতা। কিন্তু জনগণ ও সংস্কৃতিকর্মীদের ভালো জিনিস গ্রহণ এবং যা মন্দ ও দেশের জন্য ক্ষতিকর তা বর্জন করতে হবে।

এইচএসসি'র ফল প্রকাশ

২৩শে জুলাই : চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। গড়ে পাসের হার ৬৮.৯১%।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান

২৪শে জুলাই : বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৫' তুলে দেন পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে।

জেলা প্রশাসক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

২৫শে জুলাই : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে ৩ দিনব্যাপী জেলা প্রশাসক সম্মেলন-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারদের তৃণমূল পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করাসহ মোট ২৩টি নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে জেলা প্রশাসকদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী মানুষের জীনযাত্রার মান বদলে দেওয়ার লক্ষ্যে আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দেন। **প্রতিবেদন : আখতার শাহীমা হক**

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

জমি অধিগ্রহণে তিনগুণ ক্ষতিপূরণ

গত বছর মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পাওয়া আইনের খসড়াটি 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন ২০১৭' নামে সংসদে বিল আকারে উত্থাপন করা হয়েছে। এ আইনের আওতায় সরকার অনিবার্য প্রয়োজনে কোনো জমি অধিগ্রহণ করলে ঐ এলাকার জমির ১২ মাসের গড় মূল্যের সঙ্গে অতিরিক্ত ২০০ ভাগ ক্ষতিপূরণ পাবেন জমির মালিক। আর জমি অধিগ্রহণ করে কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হলে ক্ষতিপূরণের অর্থ হবে আরো বেশি–জমির গড় মূল্যের অতিরিক্ত ৩০০ ভাগ। অর্থাৎ সরকার নিজের প্রয়োজনে ১০০ টাকা মূল্যের জমি অধিগ্রহণ করলে জমির মালিক ৩০০ টাকা (তিন গুণ), বেসরকারি প্রয়োজনে অধিগ্রহণ করলে ৪০০ টাকা (চার গুণ) পাবে। আগে ক্ষতিপূরণের হার ছিল মাত্র দেড়গুণ। এ আইনে আরো বলা হয়েছে সরকার কোনো জমি ও স্থাপনা অধিগ্রহণ বা হুকুম দখল করলে অন্য কোনো আইনে মামলা করা যাবে না। কোনো আদালত সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আদেশ বা নিষেধাজ্ঞাও জারি করতে পারবে না। আর অধিগ্রহণ হবে এমন জমির ওপর বাড়তি অর্থ আয়ের জন্য ঘরবাড়ি বা অবকাঠামো নির্মাণ করা হলে তা নিজ খরচে অপসারণ করবে ভূমির মালিক।

আকাশসীমা লঙ্ঘনে কারাদণ্ড

বেসরকারি বিমান চলাচলের সুরক্ষা, নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রণ ও সংশ্লিষ্ট বিধানগুলো যুগোপযোগী করতে জাতীয় সংসদে 'বেসামরিক বিমান চলাচল বিল-২০১৭' পাস করা হয়েছে। এই বিলে অবৈধভাবে বাংলাদেশের আকাশসীমায় অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৭ বছর ও সর্বনিম্ন ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ন্যূনতম ২ কোটি টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া নীতিমালা না মেনে বিমান চলাচলে কমপক্ষে ৫ বছর কারাদণ্ড ও ১ কোটি টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

নির্মাণ কাজ শুরুর আগে পরিবেশ ছাড়পত্র বাধ্যতামূলক

পরিবেশ ছাড়পত্র ব্যতীত বড়ো বড়ো উন্নয়ন প্রকল্প ও শিল্পকারখানায় নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারবে না সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রকল্পের কাজ শুরুর আগে অবশ্যই পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র নিতে হবে। 'পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৭'-এর খসড়ায় এ বিধান যুক্ত করা হচ্ছে। এ বিধিমালা চূড়ান্ত হলে পরিবেশ দূষণ অনেকাংশেই কমে আসবে। **প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ**

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতিসংঘে এসডিজি প্রতিবেদন উপস্থাপন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনায় জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামে (এইচএলপিএফ) বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

'পরিবর্তিত বিশ্বে দারিদ্র্য নির্মূল ও উন্নয়নে অগ্রগতি' প্রতিপাদ্য নিয়ে শুরু হওয়া ৮ দিনব্যাপী ফোরামের অংশ হিসেবে ১৭ই জুলাই থেকে তিনদিনের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে এ প্রতিবেদন উপস্থাপন

করা হয়। বৈঠকে ৪৪টি দেশ এসডিজি বাস্তবায়নে অগ্রগতি বিষয়ে তাদের জাতীয় প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের নেতৃত্বে ২২ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল বৈঠকে যোগ দেন। অন্যতম প্যানেল আলোচক হিসেবে পরিকল্পনা মন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

তিনি মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনায় এসডিজি'র বিভিন্ন অভীষ্টের মধ্যে দারিদ্র্য নির্মূল, ক্ষুধা, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, লিঙ্গ সমতা, শিল্প উদ্ভাবন ও অবকাঠামো, জলজ জীবন এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব–এই সাতটি অভীষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অর্জন তুলে ধরেন।

উপস্থাপনায় এসডিজি বাস্তবায়নকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা হিসেবে জানিয়ে এর বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার গৃহীত বিভিন্ন কৌশল তুলে ধরা হয়। এরমধ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজিকে সন্নিবেশিত করা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে এসডিজিকে অন্তর্ভুক্ত করা, এসডিজি ট্র্যাকার সৃষ্টি, আন্তঃমন্ত্রণালয় এসডিজি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি গঠন, মন্ত্রণালয়ের ম্যাপিং এবং ডেটাগ্যাপ এনালাইসিসের মতো বিভিন্ন বিষয় বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশের উন্নয়নের পরিমাপক হিসেবে বিভিন্ন আর্থসামাজিক প্রবৃদ্ধির তথ্য প্রদর্শন করা হয়।

এতে দেখানো হয়, বাংলাদেশে উচ্চ ও নিম্ন দারিদ্র্য রেখা যথাক্রমে ২৪.০৩ ও ১২.০৯ শতাংশে নেমে এসেছে, যা ১৯৯১ সালে ছিল যথাক্রমে ৫৬.০৭ এবং ৪১.০১ শতাংশ।

প্রধানমন্ত্রীর প্রাধিকার প্রকল্প 'একটি বাড়ি একটি খামার'-এর পাশাপাশি উঠে আসে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার রক্ষা ও কল্যাণ, ডিজিটাল, ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং জনগণের দোরগোড়ায় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি। পদ্মা সেতুসহ মেগা অবকাঠামো প্রকল্পসমূহও এ প্রতিবেদনে স্থান পায়।

প্রতিবেদন : সাবিনা ইয়াসমিন

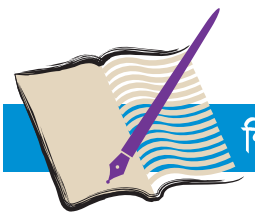

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ২৩শে জুলাই গণভবনে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল হস্তান্তর করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। পরীক্ষার ফলাফলে প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি যারা কৃতকার্য হয়েছে তাদের অভিনন্দন এবং যারা অকৃতকার্য হয়েছে তাদের মন দিয়ে পড়াশোনা করে আগামীর জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পায় সেজন্য তাঁর সরকার শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী হতে এবং তারা যেন মাদকাসক্তি ও জঙ্গিবাদে জড়িয়ে না পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান।

এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাসের হার ৬৮.৯১ %। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৭ হাজার ৭২৬ জন। গতবারের তুলনায় এবার পাসের হার এবং জিপিএ-৫ দুটোই কমেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু সব সময় শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করে দিয়েছিলেন। মেয়েদের শিক্ষা মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনামূলে করে দিয়েছিলেন। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির করে দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এদেশের ক্ষুধার্ত-দরিদ্র মানুষের মুক্তি, অধিকার আদায়ের জন্যই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন।

২৩শে জুলাই ২০১৭ গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ২০১৭ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল হস্তান্তর করা হয় –পিআইডি

কারিগরি শিক্ষাই হবে দেশের মূল শক্তি

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২৮ শে জুন ঢাকায় পরিবহণ পুল ভবনে কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সম্মেলন কক্ষে বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় মন্ত্রী বলেন, কারিগারি শিক্ষাই হবে দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণের মূল শক্তি। তিনি কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়াতে এবং এর মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির আহ্বান জানান। মন্ত্রী বলেন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। এলক্ষ্যে তিনি সবাইকে আরো উৎসাহী ও আগ্রহী করে তুলতে কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব অনেক বলে উল্লেখ করেন।

ধর্মীয় জ্ঞান চর্চায় আধুনিকায়নের ওপর গুরুত্বারোপ

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১২ই জুলাই ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে 'আরবি ভাষা ও ইসলামি জ্ঞান জাতীয় প্রতিযোগিতা'র উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে মন্ত্রী ধর্মীয় জ্ঞান চর্চা, আরবি ভাষার সমৃদ্ধ ব্যবহার এবং পবিত্র কোরান ও হাদিস শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরনের আয়োজন মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নকে আরো

বেগবান করবে বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া ধর্মীয় জ্ঞান চর্চায় আধুনিকায়নের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন মন্ত্রী।

মাউশি'র কর্মকাণ্ড আরো গতিশীল করার নির্দেশ

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৬ই জুলাই শিক্ষা ভবনের সভাকক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে মন্ত্রী মাউশি'র কর্মকাণ্ড কারো গতিশীল করার নির্দেশ দেন। মন্ত্রী বলেন, মাউশি'র কর্মকাণ্ডে অনেক সাফল্য এসেছে এবং এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা কোথাও দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হলে তা মাউশি'র মহাপরিচালক বা মন্ত্রীকে সরাসরি জানানোর জন্য তিনি ভুক্তভোগীদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া মাউশি'র কাজের মান আরো উন্নত করার জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা দেন মন্ত্রী।

উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

উচ্চশিক্ষায় সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। ১৪ই জুলাই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মৈত্রীপালা সিরিসেনার উপস্থিতিতে ইউজিসি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুল মান্নান ও শ্রীলঙ্কার স্টেট মিনিস্টার অব হায়ার এডুকেশন মোহন লাল গ্রেরো দুটি দেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী দুটি দেশ তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্র্যাজুয়েশন, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন এবং পিএইচডি পর্যায়ে যৌথ ডিগ্রি প্রোগ্রামের প্রতিষ্ঠা, বাস্তবায়ন এবং উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করবে।

শিক্ষার মান বাড়াতে গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১২ই জুলাই নায়েম কনফারেন্স হলে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) পরিচালিত 'গবেষণা কর্মের চেক হস্তান্তর' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গুণগত মান বৃদ্ধি একটি চ্যালেঞ্জ। সারা পৃথিবীর সামনেই এটা চ্যালেঞ্জ। তিনি শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষা খাতে বিভিন্ন সমস্যা ও তা উত্তরণের উপায় নিয়ে গবেষণা আরো বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পরে তিনি ১২টি গবেষণা দলের হাতে ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা করে মোট ১৭ লাখ ৪০ হাজার টাকার চেক হস্তান্তর করেন।

নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৩ই জুলাই সেগুনবাগিচায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উদ্যোগে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'উন্নত শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি আমরা ভালো মানুষ তৈরি করতে চাই।' দক্ষ ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সৎ ও আদর্শ মানুষ গড়ে তুলতে শিক্ষক হলেন মূল শক্তি। তিনি নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং বলেন, উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষকদের দেশপ্রেমে উজ্জীবিত উন্নত মানসিকতা ধারণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, আধুনিক যুগে মানুষের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার হচ্ছে জ্ঞান-প্রযুক্তি-দক্ষতা। ভবিষ্যতের দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে নতুন প্রজন্মকে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্য পূরণ করতে তাদেরকে বিশ্বমানের জ্ঞান-প্রযুক্তি-দক্ষতা আয়ত্ব করতে হবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি অনলাইনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের এ বছরের উপবৃত্তির ১৩৮ কোটি ৩৫ হাজার ৮৬০ টাকা বিতরণ করেন এবং রংপুরের বেগম রোকেয়া কলেজের শিক্ষার্থীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কথা বলেন। **প্রতিবেদন : মো. সেলিম**

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

মানবদেহে অঙ্গ সংযোজন আইনের খসড়া অনুমোদন

'মানবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) আইন ২০১৭'-এর চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। ১৭ই জুলাই সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে আইনটির খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।

প্রস্তাবিত আইনে মানবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে আত্মীয়ের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। বিদ্যমান আইনের ১২ জন ছাড়াও আপন নানা-নানি, দাদা-দাদি, নাতি-নাতনি, চাচাতো-মামাতো-ফুপাতো-খালাতো ভাইবোনেরাও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান ও গ্রহণ করতে পারবেন। মৃত ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গও অন্যের শরীরে সংযোজন করা যাবে।

সংশোধিত আইন অনুযায়ী, সরকারি হাসপাতালের বিশেষায়িত ইউনিট ছাড়া কোনো হাসপাতাল সরকারের অনুমতি ছাড়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন করতে পারবে না। কোনো ব্যক্তি নিকটাত্মীয় সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেওয়াসহ আইন ভঙ্গের অপরাধে সাজার মেয়াদ কমলেও বাড়ানো হয়েছে জরিমানার পরিমাণ।

উল্লেখ্য, বিদ্যমান আইনে শুধু পুত্র-কন্যা, পিতামাতা, ভাইবোন, স্বামী-স্ত্রী এবং রক্ত সম্পর্কিত আপন চাচা, ফুফু, মামা, খালা– এই ১২ জন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান ও গ্রহণ করতে পারেন।

এক বছরে ওষুধ রপ্তানি বেড়েছে দ্বিগুণ

এক বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ থেকে ওষুধ রপ্তানি বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। বাংলাদেশের ওষুধের উন্নত মানের বিপরীতে দাম তুলনামূলক কম হওয়ায় প্রতিবছরই বাড়ছে রপ্তানির পরিমাণ ও দেশের সংখ্যা। সম্প্রতি ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য মতে, ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২৭টি দেশে ওষুধ, কাঁচামাল ও মেডিক্যাল ডিভাইস রপ্তানি করা হয়েছে ২ হাজার ২৪৭ কোটি ৫ লক্ষ টাকার। যেখানে ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২০টি দেশে মোট ৮১২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকার ওষুধ রপ্তানি হয়েছিল। দেশের ওষুধ রপ্তানিকারক কোম্পানিগুলোর মধ্যে সবার শীর্ষে রয়েছে বেক্সিমকো ফার্মা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ইনসেপ্টা ও স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড।

ঢাকা মেডিক্যালে দর্শনার্থী পাস বাধ্যতামূলক

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রোগীর সঙ্গে থাকতে দর্শনার্থী পাস নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১০ই জুলাই বিকেল থেকে এই নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে। দর্শনার্থী প্রতি ফেরতযোগ্য ২০০ টাকার বিনিময়ে এক বা একাধিক পাস সংগ্রহ করা যাবে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, সংক্রমণ হ্রাস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, নিরাপত্তা ও রোগীর চিকিৎসার স্বার্থে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাস ছাড়া কোনোভাবেই রোগীর সঙ্গে কেউ হাসপাতালে অবস্থান করতে পারবেন না। তবে পাস ছাড়া বিকেল ৪টা থেকে ৬টার মধ্যে রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যাবে।

চিকনগুনিয়া প্রতিরোধে নিয়ন্ত্রণ কক্ষসহ সরকারের নানা পদক্ষেপ

ঢাকায় চিকনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার চিকনগুনিয়া নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) এই নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে

সারাদেশে চিকনগুনিয়া পরিস্থিতির ওপর নজর রাখার পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির কাজও করা হচ্ছে। ৩রা জুলাই থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয়।

ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় মশা নিধন ও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা অভিযানসহ জনগণকে সচেতন করতে মসজিদে খুতবার আগে চিকনগুনিয়া নিয়ে বয়ানের ব্যবস্থা এবং ব্যাপক হারে প্রচারপত্র বিলি করছে সরকার।

ঢাকায় কত মানুষ চিকনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে এর একটি অনুমিত সংখ্যা বের করতে চেষ্টা করছে আইইডিসিআর। মুঠোফোনে জরিপ করছে প্রতিষ্ঠানটি।

সীতাকুণ্ড উপজেলার ত্রিপুরাপাড়ায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশ

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার ত্রিপুরাপাড়া এলাকায় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আগে সেখানে দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি অস্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করার নির্দেশ দেন তিনি। ত্রিপুরাপাড়ায় অজ্ঞাত রোগে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় ১৮ই জুলাই এ নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

১৯শে জুলাই থেকে ত্রিপুরাপাড়া ও সন্নিহিত আক্রান্ত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত একটি করে দুটি অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র, একটি স্যাটেলাইট স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু-কিশোরদের হাম রোগের প্রতিরোধে বিশেষ টিকাদান কার্যক্রম শুরু হয়। **প্রতিবেদন : মো. আশরাফ উদ্দিন**

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও সুকান্তকে স্মরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্য–এই তিন কবির জয়ন্তী উপলক্ষে দেশের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন উদীচী ১৪ই জুলাই এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিগত কয়েক বছর ধরেই উদীচী রবীন্দ্র, নজরুল, সুকান্ত জয়ন্তী সন্ধ্যার আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে ছিল ৩ সূর্যসন্তানকে নিয়ে আলোচনা ও তাঁদের সৃষ্ট গান, কবিতা ও গানের সাথে ছিল নৃত্য।

শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে একক গিটার বাজিয়ে শোনান উদীচী পরিচালিত শিল্পকলা বিদ্যালয়ের শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান।

হায়াৎ মামুদের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

জাতীয় জাদুঘরে কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ১২ই জুলাই অধ্যাপক হায়াৎ মামুদের ৭৮তম জন্মবার্ষিকীর আয়োজন করে সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন 'রঙ্গে ভরা বঙ্গ'। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করেন হায়াৎ মামুদের রাশিয়ার বন্ধু এলিনা ভাস ও নিজাম উদ্দীন।

শিল্পকলা পদক পেলেন সাত গুণিজন

শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী মিতা হক, চিত্রশিল্পী কালিদাস কর্মকারসহ সাত গুণিজনকে এবার শিল্পকলা পদক দেওয়া হয়। শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী ১৮ই জুলাই এক সংবাদ সম্মেলনে ২০১৬ সালের পুরস্কারের জন্য মনোনীত ৭ জনের নাম ঘোষণা করেন। মিতা হক কণ্ঠ সংগীতে ও কালিদাস কর্মকার পাচ্ছেন চারুকলায়। এছাড়া যন্ত্র সংগীতে পণ্ডিত পবিত্র মোহন দে, নৃত্যকলায় মো. গোলাম মোস্তফা খান, আলোকচিত্রে গোলাম মুস্তফা, লোকসংস্কৃতিতে সিরাজ উদ্দিন পাঠান এবং নাট্যকলায় সৈয়দ জামিল আহমেদ এবার শিল্পকলা পদক পান।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ডিজিটাল বাংলাদেশ

বিশ্বে আউটসোর্সিংয়ে বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও পাঠদান বিভাগ জানিয়েছে, বিশ্বে অনলাইনে শ্রমদাতা (আউটসোর্সিং) দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ভারত আউটসোর্সিংয়ে প্রথম স্থানে রয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ ও তৃতীয় অবস্থানে যুক্তরাষ্ট্র। অনলাইনে শ্রমদান বা অনলাইনে কাজের ক্ষেত্রে ভারত অধিকার করেছে ২৪ শতাংশ, বাংলাদেশ ১৬ শতাংশ ও যুক্তরাষ্ট্র ১২ শতাংশ।

প্রতিবেদনে জানা যায়, ইন্টারনেটে ফ্রিল্যান্স কাজ করা এবং ডিজিটালি তা ছাড় করানোর জন্য বৈশ্বিক বাজার সৃষ্টি করেছে এবং এই বাজার দ্রুত বাড়ছে। শীর্ষ পেশাদারিত্বের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লিখন ও অনুবাদ গুরুত্ব পাচ্ছে। অনলাইনে ফ্রিল্যান্স কাজের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের চারটি বৃহত্তম প্লাটফরম থেকে প্রাপ্ত তথ্য–উপাত্তের উপর ভিত্তি করে এই তথ্য চিত্র তৈরি করা হয়েছে।

আইসিটি সেক্টরে ১০ লাখ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হবে

বাংলাদেশ ২০২১ সাল নাগাদ কয়েক বিলিয়ন ডলার আইটি খাত থেকে রপ্তানি করবে এবং ১০ লাখ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান আইসিটি সেক্টরে করা হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তিতে পারদর্শী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে মাল্টিমিডিয়া ও ডিজিটাল ক্লাসরুম এবং কম্পিউটার ল্যাব বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৪ই জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে খুদে কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের 'জাতীয় হাই স্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা -২০১৬'র আসরের ঢাকা মহানগর আঞ্চলিক পর্বের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক একথা বলেন।

তিনি জানান, দেশের ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্পেশালাইজড ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সারা বাংলাদেশে ২০০০ হাইস্কুল ও কলেজে শেখ রাসেল কম্পিউটার-কাম ল্যাংগুয়েজ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশে ১ লাখ ৭০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, প্রত্যেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ডিজিটাল ক্লাসরুম এবং কম্পিউটার ল্যাব যত দ্রুত সম্ভব স্থাপন করা হবে।

এসব কার্যকমের একটাই লক্ষ্য– বাংলাদেশকে শ্রমনির্ভর অর্থনৈতিক দেশ থেকে ডিজিটাল অর্থনৈতিক দেশে রূপান্তর করা।

ডিজিটাল বাংলাদেশের ছায়াতলে নারী

নারীদের ডিজিটাল বাংলাদেশের ছায়াতলে আনতে সরকার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে। এটি ডিজিটাল বাংলাদেশের আশাপ্রদ বৈশিষ্ট্য এবং অনুষঙ্গ। তাই বাংলাদেশে ওয়াইফাই এর মতো

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ৫ই জুলাই ২০১৭ সোনারগাঁও হোটেলে 'উইমেন অ্যান্ড আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিশিয়েটিভ (ওয়াইফাই) বাংলাদেশ'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

উদ্যোগের প্রবর্তন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী। ৫ই জুলাই সোনারগাঁও হোটেলে উইমেন অ্যান্ড আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিশিয়েটিভ (ওয়াইফাই) এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এ মন্তব্য করেন। তিনি জানান, প্রযুক্তিনির্ভর লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে সমাজের অর্ধেক জনশক্তি তথা নারীর সম্পৃক্ততা জরুরি। ই-কর্মাস ও অনলাইন মার্কেটিং-এ আজ নারীদের দৃশ্যমান অংশগ্রহণ রয়েছে। ফলে ওয়াইফাই-এর মতো উদ্যোগ নারীদের ই-কমার্স ও অনলাইন মার্কেটিং-এ আরো বেশি পরিমাণ অংশগ্রহণ বাড়াতে ও আগ্রহী করতে ভূমিকা রাখবে। আর এভাবেই টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে সাহায্য করবে আইসিটি।

সামাজিক যোগাযোগের অ্যাপ 'টেলভো'র যাত্রা শুরু

১৩ই জুলাই 'টেলভোতে বলব'-এই স্লোগানে চালু হয়েছে সামাজিক যোগাযোগের দেশীয় অ্যাপ টেলভো। মাইক্রোট্রেডের সহ-প্রতিষ্ঠান ইনভেরিয়েন্ট টেলিকম বাংলাদেশ এই অ্যাপ বানিয়েছে।

ইনভেরিয়েন্ট টেলিকমের অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বিশ্বে প্রচলিত অ্যাপগুলোর সকল সীমাবদ্ধতা সমাধানের জন্য টেলভো অ্যাপ আনা হয়েছে। এই অ্যাপের উল্লেখযোগ্য সুবিধার মধ্যে আছে, ডায়াল প্যাড কলিং, গ্রুপ ভিডিও কল, কল ওয়েটিং সার্ভিস, একাধিক নাম্বার নিবন্ধন ইত্যাদি।

শুরু হলো টেকনো স্মার্টফোনের যাত্রা

হংকংভিত্তিক মোবাইল ফোন নির্মাতা টেকনো মোবাইল পাঁচটি স্মার্টফোন নিয়ে দেশের বাজারে যাত্রা শুরু করছে। স্মাটফোনগুলো বাজারজাত করছে ট্রানশান হোল্ডিং বাংলাদেশ। ১৭ই জুলাই রাজধানীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ব্র্যান্ডটির স্মার্টফোন দেশের বাজারে বিক্রির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন ট্রানশান হোল্ডিং বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ প্রেসিডেন্ট আরিফ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, দেশের বাজারে এখন থেকে টেকনো মোবাইলের পাঁচটি ফোন পাওয়া যাবে। এগুলো হলো ক্যামন সি এক্স এয়ার, আই সেভেন, আই থ্রি, ডব্লিউ এক্স থ্রি এবং ডব্লিউ এক্স ফোর।

এরমধ্যে আই সেভেন ফ্ল্যাগশিপ ফোনে আছে ৫.৫ ইঞ্চির ফুল এইচডি পর্দা। ফোনটিতে ১.৫ গিগাহার্টজের অক্টোকোর প্রসেসর রয়েছে। এতে আছে ৪ জিবি র‍্যাম, ৩২ জিবি রম এবং ৪০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি। এর সামনে ও পিছনের ক্যামেরা ১৩ ও ১৬ মেগাপিক্সেল অ্যান্ড্রয়েড ৭.০ অপারেটিং সিস্টেমে চালিত এই ফোন।

প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার বিতরণ

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের জনগণকে কৃষি উৎপাদনে সম্পৃক্ত ও উৎসাহিত করার মাধ্যমে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে 'জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার এটির নাম পরিবর্তন করা হয়। সর্বশেষ 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন ২০১৬' প্রণীত হয়। নতুন প্রণীত আইনের আওতায় এ বছর সর্বপ্রথম ১৪২১ এবং ১৪২২ বঙ্গাব্দের জন্য 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে। কৃষি উন্নয়নের ১০টি ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৬ই জুলাই ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে ১০টি শ্রেণিতে ৫টি স্বর্ণ, ৯টি রৌপ্য, ১৮টি ব্রোঞ্জপদক, নগদ অর্থের চেক এবং সনদপত্র গ্রহণ করেন বিজয়ীরা। পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে– ১. কৃষি গবেষণায় অবদান ২. কৃষি সম্প্রসারণে অবদান ৩. প্রাতিষ্ঠানিক/সমবায়/কৃষক পর্যায়ে উচ্চ মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ ও নার্সারি স্থাপন ৪. কৃষি উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ উদ্বুদ্ধকরণ প্রকাশনা ও প্রচারণামূলক কাজ ৫. পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন/ব্যবহার ৬. কৃষিতে নারীদের অবদান ৭. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খামার স্থাপন ৮. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বনায়ন ৯. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি চাষ এবং ১০. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছ চাষ।

১৬ই জুলাই ২০১৭ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২১ ও ১৪২২'-এর পদকপ্রাপ্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –পিআইডি

মসলা চাষে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ

মসলা চাষ ও গবেষণায় ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। দেশের একমাত্র বগুড়া মসলা গবেষণা কেন্দ্র গত ২১ বছরে উচ্চ ফলনশীল (উফশি) নানা জাতের মসলা উদ্ভাবন করেছে। ইতোমধ্যে ১৩টি মসলার উফশি ২৮টি জাত উদ্ভাবিত এবং মাঠ পর্যায়ে অবমুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে সকল মৌসুমে পেঁয়াজ আবাদের জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। উফশি জাতের মধ্যে আরো আছে পেঁয়াজের ৫টি, হলুদের ৫টি, রসুনের ২টি, মরিচের ৩টি, আদার ২টি, মেথির ২টি, কালিজিরা, গোলমরিচ, ধনিয়া, বিলাতি ধনিয়া, পাতা পেঁয়াজ, আলু বোখারা ও গোল মরিচের ১টি করে জাত।

এ কেন্দ্রের বড়ো সাফল্য আদা উৎপাদনে। আদা চাষে মাটি না হলেও চলবে। দেশের কোন্ এলাকায় কোন্ ধরনের মসলা উৎপাদন করা যায় তা নিরূপণে বগুড়া মসলা গবেষণা কেন্দ্রের অধীনে ৩টি আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র ও ৪টি উপ-আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। আঞ্চলিক মসলা কেন্দ্র রয়েছে মাগুরা, কুমিল্লা ও গাজীপুরে। উপ-আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র লালমনিরহাট, ফরিদপুর, সিলেট ও খাগড়াছড়িতে অবস্থিত।

দেশে মসলার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। প্রতিবছর আমদানি করতে হয় নানা ধরনের ১৪ লাখ মেট্রিক টন মসলা। উদ্ভাবিত ১৩ মসলার উফশি ২৮ জাত এই আমদানি নির্ভরতা কমাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

কৃষিপণ্য রপ্তানিতে আয় ৪,৪৭৭ কোটি টাকা

২০১৬–১৭ অর্থবছরে কৃষিপণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছে ৫৫ কোটি ৩১ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার বা প্রায় ৪ হাজার ৪৭৭ কোটি টাকা। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) জুলাই মাসে প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। গত ২০১৬–১৭ অর্থবছরে চা রপ্তানিতে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৫ লাখ মার্কিন ডলার। এর বিপরীতে আয় হয়েছে ৪৪ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৯৮ শতাংশ বেশি। আলোচ্য সময়ে মসলা জাতীয় পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩ কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার। এর বিপরীতে আয় হয়েছে ৩ কোটি ৪৯ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৭

মাছে-ভাতে বাঙালি– চিরচেনা এই প্রবাদটি কালের গহ্বরে ক্রমেই যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও জনসংখ্যার চাহিদায় তা অপ্রতুল। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগণের মধ্যে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এবারো উদ্‌যাপন করা হয়েছে 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৭'। অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৮–২৪শে জুলাই 'মাছ চাষে গড়ব দেশ, বদলে দেব বাংলাদেশ' –এই প্রতিপাদ্য নিয়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে মৎস্য অধিদপ্তর।

রূপকল্প–২০২১ অনুযায়ী, মাছের উৎপাদন ৪২ লাখ টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং মৎস্য অধিদপ্তর যৌথভাবে কাজ করে চলেছে। এফএও-এর দেওয়া তথ্য মতে, ২০২২ সাল নাগাদ বিশ্বের যে চারটি দেশ মাছ চাষে বিপুল সাফল্য অর্জন করবে, তারমধ্যে প্রথম দেশটি হচ্ছে বাংলাদেশ। এর পরের অবস্থানেই রয়েছে থাইল্যান্ড, ভারত ও চীন। এফএও-এর দেওয়া এই তথ্য নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য আশাব্যঞ্জক ও গৌরবময়।

মাছ চাষে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। একজন মানুষের দৈনন্দিন মাছের চাহিদা ৬০ গ্রাম। সে হিসাবে ৪২ থেকে ৪৩ লাখ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হলেই বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত উন্নত জাতের পাঙাশ, রুই, কাতলা, তেলাপিয়া মাছ চাষ আশির দশকে বেশ জনপ্রিয়তা পায়। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সারাবছরই চাষ হচ্ছে উন্নত জাতের কৈ, শিং, মাগুর, শোল, পুঁটি, সরপুঁটি, বাইন, টাকি, পাবদা, কলি, মলা, গোলসা, টেংরা, ভেদা, বোয়াল, কালি বাউশ মাছ। মৎস্য অধিদপ্তর ৫৪ প্রজাতির মাছকে ঝুঁকিপূর্ণ, ২৮ প্রজাতির মাছ বিপন্ন ও ১২ প্রজাতির মাছকে মহাবিপন্ন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তবে আশার খবর হলো, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ফিরে আসছে শিং, বাটা, সরপুঁটি, ভাঙ্গনা, কালি বাউশ, গনিয়া, মহাশোল, পাবদা, মাগুর, চিতল, ফলিসহ বিলুপ্তপ্রায় অনেক দেশীয় মাছ। দেশি প্রজাতির ছোটো মাছের সংরক্ষণ, প্রজন্ম ও বংশবৃদ্ধির জন্য ৩৮টি জেলার ৭৫টি উপজেলার ১৩৬টি প্রাকৃতিক জলাশয় পুনর্খনন করা হয়েছে। ৫৭টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে দেশি প্রজাতির ছোটো মাছের কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশি প্রজাতির মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ৬ হাজার ৪৬৬ জন চাষিকে। সরকার গৃহীত এসব কার্যক্রম দেশীয় মাছের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিভিন্ন উপাত্ত থেকে জানা যায়, দেশের প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ বা ১১ শতাংশ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য খাতে জীবিকা নির্বাহ করছে। বছরে প্রায় ৬ লাখ নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে এই মৎস্য সেক্টরে। নদনদী, খাল-বিল-পুকুরসহ জলাধারের সংখ্যা হ্রাস পেলেও আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ মৎস্য উৎপাদনে বিস্ময়কর সাফল্য বয়ে নিয়ে আসছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত এক দশকে মাছের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৫৫ শতাংশ। **প্রতিবেদন : শান্তা ইসলাম**

ডলার, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫ দশমিক ৯১ শতাংশ বেশি।

ইপিবি'র প্রতিবেদন থেকে আরো জানা যায়, ২০১৬–১৭ অর্থবছরে জুলাই–মে মেয়াদে কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে ৯০ কোটি ৩৬ লাখ ৯০ হাজার মার্কিন ডলার বা প্রায় ৭ হাজার ২৯৬ কোটি টাকা। এটি ২০১৫–১৬ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসের তুলনায় ৯ দশমিক ৮৪ শতাংশ বেশি।

প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী : বিশেষ প্রতিবেদন

বান্দরবানে ফলদ চারা বিতরণ

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের উদ্যোগে আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় জেলার বিভিন্ন উপজেলার সুফলভোগীদের মাঝে পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, স্প্রে মেশিন ও নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গরু-ছাগল ও জেলার ৭টি উপজেলার ২২১ জন কৃষকের মাঝে ৩৩ হাজার ফলদ চারা বিতরণ করা হয়েছে।

১৪ই জুলাই পার্বত্য জেলা পরিষদ চত্বরে বান্দরবান কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং। এছাড়াও জেলা প্রশাসক দিলীপ কুমার বণিক, পুলিশ সুপার সঞ্জিত কুমার রায়সহ বিভিন্ন সরকারি–বেসরকারি কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনসম্পৃক্ততা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় ও নিরাপদ আবাসস্থল তৈরির জন্য বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই।

আলোকচিত্রে পাহাড়ি জীবনের গল্প

বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির সাথে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জীবনধারায় প্রকৃতির সংযোগ উঠে এসেছে ফ্রেমে ফ্রেমে। প্রতিটি ছবি বলে যায় নিসর্গের সঙ্গে জীবনের বন্ধনের কথা। সেসব ছবি নিয়ে ধানমন্ডির দৃক গ্যালারিতে শুরু হয় ১৬ই জুলাই থেকে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম : মানুষ ও প্রকৃতি' শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিসত্তার জীবনচিত্র উঠে এসেছে এ প্রদর্শনীতে।

ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশ অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ প্রদর্শনীর আয়োজন করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার ১৯ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষে তিন দিনের এ প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রদর্শনী উদ্‌বোধন করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। তিন দিনের এ প্রদর্শনী চলে ১৮ই জুলাই পর্যন্ত। **প্রতিবেদন : মো. মামুন হোসেন**

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

বাঘাবাড়ি-শিলঘাট নৌপথ চালুর উদ্যোগ

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পণ্য পরিবহণের সুবিধার্থে চালু হচ্ছে ভারতের শিলঘাট থেকে সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি নৌরুট। এক সময় এ রুটে অনিয়মিত পণ্য পরিবহণ করা হতো। তবে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর রুটটি আবার সচলের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, ২০০৬-০৭ সালে তেলবাহী নৌযান ভারতের শিলঘাট থেকে বাংলাদেশের বাঘাবাড়ি নদীবন্দরে আসত। সে অনুযায়ী সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি 'পোর্ট অব কল'–এর 'এক্সটেনশন প্লেস' হিসেবে ঘোষিত আছে। ২০০৯ সালে ভারতের শিলঘাটকেও 'পোর্ট অব কল' হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অভ্যন্তরীণ নৌপথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকল (পিআইডব্লিউটি অ্যান্ড টি) বিদ্যমান। স্বাধীনতার পর থেকে এই প্রটোকলটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক ও নবায়নের মাধ্যমে এখনো কার্যকর আছে। পিআইডব্লিউটি অ্যান্ড টি-এর আওতায় আঞ্চলিক বা উপ আঞ্চলিক ক্ষেত্রে প্রটোকল দিন দিন পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, শিলঘাট থেকে জ্বালানি তেল বাঘাবাড়িতে পরিবহণ করা হলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে চট্টগ্রাম–বাঘাবাড়ি রুটের তুলনায় প্রায় ৯০ শতাংশ খরচ সাশ্রয় হবে।

গত বছরের ৬–৭ই ডিসেম্বর পিআইডব্লিউটি অ্যান্ড টি-এর আওতায় ভারতের প্রতিনিধির সমন্বয়ে ১৮তম স্ট্যান্ডিং কমিটি, জয়েন্ট টেকনিক্যাল কমিটি এবং নৌসচিব পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮তম স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় প্রটোকল রুটে পণ্য পরিবহণকারী মেসার্স গাল্ফ ওরিয়েন্ট সি ওয়েজ লিমিটেড নামের প্রতিষ্ঠান চাহিদা দেখায়। এর আলোকে নিয়মিতভাবে পণ্য পরিবহণ কার্যক্রমের জন্য শিলঘাটকে চালুর বিষয়টি এজেন্ডা হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থাপন হলে এতে সম্মতি দেয় ভারতীয় পক্ষ। **প্রতিবেদন : জাহিদ হোসেন নিপু**

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

পরিবেশ রক্ষা ও বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য বজায় রাখতে গাছ লাগান

পরিবেশ রক্ষা ও বাস্তু সংস্থানের ভারসাম্য বজায় রাখতে বর্ষাকালে আরো বেশি সংখ্যক চারাগাছ লাগানোর জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৮ই জুলাই তিনি তাঁর তেজগাঁও কার্যালয় চত্বরে 'আকাশ নিম' এবং 'রুদ্র পলাশ'-এর দুইটি চারা রোপণকালে এ আহ্বান জানান।

একটি মানুষও না খেয়ে থাকবে না

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকার সব সময় প্রস্তুত রয়েছে। যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য মজুত রয়েছে। বন্যা দুর্গত এলাকার কোনো মানুষ না খেয়ে থাকবে না, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও নদী ভাঙনের শিকার প্রত্যেকটি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে। কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার বজরা ইউনিয়নের চাঁদনি বজরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে তিস্তা নদীর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণকালে তিনি একথা বলেন। বানভাসী মানুষের ত্রাণ নিয়ে কোনো অনিয়ম সহ্য করা হবে না বলেও তিনি সকলকে হুঁশিয়ার করেন।

দেশের ৮৭ ভাগ মানুষ নিরাপদ পানি পায়

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ৮৭ ভাগ জনগণ নিরাপদ পানি সুবিধার আওতাভুক্ত। অবশিষ্ট ১৩ ভাগ জনগণ দূরবর্তী অন্যান্য নিরাপদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই জুলাই ২০১৭ তাঁর কার্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেন –পিআইডি

পানির উৎস থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করে থাকে। জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এ তথ্য উপস্থাপন করেন।

ভোলার নদী ভাঙন রোধে স্থায়ী পদক্ষেপ

নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে স্থায়ী ঠিকানা দেওয়া হবে। এখন আর কোনো মানুষকে গৃহহারা হতে হবে না। ভোলা জেলার ভাঙন রোধে স্থায়ীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভাঙন রোধে ভোলায় প্রায় ২ হাজার ২৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সদর উপজেলার ইলিশা–রাজাপুর রক্ষা প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনকালে পানিসম্পদ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ তাঁর বক্তৃতায় একথা বলেন। **প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন**

জেন্ডার ও নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্বের ১৮ জাতীয় নেতার মধ্যে অন্যতম শেখ হাসিনা

বিশ্বের ১৮ জন জাতীয় নারী নেতার মধ্যে অন্যতম হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৭শে জুন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত এক গ্রন্থে শেখ হাসিনাকে অন্যতম জাতীয় নেতা হিসেবে তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপ তুলে ধরেন বইটির লেখক রিচার্ড ও' ব্রেইন। ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

নারী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শীর্ষক গ্রন্থের প্রচ্ছদে অপর ছয়জন বিশ্বনেতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি মুদ্রিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মানবাধিকার কর্মী ও শিক্ষাবিদ ও' ব্রেইন তাঁর এ গ্রন্থে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় একনিষ্ঠতা, কঠোর পরিশ্রমী এবং বাংলাদেশের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার অর্জন লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশকে অধিকতর স্থিতিশীল ও অধিকতর গণতান্ত্রিক এবং অপেক্ষাকৃত কম হিংসাত্মক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রয়াসের প্রশংসা করেছেন লেখক বইটিতে। অনেক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার ১৯৯৭ সালে যুগান্তকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, স্থল মাইনের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণসহ অনেক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছে বলেও লেখক অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন তাঁর বইয়ে।

নারী নেতৃত্ব বেড়েছে আওয়ামী লীগে

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সর্বস্তরের কমিটিতে নারী নেতৃত্বের অংশগ্রহণ বেড়েছে। এরমধ্যে শুধু ৮১ সদস্যের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদে সভাপতিসহ ১৫ জন নারী সদস্য রয়েছেন। আর কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সব জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটিতে (জুন ২০১৭ পর্যন্ত) ১৫ ভাগ নারী রয়েছেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এক চিঠিতে নির্বাচন কমিশনকে এ তথ্য জানান।

চিঠিতে আরো বলা হয়, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী আগামী ২০২০ সাল নাগাদ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে তৃণমূল পর্যায়ের সব স্তরে ৩৩ ভাগ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হবে দলটি।

বিশ্বব্যাংকের ১০০ কোটি ডলারের ঋণ কর্মসূচি

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা দিতে ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি ডলার সরকারি-বেসরকারি ঋণ কর্মসূচি চালু করেছে বিশ্বব্যাংক। রয়টার্সে প্রচারিত খবর থেকে জানা যায়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কন্যা ইভাঙ্কা ট্রাম্পের নেওয়া উদ্যোগের অধীনে এ সহায়তা দেওয়া হবে।

বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে, এ প্রকল্পে জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ দাতাদের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে সাড়ে ৩২ কোটি ডলার আসছে।

প্রসূতি মায়ের জন্য 'মায়ের ব্যাংক' চালুর সিদ্ধান্ত

দেশে প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে প্রসূতি মায়েদের সঞ্চয়ের জন্য 'মায়ের ব্যাংক' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার। পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের কার্যক্রম প্রথমে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ দিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে। পরে তা সারাদেশে চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, প্রাথমিকভাবে এই দুই বিভাগে ৮০ হাজার প্লাস্টিকের তৈরি খালি ব্যাংক গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। প্রসব হওয়ার আগ পর্যন্ত এ ব্যাংকে সঞ্চয় করার জন্য প্রসূতি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অনুরোধ করা হবে। যাতে আপদে-বিপদে ব্যাংকে সঞ্চয়কৃত টাকা মা ও নবজাতকের উপকারে আসে।

আরো ১৫ বীরাঙ্গনা পেলেন মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের হাতে নির্যাতিত আরো ১৫ জন বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দিয়েছে সরকার। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ৪৪তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁদের মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দিয়ে সম্প্রতি গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত মোট ১৮৫ জন বীরাঙ্গনাকে স্বীকৃতি দিয়ে গেজেট প্রকাশ করেছে বর্তমান সরকার। নিয়মানুযায়ী স্বীকৃতিপ্রাপ্তরা প্রতি মাসে ভাতাসহ মুক্তিযোদ্ধাদের মতো অন্যান্য সব সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবেন। **প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী**

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

বয়স্ক ভাতা বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে

চলাফেরার ক্ষমতা নেই এমন প্রবীণ ব্যক্তিদের বয়স্ক ভাতা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে সরকার। পরিকল্পনা আছে সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স স্কিম চালুরও। বাংলাদেশে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো ৪ লাখ ৩ হাজার ১১১ জনকে মাসে ১০০ টাকা করে বয়স্ক ভাতা দেওয়ার উদ্যোগ নেয় সরকার। বর্তমানে এই ভাতা পাচ্ছেন সাড়ে ৩১ লাখ প্রবীণ ব্যক্তি। ভাতার হার মাসে ৫০০ টাকা। ন্যূনতম ৬৫ বছর বয়সি পুরুষ ও ৬২ বছর বয়সি নারীরা এই ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

'বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধিরা বলেছেন, কোথাও কোথাও বাড়ি থেকে বহুদূরে গিয়ে ভাতা তুলতে হচ্ছে। কেউ কেউ ভাতার পরিমাণ বাড়ানোর কথাও বলেছেন। রাষ্ট্রের সহায়তা পাওয়া বয়স্ক ব্যক্তিদের অধিকার। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির সভাপতি সাংসদ হাবিবে মিল্লাত বলেন, সরকার এ মুহূর্তে ১৪৫টি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালাচ্ছে। ১৬ কোটি মানুষের দেশে মাত্র ১১ লাখ মানুষ কর দেন। সব সময় যোগ্য ব্যক্তিরাই ভাতা পাচ্ছেন সেটাও নয়। এর প্রধান কারণ, যত মানুষ ভাতা পাওয়ার যোগ্য, তাদের সবাইকে দেওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের সব মানুষ তাদের সঠিক বয়স জানেন না।

সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, ভাতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নামের একটি ডেটাবেইস তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এতে করে ভাতা তুলতে গিয়ে আর কেউ বিপাকে পড়বে না। যারা চলনশক্তি হারিয়েছেন, তারা যেন বাড়িতে বসে ভাতা পান সে ব্যবস্থা করা হবে। **প্রতিবেদন : সানজিদা আহমেদ**

আমাদের স্বাধীনতা : বিশেষ প্রতিবেদন

বিভিন্ন ভাষায় বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'

ভাষা	অনুবাদক	প্রকাশকাল
ইংরেজি	ফকরুল আলম	১৮ই জুন ২০১২
জাপানি	কাজুহিরো ওয়াতানাবে	২রা আগস্ট ২০১৫
চীনা	চাই শি	২৮শে জানুয়ারি ২০১৬
আরবি	ফিলিস্তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২০১৬
ফরাসি	অধ্যাপক ফ্রান্স ভট্টাচার্য	২৬শে মার্চ ২০১৭
হিন্দি	ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৮ই এপ্রিল ২০১৭

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা-বিবৃতির সংকলন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর লেখা প্রবন্ধ, বক্তৃতা, বিবৃতি, বাণী, সাক্ষাৎকার ও দুর্লভ কিছু ছবি নিয়ে *বাংলাদেশ* নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ৯৮তম জন্মদিন উপলক্ষে সংকলনটি প্রকাশ করা হয়। এটি সম্পাদনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। **প্রতিবেদন: মো. লিয়াকত হোসেন ভূঞা**

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

সড়ক দুর্ঘটনা ও যানজট নিরসনে হাইকোর্টের ২৫ দফা নির্দেশনা প্রদান

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ৬ই জুলাই মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনা ও যানজট নিরসনে ২৫ দফা নির্দেশনা প্রদান করেছে।

নির্দেশনাসমূহ হচ্ছে :

১. মহাসড়ক (নিরাপত্তা, সংরক্ষণ ও চলাচল) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০১-এর ৮(১)-এর ধারা থেকে 'অধিদপ্তরের লিখিত অনুরোধ ব্যতীত শব্দটি বাদ দিতে হবে।'

২. রাস্তা নির্মাণ মেরামতের কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী ব্যতীত অন্য কোনো সামগ্রী রাস্তার ওপর বা পার্শ্বে রাখতে দেয়া যাবে না।

৩. কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া মহাসড়কে বা তার স্লোপে বা কোনো অংশে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে নির্মিত হাটবাজার বা দোকান উচ্ছেদ করতে হবে।

৪. মহাসড়কের ১০ মিটারের মধ্যে কোনো হাটবাজার ও বাণিজ্যিক স্থাপনা তৈরির অনুমতি দেয়া যাবে না।

৫. যানবাহন চলাচল ছাড়া মহাসড়কে জনসভা বা অন্য কোনো ভাবে ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেয়া যাবে না।

৬. রাস্তার পাশে পরিকল্পনা মাফিক বাস স্টপেজ স্থাপন করতে হবে।

৭. সড়ক মহাসড়কে ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন চলাচল বন্ধ করতে হবে।

৮. পর্যায়ক্রমে গবাদিপশু পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত খোলা ট্রাক/লরি ছাড়া সকল প্রকার খোলা ট্রাক ও লরি চলাচল বন্ধ করতে হবে।

৯. মহাসড়কে গতিরোধক কমিয়ে আনতে হবে এবং গতিরোধকে নিয়মিতভাবে উপযুক্ত রং ব্যবহার করতে হবে।

১০. যানজট কমানোর জন্য মহাসড়কে স্থান নির্ধারণ করে ফ্লাইওভার, ওভারব্রিজ, ওভারপাস/আন্ডারপাস ও লেবেল ক্রসিং তৈরি করতে হবে।

১১. দুর্ঘটনার পর দ্রুত যানবাহন অপসারণের জন্য হাইওয়ে পুলিশকে আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আরো কার্যক্ষম করতে হবে।

১২. মহাসড়কে পথচারী পারাপারের জন্য উপযুক্ত ক্রসিং নির্ধারণ করে আন্ডারপাস/ওভারপাস নির্মাণ করতে হবে। যত্রতত্র রাস্তা পারাপার বন্ধে উঁচু লোহার রেলিং দিতে হবে।

১৩. মহাসড়কে রোড ডিভাইডার দিতে হবে এবং দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে গতিসীমা সীমিত রাখার জন্য রাস্তার পার্শ্বে সাইনবোর্ড লাগাতে হবে।

১৪. মহাসড়কের ওপর চাপ কমানোর জন্য রেলপথ ও নৌপথের সুবিধা বাড়াতে হবে।

১৫. মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ওজন মাপার যন্ত্র স্থাপন করতে হবে।

১৬. কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া গাড়ির মূল কাঠামোর কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।

১৭. সড়ক মহাসড়কের রাস্তার পাশে পর্যাপ্ত স্লোপ ও ড্রেন নির্মাণ করতে হবে।

১৮. চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯. ইলেক্ট্রনিক ও পয়েন্ট বেজড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করতে এবং তার ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।

২০. প্রত্যেকটি দুর্ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

২১. মটরযান মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যক্রম মনিটরিং -এর আওতায় আনতে হবে।

২২. স্কুলের পাঠ্যক্রমে ট্রাফিক রুল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২৩. জনগণকে সচেতন করতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে।

২৪. যানজট ও দুর্ঘটনা হ্রাসের গাইড লাইন প্রস্তুত কমিটির সুপারিশ জাতীয় সংসদের গোচরে আনা, যাতে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা যায়।

২৫. এ নির্দেশনা পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

কুটির শিল্পে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন উদ্যোক্তারা

কুটির শিল্পের উদ্যোক্তারা এখন থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ নির্দেশনায় এ শিল্পে উদ্যোক্তাদের ব্যাংক থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়ছে। তবে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনে (বিসিক) নিবন্ধিত ও প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রতিষ্ঠানই ঋণে অগ্রাধিকার পাবে।

বিসিক-এর কুটির শিল্পের মধ্যে রয়েছে খাদ্যপণ্য, পানীয়, বস্ত্র ও ক্ষুদ্র পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, কাঠ ও আসবাব, কাগজ থেকে উৎপাদিত পণ্য, তামাকজাত পণ্য, মুদ্রণ, রাসায়নিক ও রাসায়নিক পণ্য, রাবার ও প্লাস্টিক পণ্য, মৌলিক মেটাল ও নন-মেটালিক মিনারেল পণ্য, ইলেকট্রনিক্স ও চশমা, ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জাম, পরিবহণ সরঞ্জাম, হস্তশিল্প, মেরামত কারখানা, মৌমাছি পালন, লবণ শিল্প প্রভৃতি।

শিল্প করিডোর স্থাপনে উদ্যোগী- বিডা

মহাসড়কের দুই পাশে পণ্য পরিবহণে সুবিধার জন্য শিল্প করিডোর স্থাপন করবে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)। গত ৯ই জুলাই ২০১৭ বিডা কার্যালয়ে এক সভায় এসব কথা জানান সংস্থার চেয়ারম্যান কাজী এম আমিনুল ইসলাম। সম্ভাব্য রুটগুলো হলো যশোর-মাগুরা-ফরিদপুর-ঢাকা, যশোর-নড়াইল-কাশিয়ানি-ভাঙা-ঢাকা, যশোর-খুলনা-বাগেরহাট-গোপালগঞ্জ-কাশিয়ানি-ভাঙা।

দেশে রড শিল্প সম্প্রসারণের সম্ভাবনা

রড শিল্পের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে বড়ো বড়ো শিল্পপ্রতিষ্ঠান। সরকারের নেওয়া বড়ো প্রকল্প আর দ্রুত শিল্পায়নের কারণে বাংলাদেশেও বাড়ছে রড শিল্প সম্প্রসারণের সম্ভাবনা। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে বাড়ছে বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন। আর সেই সাথে সম্প্রসারিত হচ্ছে ইস্পাত বা রড নির্মাণ শিল্পের। দেশে বছরে রডের চাহিদা রয়েছে প্রায় ৬৫ লাখ মেট্রিন টন। বর্তমানে দেশে ২৬টি অটোমেটিক রি-রোলিং মিলসহ ছোটো বড়ো ৪ শতাধিক রড প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ৮০ লাখ মেট্রিক টন।

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে আয় ৯৯৭৪ কোটি টাকা

২০১৬–১৭ অর্থবছরে মাসে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছে ১২৩ কোটি ৪০ লাখ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৯ হাজার ৯৭৪ কোটি টাকা; যা এই সময়ের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১ দশমিক ১৫ শতাংশ বেশি। একইসঙ্গে গত ২০১৫–১৬ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬ দশমিক ২৯ শতাংশ বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে এই খাতে।

লবণ আমদানি হবে ৫ লাখ টন

বাজারে লবণের দাম কমিয়ে আনতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৫ লাখ টন লবণ আমদানির প্রজ্ঞাপন জারি করেছে । গত ১৬ই জুলাই ২০১৭ এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। আগামী চার মাসের মধ্যে প্রকৃত মিল মালিকেরা এ পরিমাণ লবণ আমদানি করতে পারবেন।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

ডিএফপি নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র ‘একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি’র জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) কর্তৃক ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র ‘একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি’ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৫ অর্জন করেছে। ২৪শে জুলাই ২০১৭ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৫’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন এবং চলচ্চিত্রটির পরিচালক অধিদপ্তরের সহকারী চিত্র প্রযোজক আবদুল্লাহ আল হারুন। চিত্রনাট্য লিখেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক মুস্তাফা মাসুদ। প্রামাণ্যচিত্রটির ব্যাপ্তিকাল ২৫ মিনিট। পুরস্কার হিসেবে একটি স্বর্ণপদক, রেপ্লিকা, সম্মাননাপত্র এবং এক লক্ষ টাকার একটি চেক প্রদান করা হয়েছে।

২৪শে জুলাই ২০১৭ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৫’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন ডিএফপি’র মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন এবং ‘একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি’ প্রামাণ্যচিত্রের পরিচালক আবদুল্লাহ আল হারুন –পিআইডি

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৫ প্রদান

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৫ প্রদান করা হয়েছে। ২৪শে জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

একনজরে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৫

আজীবন সম্মাননা: যুগ্মভাবে-অভিনেত্রী শাবানা ও সংগীত শিল্পী ফেরদৌসী রহমান। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র: যুগ্মভাবে বাপজানের বায়োস্কোপ ও অনিল বাগচীর একদিন। শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র: একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক: যুগ্মভাবে মো. রিয়াজুল মওলা রিজু (বাপজানের বায়োস্কোপ) ও মোরশেদুল ইসলাম (অনিল বাগচীর একদিন)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা: যুগ্মভাবে শাকিব খান (আরো ভালোবাসবো তোমায়) ও মাহফুজ আহমেদ (জিরো ডিগ্রী)। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী: জয়া আহসান (জিরো ডিগ্রী)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্বচরিত্র: গাজী রাকায়েত (অনিল বাগচীর একদিন)। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্বচরিত্র: তমা মির্জা (নদীজন)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা খলচরিত্র: ইরেশ যাকের (ছুঁয়ে দিলে মন)। শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী: যারা যারিব (প্রার্থনা)। একই শাখায় একই ছবির

২৪শে জুলাই ২০১৭ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৫' প্রদান অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –পিআইডি

জন্য বিশেষ পুরস্কার পান প্রমিয়া রহমান। শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক: সানী জুবায়ের (অনিল বাগচীর একদিন)। শ্রেষ্ঠ গায়ক: যুগ্মভাবে সুবীর নন্দী (তোমারে ছাড়িতে বন্ধু, চলচ্চিত্র-মহুয়া সুন্দরী) ও এসআই টুটুল (উথাল পাথাল জোয়ার, চলচ্চিত্র-বাপজানের বায়োস্কোপ)। শ্রেষ্ঠ গায়িকা: প্রিয়াঙ্কা গোপ (আমার সুখ সে তো, চলচ্চিত্র-অনিল বাগচীর একদিন)। শ্রেষ্ঠ গীতিকার: আমিরুল ইসলাম (উথাল পাথাল জোয়ার, চলচ্চিত্র-বাপজানের বায়োস্কোপ)। শ্রেষ্ঠ সুরকার: এসআই টুটুল (উথাল পাথাল জোয়ার, চলচ্চিত্র-বাপজানের বায়োস্কোপ)। শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার: মাসুম রেজা (বাপজানের বায়োস্কোপ)। শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার: যুগ্মভাবে মাসুম রেজা (বাপজানের বায়োস্কোপ), মো. রিয়াজুল মওলা রিজু (বাপজানের বায়োস্কোপ)। শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা: হুমায়ূন আহমেদ (অনিল বাগচীর একদিন)। শ্রেষ্ঠ সম্পাদক: মেহেদী রনি (বাপজানের বায়োস্কোপ)। শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক সামুরাই মারুফ (জিরো ডিগ্রী)। শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক: মাহফুজুর রহমান খান (পদ্মপাতার জল)। শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক: রতন কুমার পাল (জিরো ডিগ্রী)। শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজসজ্জা: মুসকান সুমাইকা (পদ্মপাতার জল)। শ্রেষ্ঠ মেকআপম্যান: শফিক (জালালের গল্প)। এবার মোট ২৫টি ক্যাটাগরিতে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন : মিতা খান

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম-এর জরিপ হচ্ছে

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের কারণ বের করতে সরকার দেশব্যাপী একটি জরিপ করছে। এতে দেশে কী পরিমাণ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে তা বের করা হবে। এরপর এটাকে সামনে রেখে কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হবে। ১৭ই জুলাই রাজধানীর ডেইলি স্টার ভবনে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের আলোকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং করণীয়' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে একথা জানান শ্রম প্রতিমন্ত্রী মো. মুজিবুল হক। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।

গোলটেবিল বৈঠকে মূল প্রবন্ধে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) সঙ্গে শিশুশ্রম, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের বিষয়টি কীভাবে সম্পৃক্ত তা তুলে ধরা হয়। ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ৮ নম্বর লক্ষ্য হচ্ছে শিশুশ্রম নিরসন করা।

স্কুল ব্যাংকিং এগিয়ে চলছে সফলভাবে

খুদে শিক্ষার্থীদের সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়তে ২০১০ সালে শুরু হয় 'স্কুল ব্যাংকিং'। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শে সকল ব্যাংক চালু করে এই স্কুল ব্যাংকিং। ৬ থেকে ১৮ বছর বয়সি শিশুরা নিজ নামে খুলতে পারে ব্যাংক হিসাব। ছোটো এই উদ্যোগ আজ বড়ো আকার ধারণ করেছে। শুরুতে মাত্র ১০ টাকা জমা রেখে স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খোলা যেত।

২০১৩ সালে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী, কমপক্ষে ১০০ টাকা জমা করে স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুলতে হবে। শিক্ষার্থীদের পক্ষে অভিভাবকেরা এসব হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের খোলা হিসাবগুলোতে ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে জমা পড়েছে ১ হাজার ২১ কোটি টাকা। **প্রতিবেদন : নাসিমা খাতুন**

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

সফল সফর শেষ করে দেশে ফিরল এইচপি দল

৫ ওয়ানডের সঙ্গে ৩ দিনের ম্যাচেও জয়ের গৌরব নিয়ে দেশে ফিরল হাই পারফরম্যান্স (এইচপি) দল। এইচপি দলের অস্ট্রেলিয়া সফরটা দারুণ ছিল। ৫ ওয়ানডে সহজভাবেই জিতেছে বাংলাদেশ এইচপি দল। তিন দিনের ম্যাচটি ছিল খুবই জমজমাট। ডারউইনে এইচপি খেলেছে নর্দান টেরিটরি অঞ্চলের উদীয়মান ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে।

বাংলাদেশের মেজবাহ–শিরিন দ্রুততম মানব-মানবী

আন্তর্জাতিক ময়দানে ফলাফল যাই হোক না কেন বাংলাদেশের দ্রুততম মানব-মানবী হওয়ার ক্ষেত্রে মেজবাহ ও শিরিন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছেন। কেউ তাদের হারাতে পারছেন না। ১৩তম জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকসে দ্রুততম মানব-মানবী হয়ে তারা আরেকবার নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। এটা ছিল মেজবার ৬ষ্ঠ এবং শিরিনের পঞ্চম খেতাব।

বিশ্ব যুব অ্যাথলেটিকসের সেমিফাইনালে বাংলাদেশের জহির রায়হান

সম্প্রতি কেনিয়ায় শুরু হওয়া বিশ্ব যুব অ্যাথলেটিকসে বাংলাদেশের একমাত্র অ্যাথলেট জহির রায়হান অংশ নেন। ১২ই জুলাই নাইরোবিতে বিশ্ব যুব অ্যাথলেটিকসে জহির রায়হান ৪০০ মিটার দৌড়ের হিটে সেমিফাইনালে উঠেছেন। বিকেএসপি'র এই শিক্ষার্থী ৪৮ সেকেন্ড সময় নিয়েছেন। **প্রতিবেদন : জাকির হোসেন চৌধুরী**

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd. No. Dha-476 Sachitra Bangladesh vol. 38, No. 02, August 2017, Tk. 25.00

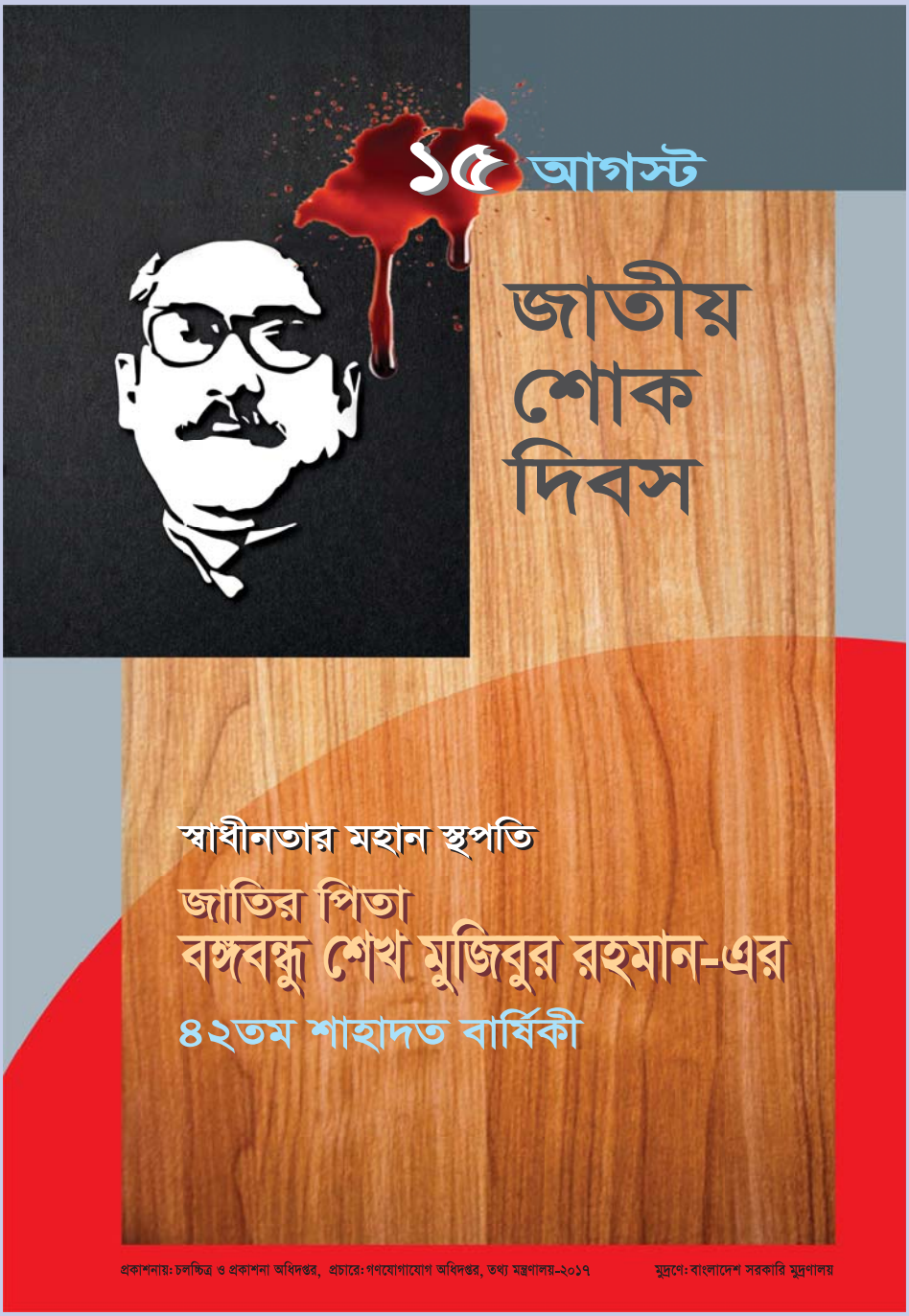

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা